সন্দীপন

সন্দীপন

রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ

সাহিত্য-বার্ষিকী

১৯৮১—১৯৮২

প্রকাশক ঃ অধ্যক্ষ
রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ
ঢাকা-৭

মুদ্রণে ঃ বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা

স্কুলের বোর্ড অব গভর্ণরস এর বর্তমান সদস্যমণ্ডলী

সচিব — চেয়ারম্যান
শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
(কাজী ফজলুর রহমান : জানুয়ারী/৮২ পর্যন্ত)
কাজী জালাল উদ্দীন আহমদ (ফেব্রুয়ারী/৮২ থেকে)

উপাচার্য — সদস্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
(ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী)

মহা-পরিচালক — সদস্য
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরিদপ্তর, ঢাকা
(ডক্টর হাফেজ আহমদ)

চেয়ারম্যান — সদস্য
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা
(ডক্টর শামসুদ্দীন মিয়া)

যুগ্ম সচিব — সদস্য
অর্থ বিভাগ
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

জনাব গাউসুল হোসেন — সদস্য
সিনিয়র কনসালটেন্ট
পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা

জনাব এম, এ, আজিজ — সদস্য
বিভাগীয় প্রধান
পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা
(অভিভাবক প্রতিনিধি)

ডঃ এম, কাসেম আলী — সদস্য
পরিচালক (পাট বীজ বিভাগ)
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা
(অভিভাবক প্রতিনিধি)

জনাব এম, এ, রউফ — সদস্য
সহকারী অধ্যাপক, পদার্থ বিভাগ
রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা
(শিক্ষক প্রতিনিধি)

অধ্যক্ষ — সদস্য-সচিব
রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা
(লুতফুল হায়দার চৌধুরী)

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ

অধ্যক্ষ লুতফুল হায়দার চৌধুরী

সম্পাদনায় ঃ

বাংলা বিভাগ

জাহাঙ্গীর হোসেন	দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)
মনিরুল ইসলাম	দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)
বায়জিদ খুরশীদ রিয়াজ	নবম শ্রেণী (বিজ্ঞান)

ইংরেজী বিভাগ

নুসরত জামিল আজহার	দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)
খালিদ হাসান মাহমুদ	একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)
এম, এ, কাজমী	দশম শ্রেণী (বিজ্ঞান)

ব্যবস্থাপনায় ঃ

জনাব শাহ মোঃ জহরুল হক	উপাধ্যক্ষ
জনাব শেখ মোঃ ওমর আলী	সহকারী অধ্যাপক
জনাব আবদুর রাজ্জাক	প্রভাষক
মিসেস রওশন আরা	প্রভাষক
জনাব খগেন্দ্র কুমার সরকার	প্রভাষক
জনাব শীলব্রত চৌধুরী	গ্রন্থাগারিক
মিসেস মাহবুবা হাবিব	প্রভাষক (প্রচ্ছদ অংকনে)

অধ্যক্ষ, লুতফুল হায়দার চৌধুরী

অধ্যক্ষের বাণী

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু তখন ভাষা ছিল না, ছিল না প্রকাশের নানা বিচিত্র মাধ্যম। স্বভাবতই মানুষ তখন তার জীবনের সীমিত জীবনধারাকে ভাব-ভঙ্গীর মাধ্যমেই প্রকাশ করতে বাধ্য থাকত। মানুষের আশা-আকাঙ্খার ব্যপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, সুখ-দুঃখের অনুভূতির তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভাষা খুঁজে নিতে হয়েছে, তৈরি করে নিতে হয়েছে নানা প্রকাশ-ভঙ্গী। মানুষের জীবন যত বিচিত্র হয়েছে, যত গভীর হয়েছে, মানুষ ততই নিজেকে তুলে ধরার জন্য, সৃষ্টি করার জন্য মুখর হয়ে উঠছে।

এই মনোভঙ্গী ও জীবনচেতনা থেকে আমরা সৃষ্টি করে চলেছি বিচিত্র-ধর্মী সাহিত্য। সাহিত্যের অঙ্গণ রূপে, রসে, কল্পনা ও সৌন্দর্যে প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

জীবনকে নানাভাবে, নানাভঙ্গীতে দেখা, জীবনের অতলান্ত রহস্য উন্মোচন করার অসীম আকুলতা, চিরসত্যকে, নিত্যকালের কথাকে আবার নতুন করে নিজের মত করে বলার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ আমাদের সৃষ্টিশীল করে তুলেছে।

এই সৃষ্টিশীলতাতেই রয়েছে জীবনকে নানাভাবে, নানাবিন্যাসে দেখার মূলে। যারা কিছু একটা সৃষ্টি করতে চায়, বলতে চায়, নিজেকে বাঙময় করতে চায়, তারা কোন নির্দিষ্ট বয়সের সীমা-রেখায় আবদ্ধ থাকে না।

বয়স, মনন এক্ষেত্রে কোন অন্তরায় নয়। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের বহি-প্রকাশ তাদের চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনাকে মূর্ত করে তোলে। তারই একটি স্বাভাবিক ও সহজস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে আমাদের এই সাহিত্য বার্ষিকীতে। এতে অনেক কচিমনের সন্ধান পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে শিশুদের কণ্ঠস্বর থেকে কৈশরে যারা পা দিয়েছে। অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকেরই হাতখড়ি হয়েছে এভাবে--স্কুল-কলেজের সাহিত্য-চর্চার পরিসরে। পরবর্তীকালে এই অনুপ্রেরণাই তাদের মহীরুহে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে রসসিঞ্চন করেছে।

আমরা এই ভরসা রাখি--আমাদের সাহিত্য-বার্ষিকীতে শিশু ও কিশোর মুখগুলো প্রতিভার দীপ্তিতে স্নাত হবে, অনাগত ভবিষ্যতে বিকাশ-উন্মুখ প্রতিভাগুলো ভাস্বর হয়ে উঠবে।

তাদের জন্য বিস্তীর্ণ আশা রেখে, শুভেচ্ছা রেখে বার্ষিকীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৮২
(১লা বৈশাখ, ১৩৮৯)

লুতফুল হায়দার চৌধুরী
অধ্যক্ষ

সম্পাদকীয়

মানব হৃদয়ে সৃষ্টির বাসনা চিরন্তন। মানুষ তার সৃষ্টি-ক্ষম-প্রজ্ঞার দ্বারা স্বকপোল কল্পিত সৃষ্টির মধ্যদিয়ে চিরজীব হতে চায়, চায় সে লোকান্তরিত হয়েও প্রাতঃস্মরণীয় হতে। সৃষ্টি মানবসত্তার স্ফূর্তি ব্যঞ্জক ও কর্মময় অভিব্যঞ্জনা। সৃষ্টির শাপমুক্ত বহিপ্রকাশেই তার পরিপূর্ণ আত্ম প্রকাশ ও আত্মতৃপ্তি। তাই, সৃষ্টির হর্ষোৎফুল্ল উল্লাস আর উন্মাদনা স্রষ্টাকে করে অভিভূত ও বিস্মিত।

সৃষ্টির এই অন্তরংলিংহ উল্লাস আর উন্মাদনাই আমাদের বার্ষিকী 'সন্দীপন' এর জন্ম দিয়েছে। তবে আমাদের বার্ষিকী উপস্থাপনার সুমহান আদর্শ আরও ভিন্নমুখী, সুদূর প্রসারী ও নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। এ শিক্ষায়তনের ছাত্রদের স্ফুটনোন্মুখ কচি-রাঙা ভাবগুলো পরিস্ফুটনের বেদনা নিয়ে রোরূদ্যমান হৃদয়ের গহীনে এতদিন কেবল গুমরে মরছিল। সন্দীপন নামের সম্ভাবনায় বালার্ক এদেরই মুক্তি এনে দিল।

বিদ্যালয় বার্ষিকীর মুখ্য স্থপতি এর ছাত্রবৃন্দ। তাদের সৃষ্টির সাড়ম্বর সমাহারে বার্ষিকী হয়েছে নিকুঞ্জ-শ্যামল, প্রাণবন্ত ও হৃষ্টপুষ্ট। তবে, সাহিত্য যদি জীবন-বৃক্ষের ফুল হয় তাহলে যে বৃক্ষ এখন পূর্ণতা পায়নি তার কাছ থেকে সৌরভযুক্ত পরিপূর্ণ পুষ্পের আশা দুরাশা মাত্র। তাই এদের কৃচ্ছ্রতালব্ধ প্রয়াসের পূর্ণতা-অপূর্ণতার বিচার সহৃদয় পাঠকবৃন্দের বিবেচনাধীন রইলো। এদের কাঁচা হাতের অপরিপক্ক লেখা যদি বিদগ্ধ পাঠকের চিত্তকে আলোড়িত করতে না পারে--তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

এ সাহিত্য বার্ষিকীর 'সন্দীপন' নামায়ণ যথেষ্ট তাৎপর্যে বিধৃত। তবে, এর নামকরণের শর সন্ধান সার্থক হবে তখনই যখন মৃণাল-নিন্দিত ঘুমন্ত ছাত্রমনের অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞান-পিপাসা সর্বোপরি সাহিত্য প্রয়াসকে 'সন্দীপন' উদ্দীপিত ও সন্দীপিত করতে সক্ষম হবে।

বার্সিকী প্রকাশনাও সফল হবে তখনই যখন অপরিপক্ক হৃদয়ের কলগুঞ্জন নিরলস সাধনার মাধ্যমে নির্ঝরিনীর সহজ-সরল গতিছন্দে বাঙময় হয়ে আদর্শ স্থানীয় সমাজ-রূপায়নে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করবে, গঠন করবে শ্বাশতঃ সৃষ্টিধর্মী মানসিকতা।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তাই, এ ভাষায়ই আমাদের চেতনা স্ফূর্তি লাভ করে সর্বাধিক। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইংরাজী ভাষার প্রসাধন। এই উদ্দেশ্যের পরিপোষণায় এই বার্ষিকীতে সংযোজিত হয়েছে একটি ইংরাজী বিভাগ।

অভিলাষ থাকলেও সামর্থ আমাদের প্রতি প্রসন্ন নয়। সীমিত কলেবরেই আমাদের ক্রমবর্ধিষ্ণু চেতনার ফসলকে মেলতে হয়েছে। তাই অনেক সম্ভাবনাময় লেখনী-প্রসূত চিন্তার অঙ্কুর এ ফসল বুননে আসেনি। বার্ষিকীর সীমিত পরিসরে তাদের লেখনীচ্ছটা কিরণ সম্পাতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রইল। সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, বারান্তরে তাদের লেখা দ্বিগুণ প্রত্যাশার সমৃদ্ধি আনবে, আনবে আনন্দ।

এই বার্ষিকী একক প্রচেষ্টার ফসল নয়---সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। এই বিদ্যায়তনের ছাত্রবৃন্দ এবং শ্রদ্ধেয় সারস্বতঃ শিক্ষকমণ্ডলীর ঐকান্তিক সহযোগিতা এই বার্ষিকীর প্রকাশনায় সর্বদা ফল্গুধারার মতই বর্ষিত হয়েছে। তাই 'সন্দীপনে'র প্রকাশনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগীর প্রত্যেকের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

সূচীপত্র

বাংলা বিভাগ

কবিতা ঃ

শ্রেষ্ঠ আমি : রহমত আলী সিদ্দিকী ১; দেশ প্রেমিক : মীর সরফউদ্দিন আহমেদ ৫; আমার বাংলাদেশ : আশফাক চৌধুরী ৮; ঋতুর খেলা : সালাউদ্দিন হেলাল : ১৫; কবিতা : মোঃ জহিরউদ্দিন ২৬; লোভে পাপ পাপে মৃত্যু : মেহেদী হাসান ২৬; ইদানীং জীবন : আকবর রেজাউল হায়দার ২৭; ফাল্গুন : জাহাঙ্গীর আলম ৪৮; কোরানই বিজ্ঞান : এ. কে. এম. এনামুল হক ৪৯; নববর্ষ : রফিকুল ইসলাম সিদ্দিক ৫২; একুশে ফেব্রুয়ারী : কাজী খালেদ ৬৩।

ছড়া ঃ

সেজান : তানভীর আহসান ১৯; আমাদের হোস্টেলে : এ. কে. এম. শাম্মী মাহবুব ১৯; শিয়াল মামা : কাজী সাজ্জাদ হোসেন ১৯; ভুড়িওয়ালা : আবুল খায়ের ১৯; জোকার : শাহেদ কামাল ২৬; ছড়া : মাহবুবুর রহমান ৫২; মোরগ মারতে গিয়ে : কামাল আকবর ৬০; মা : মীর নাহিদ আহসান ৬০; মামার বাড়ী : মোঃ সাইফুল বাশার ৬০; বন্ধু কমল : দাউদ আমান ৬৬; সকাল বেলা : রাশেদুল আলম ৬৬; দুলাভাই : শহীদুল ইসলাম ৬৬; পেটুক মশাই : ইসতিয়াক রেজা ৭১; সেই ছেলেটা : জি. কে. এন. মোর্শেদ ৭১; স্বপন : সাঈদউদ্দিন হেলাল ৭১; তরুণ দল : মাহবুবুর রহমান ৮০; পলাশ ফুল : এ. কে. এম. মেহেদী মাহাবুব হাসান : ৮০; বেজীর হিংসা : গোলাম রাব্বানী ৮০।

গল্প, প্রবন্ধ ও ইতিহাস ঃ

বিংশ শতাব্দীর বিমূর্ত চিত্রশিল্প : নসরুল হামিদ ২; রাজা : আবদুন্ নূর ৬; বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা : বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ ৯; কাল্ট দেশে দেশে : ইকবাল হাবীব ১৬; পৃথিবীর উৎপত্তি রহস্য : কবিরুল ইয়াজদানী খান : ২১; পৃথিবী ও মানুষের জন্ম কথা (সংকলিত) : সৈয়দ ইউসুফ কামাল ২৩; নজরুলের প্রেমিক সত্তা : মোঃ মনিরুল ইসলাম ২৮; কাকতালায় : মুনীর আহমেদ কাদরী ৩৭; Ever-lasting Calendar : কাজী নজরুল হক ৩৯; রবিনের জন্মদিন : জিয়াউদ্দিন হায়দার ৪২; হাজার তারার ভীড়ে : এ.টি.এম. রেজওয়ানুল কবির ৪৪; নিয়াজ মোর্শেদের সাথে কিছুক্ষণ : জাহাঙ্গীর হোসেন ৫৩;

জীবনের লক্ষ্য : মো: আখতারুজ্জামান তালুকদার ৫৭; জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান : রায়হান ইসহাক আহমদ ৬১; জানা অজানা : ফখরুদ্দিন আহমেদ ৬৪; অমর একুশে : এস. বি. এম. হাবিবুর রহমান ৬৭; অবিস্মরণীয় সে-স্মৃতি : এম. এ. সেলিম মিয়া ৭২; বাঁশী : মীর শফিকুল ইসলাম ৭৫; সুচিন্তিত মজার কথা : মো: আবুল কালাম আজাদ ৮১; বিমাতা : শেখ তৈমুর রেজা হাসান ৮৪; ইসলামের দৃষ্টিতে নারী সমাজ : মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ৮৮।

কৌতুক :

কৌতুক : জিয়া মহিউদ্দিন ২০; কৌতুক : মো: মনিরুল হক : ৫০; একটু হাসি : আব্দুল মুহিত ৫১।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক :

এক নম্বর ছাত্রাবাস : ৯০; দুই নম্বর ছাত্রাবাস : ৯২; তিন নম্বর ছাত্রাবাস : ৯৪; নজরুল ইসলাম ছাত্রাবাস : ৯৫; ফজলুল হক ছাত্রাবাস : ৯৭; সংস্কৃতি সপ্তাহ ১৯৮১ : ৯৯; শোকসংবাদ : ১০২-১০৫; বিদ্যালয় সংবাদ : ১০৬; অধ্যক্ষের ভাষণ : ১১২; সালতামামি ১২১।

ENGLISH SECTION

Contents

The ufo : Mahbul Hasan 2; Come to me again : Mustafizur Rahman 4; Einstein's Theory of Relativity in Brief : A. K. M. Salek 5; My Lost Stamp : Q. G. M. Faruque 8; Let There Be Light : Nusrat Jamil 9; The Land of Eternal Glory : A. W. M. Rezaul Arif 15; Tiger : Sk. Monowar Ali 22; The Prince of Mathematics : Sabbir Ahmad Chowdhury 24; The Annual Camping of Residential Model School : A. K. M. Anamul Hoque 27; The Inner Meaning of Sufism : Arshad Alam 31; Childhood : Md. Mahbubur Rahman 34; Transparation : Jadded Aziz 37; Of Introduction and Approach : A. B. M. Shahidul Islam 39.

স্কুল সাহিত্য বার্ষিকী কমিটি

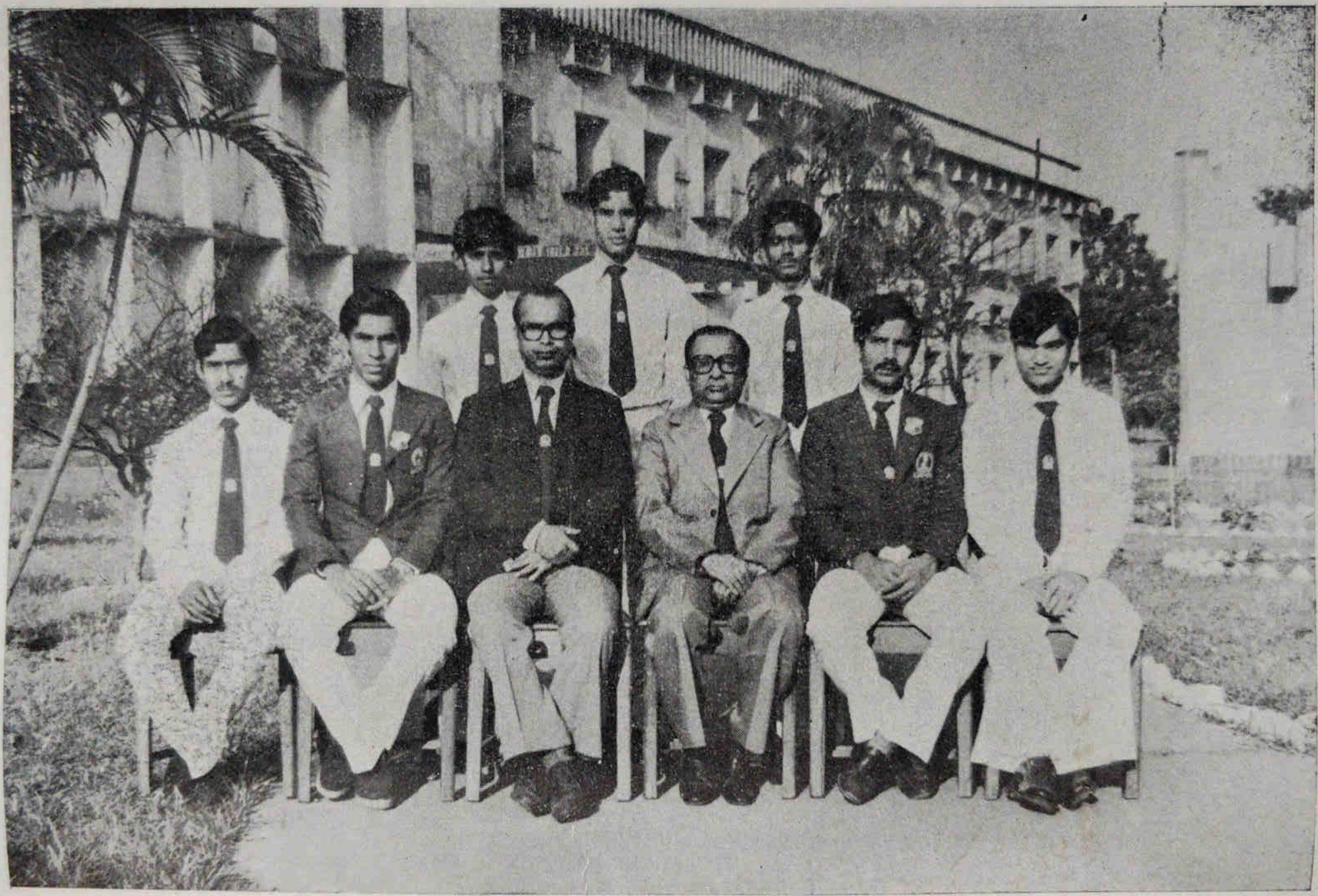

কেন্দ্রীয় প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড

শ্রেষ্ঠ আমি

রহমত আলী সিদ্দিকী, ২৯২০
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)

বাজিতেছে ঐ বিশ্বের বীণা,
সাজিতেছে যত সেনা;
যুঝিছে তাহারা অজানার তরে
যায়নি যাহারে চেনা।
শ্রেষ্ঠ আমি, স্রষ্টা বলিছে,
নয়কো মিথ্যা বাণী,
জয়ী হব ঠিক সর্ব সমরে,
দেখিব সকলি জানি।
কেনবা আকাশে উল্কা ছুটিছে?
কেনই বা ধূমকেতু?
যুগ যুগ পরে ফিরিছে আবার
পার হয়ে কোন সেতু?
জীবের মৃত্যু হইতেছে কিসে?
জন্মিছে বা সে কেন?
আকাশের চালা সোজা না হয়ে
কেনই বা হইল হেন?
তারপর আমি জানিব ঠিকই
সূর্য জ্বলিছে কিসে।

কতদিন আর জ্বলিবে এমনে?
নিভে কি যাবে না শেষে?
সূর্যের মত কোটি কোটি যুগ
বাঁচিতে মোরা কি পারিনে?
যাহাই ভেবেছি করেছি জয়
মোরা তো কখনো হারিনি।
আকাশের মাঝে গ্রহ-তারাগুলি
চলিতেছে কোন্ কলে?
যার যার রথে ঠিক ঠিক পথে
চলিতেছে কার বলে?
বোকার বুঝানো বুঝাইলে ওরে
বুঝিব না আমি কভু,
সত্যের তরে শুধু বারে বারে
প্রশ্ন জাগিবে তবু।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিবে যখন
আমার আঁধার মনে
বহুদূরে বহু পাইব দেখিতে
বিনা চোখ দূরবীনে।

●

'আপন কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার নিজের হিসাব করার জন্য তুমিই যথেষ্ট'।

—আল-কুরআন

বিংশ শতাব্দীর বিমূর্ত চিত্রশিল্প

নসরুল হামিদ, ১৪১৩
দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

বিংশ শতাব্দীর চিত্রগুলি বিমূর্ত (Abstract) এবং অবিভ্রম সম্পন্ন। এই দৃঢ় ভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান যুগে আঁকা যেগুলি রীতিমত সম্পর্ক স্থাপন করেছে সৌন্দর্যবোধ-সম্পন্ন-রেনেসাঁ ও বাস্তববাদের সঙ্গে। যেহেতু বর্তমানে বস্তুর কল্পপ্রতিবিম্ব কঠিন বাস্তববাদে আবদ্ধ তাই সেগুলি আর মানুষের কল্পনাশক্তিকে তেমন নাড়া দেয় না; যা একবার দিয়েছিল। সুতরাং প্রতিনিয়ত সংঘটিত ঘটনা সমাজের বাস্তব ছবিগুলি মানুষের ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই তাদের বর্তমান চিত্রগুলিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের বহিঃ-প্রকাশ ঘটেছে। তাদের আঁকা কোন কোন ছবিতে মনে হচ্ছে যেন তারা কোন সমুদ্রতুল্য হতাশায় নিমজ্জিত। প্রকৃতিকে, সৃষ্টিকে, ধ্বংসকে ব্যাপকভাবে নাড়াচাড়া করে চিত্রে রেখায়িত করাবাস্তব কল্পগুচ্ছ। আবার কোন কোন ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে ধ্বংসের প্রতি প্রবল ঘৃণা কঠিন সমস্যা সমাধানের পথ, কারারুদ্ধ মানুষের বেদনা আর জন্মমৃত্যু মিথুন চক্রের বিমূর্ত বিস্ময়।

বর্তমান শতাব্দীতে দেখা যায় চিত্রকররা তাদের সৃষ্টির আগে কোন কাহিনী দ্বারা জর্জরিত অথবা ভবিষ্যত কোন সর্বব্যাপী সমস্যার সমাধানে ব্যতিব্যস্ত। মানুষের ভাবের এই বিরাট পরিবর্তন অলৌকিকভাবে হঠাৎ করে বিংশ শতাব্দীর চিত্র জগতে প্রবেশ করে নাই--ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে Impressionism--এর যে মতবাদ নিয়ে শিল্পীরা হাজির হয়েছিল তা অল্প অল্প করে মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। কিন্তু Impressionism এর পরে যে মতবাদের জোয়ার এসেছিল ১৯০৫ সালের দিকে, তা কখনও পূর্বে প্রকাশ পায় নাই; এবং এই মতবাদ যেহেতু Impressionism--এর পর পরই প্রকাশ পায়, তাই হঠাৎ করে সমালোচক ও শিল্পানুরাগী-দের যথাযথ স্বীকৃতি অর্জন ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

ইম্প্রেশনিজমে ছবি আঁকা সম্পূর্ণভাবে শিল্পীদের আবেগ দ্বারা পরিচালিত হ'তো--এটা Cubism--এর থেকে ভিন্নধর্মী ছিল। ফরাসী VAN GOGH-এর ধারণায় না গিয়ে তারা জীবন ও ধারণার অনুবাদে গিয়েছিলেন।

কিন্তু Impressionism-এ ভাবে ব্যক্ত করার যে নব পদ্ধতির সূচনা হয়, তাতে দেখা যায় বস্তুগুলি ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়, রং প্রয়োগে ঘটে পরিবর্তন। প্রতিটি রং যেন নতুন ভাবনা নিয়ে নতুন ভংগিতে প্রকাশ পায়। রংএর মধ্যে নতুন রং হাজির হয়; এবং তখন থেকে শুরু হয় Two-dimentional ছবি আঁকা। এই মতবাদের উত্তরসুরীরা ছিল ম্যাতিস, রাউয়াল্ট

এবং আরও অনেকে। যাদের তখন বলা হ'তো বন্যপশু। এদের ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তারা ছিল VAN GOGH-এর অনুগামী অর্থাৎ VAN GOGH ছিল তাদের ধারণার শৈল্পিক পিতা। অবশ্য এদের মধ্যে ম্যাতিস-ই ছিল নেতৃত্বে।

রেখা এবং রং-এর প্রতি ম্যাতিস-এর ধারণা ছিল প্রবল। হিন্দু ভাস্কর্য, পারসিয়ান মিনিয়েচার, গ্রীকপটে আঁকা ছবি এবং আরও ভিন্ন মাধ্যম থেকে যে রং-এর উজ্জ্বলতা এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেছিল যা ১৯০৭ সালে তাঁর আঁকা Blue Nude চিত্রে সত্যিকার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সে ছিল কিছুটা কাল্পনিক "ডেকোরেটার" তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটা ভাব লক্ষ্য করা গেছে যে তাঁর মানুষের গঠনের উপর তার কল্পনাশক্তি কাজ করত। মানুষের কাল্পনিক গঠনের উপর তার ছিল চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা।

কিন্তু, Rouault ছিল বিংশ শতাব্দীর অনেকের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য "পেইন্টার" যিনি তার ছবিতে ধর্ম এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্বন্ধীয় নিজস্ব ধারণাগুলোকে ব্যক্ত করতেন। পক্ষান্তরে Braque Structuratism বা Cubism-এর উপর ঝুঁকে পড়েন। যদিও এরা এই শতাব্দীর প্রথমদিকে আধুনিক শিল্পের ভাবনার পথ নির্দেশ করেন তবুও স্পেনিয়ার্ড পাবলো পিকাসোই আধুনিক শিল্পের মূল গতিধারার নির্দেশক। বিশ বছর বয়সে তিনি প্যারিসে যান। কিন্তু পিকাসো Fauves-দের বৃত্তের মধ্যে ছিলেন না, যদিও তিনি কাজ করতেন আধুনিক ভাবধারা নিয়ে, তবে তার Style ছিল ভিন্ন। ১৯০১ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে তার আঁকা প্রথম দিককার ছবিগুলিতে নীল রং ছিল। পিকাসোর ছবির বিশেষত্ব ছিল একটা সম্পূর্ণ নতুন রীতির ব্যবহার। তাঁর পরবর্তী ছবিগুলিতে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা ছিল নিজের এবং পাঁচ শ' বছর পুরানো "রিয়ালিস্টিক" আর্টের ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

Cubism এবং Expressionism এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল যে এর উপর প্রচুর গবেষণামূলক আন্দোলন এবং স্কুল কেবল গুটিকতক দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ভাব ছিল আন্তর্জাতিক এবং এর বিন্যাসগুলি ছিল সুতীক্ষ্ণ যেমন—স্পেনিয়ার্ড পিকাসো তাঁর কর্ম-জীবনে কাটিয়েছেন ফ্রান্সে এবং ছবি এঁকেছেন আধ্ডজনের মত স্টাইলে তিনি একাধারে ছিলেন একজন Cubist একজন Surrealist এবং একজন Expressionist।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী উন্মাতাল বিশ্ব কিছু দলছুট শিল্পীর মনোভুবনে সৃষ্টি করেছিল এক ধূসর ধূলিঝড়; যার ফলশ্রুতি সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তবতাবাদের উদ্বোধন-আয়োজন-নিমন্ত্রণ মেলা। পরাবাস্তবতাবাদীরা চেয়েছিলেন 'জীবনের পরিবর্তন, বাস্তবাক্ত জীবনের ভিতরে তান্তব স্বপ্ন-কল্পনা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দীপ্তি এক পরিবর্তন। শিল্পসাহিত্যের অমরা প্যারিসে কিছুদিনের ভিতরেই শিল্পকলার শাখাবলির মাঝে চিত্রকলাই হয়ে উঠলো পরাবাস্তবতার প্রধান মাধ্যম।

চিত্রকলায় ইম্প্রেশনিজম ও সাহিত্য প্রতীকীপন্থা শিল্পের গতানুগতিক রীতিতে একদিন সম্পন্ন করেছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই সদ্যবিধ্বস্ত বাস্তব-বিশ্বে এসে দাঁড়াল বিচিত্র আধুনিকতা। বস্তুর অবিকল প্রতিচিত্রণে অস্বীকৃতি জানালেন চিত্রকরেরা—'সূর্য আঁকতে গিয়ে আপন আত্মাকে শিল্পী সূর্যের ভিতরে স্থাপিত করে দিলেন।' ঝড়ের বেগে শত আগন্তির মুখে সদম্ভে প্রবেশ করল বিমূর্ততা বা এ্যাবস্ট্রাকশন—'যা খণ্ডিত অথচ সমবায়ী'। শুরু হলো

আন্দোলন আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। সবশেষে শুরু হলো সুররিয়ালিজমের সৃজনশীলতা। আর এর সুতোয় মালা গাঁথলেন পাবলো পিকাসো, আঁরিরুশো, আঁদ্রেডিরেন, রাউল দুফাই, জর্জেস ব্রাক, ফ্রান্সিস পিকাবিআ, এর্নস্ট্, আঁদ্রে ম্যাসন, জর্জিও দ্যা চিরিকো, জ্যাঁ ককতো, মার্ক শাগাল, সালভাদোর দালি রেনে ম্যাগ্রিৎ প্রমুখ।

স্পেনিশ শিল্পী সালভাদোর দালি সৃষ্টি করেছিলেন সর্বব্যাপী অনুভূতি তাঁর সুপ্ররাচিত এবং কখনও কখনও উদ্ভট বা আজগুবী কল্পনাশক্তির দ্বারা। যা অনুভূতি প্রেমিকদের কাছে ব্যাপক আবেদন নিয়ে উপস্থিত হ'তো। তাঁর আঁকা ছবিগুলি বিমূর্তচিত্রের কিছুটা বাইরে, কারণ তিনি সেকেলে মনোভাবের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নির্বস্তুক শিল্পের যাত্রা শুরু হলেও এই শতাব্দীর প্রথম থেকে একে আরো গভীরভাবে সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং এরই মধ্যদিয়ে এসেছে বিভিন্ন রীতি, ভাব, অনুভূতি ও আবেগের মিলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বেই এর ধারা প্রবল হয়।

রেনেসাঁর যুগের মনীষীদের চিন্তাধারা ও মতবাদ বর্তমান থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা না দেখা পৃথিবীকে চরম বাস্তবতা হিসাবে কল্পনা করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং স্থাপন করেন একটা নতুন মতবাদ--humanism। সেহেতু রেনেসাঁর লোকেরা ভাবাবেগেরও গভীরে যায় নাই--তাই তারা মানুষকে সকলকিছুর মাপকাঠি হিসাবে ধরে নেয়, যেখানে সৃষ্টিকর্তা ছিল ভিন্ন। যেখানে মানুষই একটা পৃথিবীর আবিষ্কারক। এই ছিল Humanism.

আধুনিক শিল্পচেতনার সাবিক বিশ্লেষণ মধ্য ও রেনেসাঁর যুগের মনোভাবগুলির সমান্তরাল অবস্থানের ধূসর চিত্রের পট উন্মোচন করে। সময় এখন মানব সমস্যার সমাধানের বিজ্ঞানের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান এবং যুগ পরকাড়ীন জীবনের বিচার করতে ব্যস্ত। তাই বর্তমান যুগের, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদদের কাজ একটা বিশৃঙ্খল বিশ্বে শান্তি ফিরিয়ে আনার মার্জিত আবেদনের সুস্পষ্ট ছাপ ফেলে যায়।

●

'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার অধিক প্রিয়, যে অধিক চরিত্রবান'।

—আল-হাদীস

দেশপ্রেমিক

মীর সরফউদ্দিন আহমেদ, ২২৮৪
ষষ্ঠ শ্রেণী 'ক'

একদিন দেখি রাস্তা দিয়া আসছে
হুইলচেয়ারে বসা একজন।
তাহার চেহারায় কি এক আলোতে
হৃদয়ে হল জাগরণ—
তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার এক অদ্ভুত টান।
তার সারা মুখে ভরা
ঘন দাঁড়ি কুচকুচে কালো,
চোখেতে শত কোটি তারকার আলো,
তার ডাগর চোখেতে বাঁচার স্বপ্ন,
হৃদয়ে বাঁচার গান,
আমি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম
অবাক নয়নে চেয়ে
তাঁর অকেজো পা দু'টো দেখে আমার
চোখ গেল পানিতে ছেয়ে।

হে মহাবীর,
তোমার মত গৌরব ভরা মানুষ ক'জনে আছে?
অঙ্গের দাম কিছুই না--স্বাধীনতার কাছে॥

●

'আল্লাহ কোন জাতিকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত সে জাতি নিজের ধ্বংস নিজে আনয়ন না করে'।

—আল-কুরআন

রাজা

আব্দুন্ নূর, ১৮৫১
অষ্টম শ্রেণী 'ক'

আমার কাহিনীটি কোন অবাস্তব রূপকথা নয়। রাজা নাম দেখে মনে হতে পারে রূপকথা, কারণ রাজা, মহারাজাদের ভীড় রূপকথাতে লেগেই আছে। তবে রূপকথা না হলেও, এই কাহিনী রূপকথার চেয়েও রোমাঞ্চকর। রূপকথাকে হার মানানো এই কাহিনীর নায়কের নাম 'পেলে'। হ্যাঁ, সেই কালোমানিক, যাঁর দীপ্ত পদচারনায় বিশ্বের ফুটবল অঙ্গন ছিল মুখরিত। তাঁর পুরো নাম বলা যেমন কঠিন, মনে রাখাও তেমন কঠিন। নামটি হচ্ছে এডসন আরান্টেস ডো নাসিমেন্টো। আমরা যেমন তাঁর পুরো নাম বলি না, পৃথিবীর কেউ তেমনি তাঁর পুরো নাম বলে না। তাই পেলে নামেই তিনি বিশ্বে পরিচিত। ফুটবল সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া সবাই তাঁকে এক বাক্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার হিসাবে সমর্থন করেন।

পেলে ১৯৪৫ সালের ২৩শে অক্টোবর ব্রাজিলের ছোট্ট নগরী ট্রেস কোরোকোসে জন্মগ্রহণ করেন। পেলের বাবা খুব গরীব ছিলেন। কিন্তু নানা দুঃখ-কষ্টের মাঝেও একটু সময় পেলেই তিনি ফুটবল খেলতেন। তখন খালি পায়ে খেলার প্রচলন ছিলো বলে, তিনিও খালি পায়ে ফুটবল খেলতেন। ফুটবল প্রেমিক বাবা তাই পেলেকে হাঁটি হাঁটি পা পা বয়স থেকেই ছালার তৈরী বল দিয়ে খেলা শিখাতেন। দু'একটা লাথি লাগলেই বাবা চিৎকার করে বাহ্‌বা দিতেন আর সবাইকে বলে বেড়াতেন যে তাঁর ছেলে একদিন বিশ্ববিখ্যাত হবে। আমরা দেখতেই পাচ্ছি, সেই বাণী বিফল হয়নি। পেলে আজ ফুটবলের রাজা খেতাবে ভূষিত।

বাবার কাছ থেকে প্রেরণা পেলেও, পেলেকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলেন ব্রাজিলের এককালীন সেরা খেলোয়াড় 'বিট্রোর দি ড্যান্সার' নামে খ্যাত ওয়াল ডেমার ডি বিট্রোর। তিনি তাঁর নিজের সমস্ত ক্রীড়াচাতুর্য পেলেকে এমনভাবে দিয়েছিলেন যে, তিনিও বলতেন "পেলে একদিন ফুটবলের ইতিহাস রচনা করবে।" পেলে ব্রাজিলের বিখ্যাত দল স্যান্টোসে যোগ দেন মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে। সেই থেকেই সাফল্যের উচ্চ শিখরের দিকে তাঁর যাত্রা শুরু। তিনি স্যান্টোসের সিনিয়র টীমে যোগ দেন ১৯৫৬-তে। আর ১৯৫৭-তেই ব্রাজিলের পক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ নেন। ১৯৫৮-তে তিনি দেশের পক্ষে "জুলে রিমে" বা তদানীন্তন বিশ্বকাপে খেলেন এবং সেই বৎসরই ব্রাজিল বিশ্বকাপ জেতে। তাঁর খেলা দেখে সমালোচকদের একজন লিখলেন "পেলের ডান পায়ে যদি থাকে বুলেটের বেগ তবে বাঁ পায়ের শটে আছে টর্পেডোর গতি।" আর একজন পেলেকে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির নতুন সূর্য বলে অভিহিত করলেন। ১৯৬২ সালে প্রথম খেলায় আহত হওয়ায় এবং ১৯৬৬-তে বার বার আহত হওয়ায় তিনি খেলতেই পারেননি। কিন্তু পেলে ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপে সেরা খেলা খেলে প্রমাণ করলেন

যে, তাঁর খেলায় ভাটা পড়েনি। সেইবার ব্রাজিল তৃতীয়বারের মত বিশ্বকাপ জিতে, বিশ্বকাপকে চিরদিনের জন্য তুলে নেয়।

ইউসোবিও, যিনি পৃথিবীর অন্যতম সেরা খেলোয়াড়, তিনি বলেছেন, পেলের মত খেলা তিনি স্বপ্নে খেলে থাকেন। আর একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় ববি চার্লটন বলেছেন, "ফুটবলের জন্মই হয়েছিল পেলের জন্য"। পেলেকে অনেকেই বলেন Born Footballer অর্থাৎ পেলের নৈপুণ্য আল্লাহ্ প্রদত্ত। কিন্তু পেলে বলেন যে, Born ফুটবলার বলে কিছু নেই। পরিশ্রম, অধ্যবসায়, অনুশীলন, শিক্ষা, আর নিজের কাজের প্রতি ভালবাসা থাকলে যে-কেউ পেলের মত হতে পারে। ২২ বৎসর ফুটবল খেলে পেলে অবসর নিয়েছেন ১৯৭৭ সালের ১লা অক্টোবর। তিনি ১৩৬৩টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশ নিয়ে ১২৮১টি গোল করেছেন। ৬৫টি দেশে ফুটবল খেলেছেন। পোপ থেকে শুরু করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ও তাঁর খেলা দেখেছেন।

পেলে ছোটদের খুব ভালবাসতেন। তিনি বলেছেন "লেখাপড়া ও ফুটবলে কোন বিরোধ নেই।" তাঁর অন্যতম কীর্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবলকে জনপ্রিয় করা। সেখানে তিনি কসমসের সাদা, সবুজ জার্সী পরে খেলতেন। এই দলের অন্যতম সংগঠকও ছিলেন তিনি। পেলে বলেছেন "সফল হও, বিফল হও। মানুষ হতে চেষ্টা কর, কখনো নিজেকে সবজান্তা মনে করবে না। সবসময়েই কিছু না কিছু শেখার থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নিজেই বিখ্যাত হওয়া। কাউকে নকল বা কারো মত হতে চেষ্টা করো না। চেষ্টা করে নিজেকে একজন পেলে না বানিয়ে, নিজে বিখ্যাত হও। পেলে হওয়ার চেয়ে বড় নিজে বিখ্যাত হওয়া।

আমাদের মাঝ থেকে কেউ হয়তো পেলের কথামত নিজেই বিখ্যাত হবে। কেউ কেন? আমরা সবাই হয়তো বিখ্যাত হবো। কারণ, পেলে তো বলেছেনই সাফল্যের মূলমন্ত্র পরিশ্রম, অধ্যবসায়, অনুশীলনে নিহিত। আমাদের উপর মাতা, পিতা, শিক্ষক, দেশবাসী, সবার আশা, আকাঙ্ক্ষা। ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্বও আমাদের। তাই এখন থেকেই আমরা পরিশ্রমী হয়ে, দেশের জন্য বয়ে আনবো অসংখ্য গৌরব ও সুনাম।

●

'যে ব্যক্তি কোমল ব্যবহার হইতে বঞ্চিত, সে সমগ্র কল্যাণ হইতে বঞ্চিত'।

— আল-হাদীস

আমার বাংলাদেশ
বাংলাদেশের আমি

আশফাক চৌধুরী, ২২৫৮
অষ্টম শ্রেণী 'খ'

পাখী যেমন গান গাইতে ভালবাসে,
শিশু যেমন আনন্দ পায় 'মা' বলে ডাকতে, আমিও
তেমনি ভালবাসি বাংলাদেশকে।

রাত্রে যেমন চাঁদ উঠবেই।
সমুদ্র-স্রোত যেমন কখনো স্তব্ধ হবে না, বাংলাদেশ ও আমার বন্ধন
তেমনি চিরন্তন।

আমার যখন বেদনা, বাংলাদেশ তখন সান্ত্বনা।
আমি যখন সংগীহারা, জন্মভূমি
তখন সংগী।

বাংলাদেশ আমার, আমি বাংলাদেশের।
এমনি করেই দুজনে এক হয়ে গেছি,
একসাথে, এক সত্ত্বায়।

বাংলাদেশকে ভালবাসি আমি।
হারিয়ে যেতে চাই এ'দেশেরই ধূলায়, পাতায়, ডালে,
মানুষের হাসিতে, কান্নায়, অন্তরে, অন্তরে।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যধারণকারীদের সাথেই আছেন'।

—আল-কুরআন

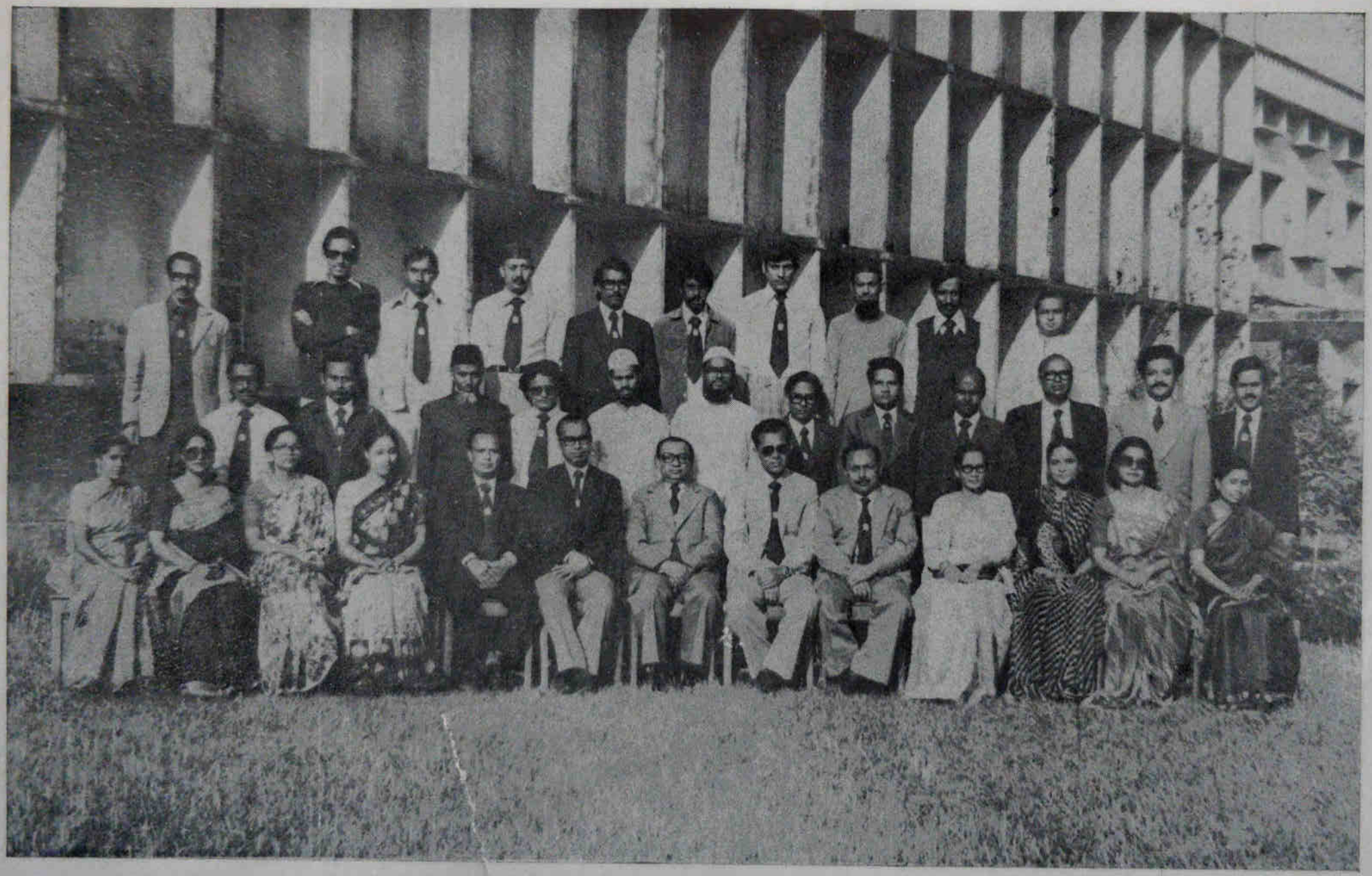

শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ

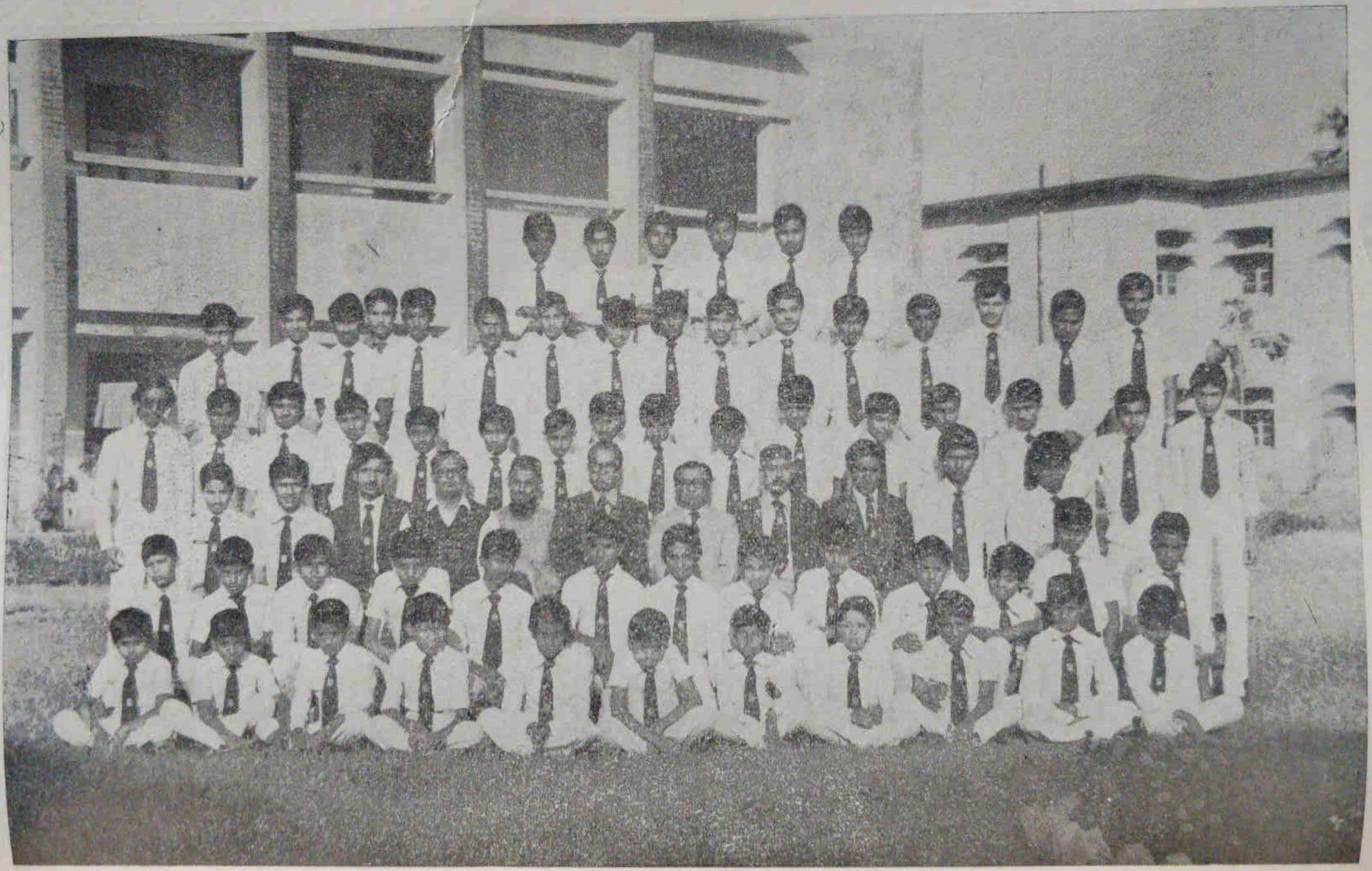

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা

বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ, ১৬৪৬
নবম শ্রেণী (বিজ্ঞান)

বাংগালী জাতীয়তাবাদের প্রথম বিস্ফোরণ রক্তে রঞ্জিত বায়ান্নর সেই একুশে ফেব্রুয়ারী ৮ই ফাল্গুন। বাংগালীর যে আত্মসচেতনা ও আত্মোপলব্ধির ফলশ্রুতি, তার প্রথম বীজ উপ্ত হয়েছিল বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী। তাই একুশে ফেব্রুয়ারী একটি বিশেষ নাম, একটি বিশেষ তারিখ, যার সংগে জড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশের সামগ্রিক জীবন-ইতিহাস, বাংলার সুখ-দুঃখ, বাংগালীর জাতীয় চেতনা।

এদিনে আমাদের হৃদয়াকাশ থেকে ঝরে পড়েছিল কয়েকটি সমুজ্জল নক্ষত্র—বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক, শফিক এমনি বাংলার আরও অনেক সূর্যসন্তান। তাদের বুকের তাজা রক্তে উদ্দীপ্ত হয়েছিল তখনকার বাংলার সাড়ে সাত কোটি নির্যাতিত নিপীড়িত বাংগালী। জাগ্রত হয়েছিল চেতন, আত্মসচেতনতা আত্মোপলব্ধি ও আত্মশুদ্ধি, যা জাগ্রত করেছিল বাংগালী জাতীয়তাবাদকে এবং অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। সে মহান একুশে ফেব্রুয়ারীরই অবদান। কিন্তু পারতঃপক্ষে সেটা শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের দিন ছিল না; এর সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষা নির্ণয় করে জাতির সভ্যতা, জাতির ইতিহাস, জাতির জ্ঞান-ভাণ্ডার ও সাংস্কৃতিক জীবনকে।

একুশ ছিল বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সংস্কৃতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এক দীপ্তোজ্জল দিবস। আপন মহিমায় এই দিনটি এতই প্রোজ্জল যে, এই একটিমাত্র দিনকে কেন্দ্র করেই বাংগালী জাতির সব আবেগ, চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা আবর্তিত হচ্ছে। কারণ একুশে ফেব্রুয়ারীর সেই ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র মাতৃভাষাকে স্থায়ী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সীমাবদ্ধ পরিসরে সীমিত ছিলো না, এটা ছিল বাংগালীর জাতীয় জাগরণের প্রাণবিন্দু। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকেই।

আমাদের ভাষা আন্দোলনের মূল পটভূমি আলোচনাকালে নির্যাতিত বাংগালী ও অতীত বাংলাদেশের রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জী সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। যদিও ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে, বছর ঘুরে একুশে ফেব্রুয়ারী এসেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই '৫২-এর শহীদ ভাইদের স্মৃতি। তদুপরি আমাদের বাংলা 'মা' বড়ই অভিশপ্ত। কত নির্যাতন, কত শোষণ তার ওপর দিয়ে চলে গেলো, তা বলা বাহুল্য। বিদেশী শাসনমুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র আবাসস্থল প্রতিষ্ঠাকল্পে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণ যে মরণাপন্ন সংগ্রাম করেছিলেন, তারই

ফলশ্রুতিতে দু'শো বছর গোলামীর পর বেনিয়া ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৪৭ সালে আমরা লাভ করেছিলাম পাকিস্তান। স্বাধীনতার নামে এক শকুনির কবল থেকে আর এক শকুনির শিকারে পরিণত হই আমরা অর্থাৎ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকরা। শাসন ক্ষমতা রয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের হাতেই। ১৯৪৭ সাল থেকে ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের যে ইতিহাস, তা—অবিচার, অত্যাচার, লুন্ঠন ও বর্বরতার ইতিহাস।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের অত্যাচারের প্রথম পর্বেই তৎকালীন সরকারের নানাবিধ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ আসে ভাষার উপর। অর্থাৎ তাদের সাথে পূর্ব বাংলার প্রথম সংগ্রাম বাধে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাসখানেকের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের নেতৃত্বে গঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'তমুদ্দিন মজলিস' রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সরাসরি উত্থাপন করে, রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাভাষাকে স্বীকৃতি দিবার দাবীতে কয়েকজন ব্যক্তির রচনা সংকলন প্রকাশ করে তমুদ্দিন মজলিসের উদ্দোগে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। গণপরিষদে বাংলাভাষা সংক্রান্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আনীত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে বাংলা ভাষার দাবী আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৪৮-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র ধর্মঘট হল। ১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘটে ছাত্রদের মিছিলের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ হয় এবং কতিপয় নেতৃস্থানীয় ছাত্র গ্রেফতার হয়। এরপর ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল কায়েদ-ই-আযম পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে বাংলাদেশের রাজধানীর বুকে স্পর্ধা ভরে বাংগালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তার সাহিত্যিকে উপেক্ষা করে ঘোষণা করেছিলেন—"একমাত্র উর্দুই হবে এদেশের রাষ্ট্রভাষা"। তখন পাকিস্তান নবজাতক মাত্র। সে লগ্নেই বাংগালী বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাজীবী, ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বজ্র নির্ঘোষে প্রতিবাদ তুলে না—না—না। যে ভাষা আমাদের মাতৃভাষা, যে ভাষায় আমরা 'মা'কে 'মা' বলে ডাকি, যে ভাষায় আমরা সুখ-দুঃখ, বেদনা ও অনুভূতি প্রকাশ করি, যে ভাষা বিশ্বকবির 'সোনার বাংলা', নজরুলের 'বাংলাদেশ', জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'কে প্রাঞ্জল করে তুলেছে, যে ভাষা আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক—সেই যে প্রাণের ভাষা, তার উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই এবং গোটা বাংগালী জাতি তা বরদাস্ত করবে না। ঘোষণার পর মুহূর্তেই বাংলার সংগ্রামী ছাত্র পরিষদ বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ তুললো এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তারা দীপ্ত সতেজ কন্ঠে জানিয়ে দিল, সংখ্যা লঘিষ্টের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা চলবে না। বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুললো "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।"

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাতেই ক্ষান্ত হল না। তাদের লোলুপ লেলিহান শ্যেন দৃষ্টি পড়ল বাংলার সম্পদ পাট, চা, ধান ও চামড়ার উপর। বাংগালী ব্যবসায়ীদের উৎখাত করে সেই স্থানে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের স্থলাভিষিক্ত করানোর অপচেষ্টা চললো ১৯৫০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারীর সাম্প্রদায়িক দাংগার মাধ্যমে। বাংগালী বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্প ও সংস্কৃতিবান মানুষ হল ছিন্নমূল।

এলো শোষণকারী পুঁজিবাদীর দল। কেড়ে নিল ওরা বাংলার সম্পদ। যাদের দেশে যারা ক্ষেতে ফসল ফলায়, যাদের শ্রমে কলকারখানার চাকা ঘোরে, যারা শিল্পকে দেয় নব নব রূপ, তাদের হাতে রইলো না কিছুই। তারা রইলো অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বাসস্থানহীন। এভাবে বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদে সম্পদবান হয়ে জন্ম নিল পশ্চিম পাকিস্তানের তেইশটি পরিবার। তাতেও তাদের দুর্বার তৃষ্ণা নিবারণ হলো না। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পণ্ড করার জন্য চললো আরও ঘৃণ্য অপচেষ্টা। রবীন্দ্রকাব্য, সংগীত ও সাহিত্যকে বেতার জগৎ থেকে বাতিল করা হলো। এই অপচেষ্টার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী চট্টগ্রামে এক জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দিনের ভাষণে। তিনি কায়েদ-ই-আযমের পূর্বোল্লখিত বাণীর সমর্থনে তার সুরে সুর মিলিয়ে ঘোষণা করলেন---"আমরা পাকিস্তানী, আমরা একজাতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি আমাদের এক, এবং অবিচ্ছেদ্য, উর্দূই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা"। সেদিনকার ঘোষণার ফলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। সমগ্র বাংগালী জাতি ক্ষোভে রোষে ফেটে পড়লো। শিক্ষাবিদ, ছাত্র-জনতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে জড় হলো। তাদের উত্তেজিত শরীরে তখন ফুটছিল উত্তপ্ত টগ্‌বগ্‌ রক্তস্রোত। বাংলার আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হলো "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"। সরকারী মনোভাবও কঠিন হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে ভাষা আন্দোলনও গণ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। ১৯৫২ সালের সেই পলাশ ফোটা আটই ফালগুনে বা ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে সে আন্দোলনে চরম বিস্ফোরণ ঘটে। রাজধানীর বাতাস সেদিন মৃত্যু কঠিত স্তব্ধতায় থমথমে হয়ে ওঠে। আকাশে বাতাসে আসন্ন কোন অঘটনের ইঙ্গিত। বিক্ষোভ মিছিল আর জনস্রোতকে রোধ করার জন্য সেদিন জারি হলো ১৪৪ ধারা। তবুও সেদিন বিকেলের দিকে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দলে দলে রাস্তায় বের হয়ে পড়লো খণ্ড খণ্ড মিছিলের মাধ্যমে। ছাত্রদলের মিছিলের দৃপ্ত পদভরে কেঁপে উঠলো শাসকদের অচলায়তন। সমুদ্র গর্জনের মত ফেটে পড়লো বিদ্রোহী বাংগালী ছাত্র-জনতার বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর। মিছিল আর শ্লোগানের উত্তপ্ত হল্‌কায় ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হল বাংলার আকাশে বাতাস। চারিদিকে কামানের গোলার মত বিস্ফোরণ ঘটলো ছাত্রজনতার--সেই বিস্ফোরণে ভেসে এলো শতকণ্ঠ, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। জোর কদমে এগিয়ে চললো--আরও সামনে। ঐ তো পথ--আর বেশী দূরে নয়। মাতৃভাষাকে পরম মর্যাদা দিতেই হবে। জান দিবে তারা, তবু মুখের ভাষাকে তারা ছিনিয়ে নিতে দেবে না। সরকারের সশস্ত্র বাহিনীও তাদের গতিরোধ করতে পারলো না। এই গণজাগৃতির উত্তাল তরঙ্গ রুখবার জন্য শান্তিকামী ছাত্রজনতার দিকে ছুটে এলো পুলিশের রাইফেল নিঃসৃত ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্র-সরমান 'বুলেট'। মাতৃমন্ত্রের সাধক প্রাণ দিলো সালাম, রফিক, শফিক, বরকত আরও কত ভাই। প্রাণ দিলো বাংগালী মজুর, রিক্‌সাওয়ালা ও অসহায় পথচারী। মেডিকেল কলেজের পিচঢালা কালো রাজপথে ফুটে উঠলো রক্তের আল্‌পনা। শাসকরা কয়েকটি সূর্যসন্তানকে আমাদের মাঝ থেকে ছিনিয়ে নিল, কিন্তু তাদের দেয়া শিক্ষা থেকে শাসকরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সংকল্প থেকে সংগ্রামী ছাত্রজনতাকে বিচ্যুত করতে পারলো না। ছাত্রজনতা বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুললো "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই","ছাত্র হত্যার বিচার চাই"। এই নির্মম বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ফলে প্রদেশব্যাপী অভূতপূর্ব পূর্ণ গণবিক্ষোভ দেখা দিলো। ভয়ে আঁতকে উঠলো কুচক্রী শাসকদের প্রাণ। অত্যাচারের বজ্র মুষ্টি শিথিল করে দিলো বাংগা-

লীর রক্ত। তারা নির্দিধায় স্বীকার করে নিলো বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রমর্যাদা দিয়ে। রক্তের বিনিময়ে আদায় হল ভাষার ন্যায়সঙ্গত অধিকার। গড়ে উঠলো 'শহীদ মিনার'। ন্যায্য সংগ্রামের শপথের তীর্থভূমি 'শহীদ মিনার'। প্রতি বছরের একুশে ফেব্রুয়ারী তাই আমাদের জীবনের এক সুদূর্লভ স্মৃতির দিবস।

একুশে ফেব্রুয়ারী চিহ্নিত হল 'জাতীয় শোক দিবস'। আমরা এই দিনকে 'শহীদ দিবসে'র মর্যাদায় সম্মান করি। ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের এতবড় দৃষ্টান্ত বিশ্বের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরল। আমাদের জীবনের সমগ্র অস্তিত্বে এই পবিত্র দিনের মর্যাদা ফুলের রেণুর মতই ছড়িয়ে থাকে। এদিনের ঐতিহ্য যদিও এক বেদনাময় স্মরণীতে প্রতিষ্ঠিত, তবুও তা আমাদের চৈতন্যে গৌরবের ঔজ্জ্বল্যে সুচিহ্নিত। ১৯৫২ সালের সেই দিনের তাৎপর্য কেবল শহীদ দিবস উদযাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা সমগ্র বাংগালী জীবনের সর্বত্র বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। একুশের চেতনাই বাংগালীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে এবং এর মাধ্যমেই বাংগালী আত্মসচেতন হয়ে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক, শফিকের রক্ত বৃথা যায়নি। ভাষা আন্দোলন বাংগালীকে দিয়েছে তার আপন সত্ত্বা আবিষ্কারের মহিমা—তার জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনা। ভাষা সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় মমতা থেকেই তারা দাবী জানাল--বাংলাদেশের মাটি আমাদের, এদেশের ভাষা আমাদের মুখের ভাষা, এদেশের সংস্কৃতি আমাদের অস্তিত্ব। এগুলো ব্যতীত বেঁচে থাকা নিরর্থক। এই চিন্তাধারায় বাংগালীর অন্তরে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বীজ বপন করা হয়েছিল। ভাষা আর সংস্কৃতিকে ভালবাসতে পেরেছিল বলেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল। সে কারণেই সেদিন বাংলাদেশের মানুষ হয়েছিল রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার। পশ্চিমা শাসক-গোষ্ঠী বুঝতে পারল বাংগালী জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করতে না পারলে তাদের স্বার্থসিদ্ধির সার্থক বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব নয়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংগালীর প্রতিবাদী চেতনা যতই শাণিত ও মহিমান্বিত হয়েছে, তথাকথিত পাকিস্তানী দমন ও সংহার নীতি ততোই কঠোর হয়েছে। সংস্কৃতিকে 'হিন্দু সংস্কৃতি' ও 'মুসলিম সংস্কৃতি' এই দুইভাগে ভাগ করে বাঙ্গালীদের হীনমন্য করে তোলার ষড়যন্ত্র হল। ওপার বাংলার গ্রন্থ পাঠ এবং সাহিত্যিকদের সাথে সংশ্রব রাখা অন্যায় – রবীন্দ্রজয়ন্তী ও পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন সংস্কৃতিবিরোধী ইত্যাদি আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার আমলের ফরমান। এই সর্বাত্মক প্রতিরোধের মুখে বাংগালীর প্রতিবাদী চেতনা ক্রমেই বলিষ্ঠ হতে থাকে এবং বাংগালীর ভাষা আন্দোলন স্বাধিকার ও মুক্তিমুখী হয়ে উঠে। একুশের রক্তঝরার রঞ্জিত প্রাণে বাংগালী তার মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির সর্বাত্মক মুক্তির শপথ গ্রহণ করে দৃঢ়কণ্ঠে। তারই চরম বিস্ফোরণ ঘটে ঊনসত্তর হতে একাত্তরে।

একুশের প্রেরণা থেকেই ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের উৎপত্তি। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে উঠলো বাংগালী সংগ্রামী চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। একুশের রক্তে রাঙ্গা পথ ধরে বাংগালী এগিয়ে এলো শোষকের গ্রাস থেকে মাতৃভূমি রক্ষার্থে। কিন্তু না--এখানেও এলো বাধা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে শুরু হয় ঘুমন্ত বাংগালীর প্রতি অত্যাচারের আর এক নব অধ্যায়। বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী বাংগালী জাতীয় জীবনের সংগ্রামের তীর্থভূমি শহীদ মিনারকে ভেঙ্গে ফেলে। কিন্তু তারা জানতো না—এহেন উগ্র হামলায় তৎকালীন বাংলার

সাড়ে সাত কোটি মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় অংকিত তার হৃদয়ের দুলালদের স্মৃতিকে মুছে ফেলা যাবে না। তাদের স্মৃতির আদর্শকে সামনে রেখে বাংগালী জাতি আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। একুশে ফেব্রুয়ারী চিহ্নিত হল বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, শোষকের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের বিমূর্ত প্রতীক হিসেবে। পরবর্তীকালে নিরবিচ্ছিন্ন সংগঠিত সংগ্রামের মাধ্যমে বাংগালী তার ভাষার দাবিকেই শুধু প্রতিষ্ঠিত করে নাই; এই একুশে ফেব্রুয়ারীকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সমস্ত আন্দোলনের প্রাণশক্তির বিকাশ। পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদী তাদের স্বার্থের বেদীমূলে বাংলা ভাষাকে, বাংলা সংস্কৃতিকে যতবার বলি দিতে চেয়েছে, ভাষা আন্দোলনের রস সঞ্চিত বাংলার নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখে ততবারই তাদের পিছু হটে যেতে হয়েছে। সংগ্রামী বাংলার এই সাফল্যের আরও কারণ, বাংলার মানুষ সেদিন সম্যক উপলব্ধি করেছিল, তার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, তার রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তিভূমি এবং তার রাজনৈতিক চেতনা, তার বাংগালী জাতীয়তাবোধ, তার সংস্কৃতির অতন্দ্রপ্রহরী। এই সংগ্রামী চেতনাই বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের দুই ধারাকে এক সূত্রে গ্রথিত করে মুক্তি-সংগ্রামের মোহনায় এনে দিয়েছে। তারপর মুক্তিসংগ্রামে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে 'স্বাধীনতা' নামের লাল সূর্যকে ছিনিয়ে আনলো বাংলা মায়ের লাখো লাখো তেজ-দ্বীপ্ত সন্তানেরা। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীর বরকত, সালাম, রফিক, শফিক, জব্বারের বুকের রক্তে অবগাহন করে বাংলাদেশের পূর্ব দিগন্তে স্বাধীনতার রক্তসূর্যের উদয় হয়েছে। তাই--

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী,
আমি কি ভুলিতে পারি।"

সুতরাং একুশে ফেব্রুয়ারী বা ভাষা আন্দোলনের আরেকটা বড় পরিচয় বাংগালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম আনুষ্ঠানিক চেতনা সঞ্চারের দিন হিসেবে। অতএব ভাষা আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি ধ্রুবতারার ন্যায় দিক নির্দেশ করে যাচ্ছে। ভাষার অধিকার থেকেই বাংগালীর মনে জাতীয় অধিকারের চৈতন্যোদয় এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতি আমাদের স্বাধীনতা। তাই বলতে পারি—ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই আমরা এগিয়ে চলেছি, ধাবিত হয়েছি অভীষ্ট লক্ষ্যে এবং ছিনিয়ে এনেছি স্বাধীনতার রক্তে রাঙ্গা সূর্য। অতএব, এ কথা চিরসত্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা অবিস্মরণীয়, অপরিসীম।

প্রতি বছর নির্ধারিত দিনে কৃষ্ণচূড়ার আগুনে ঝরানো লাল আভা ছড়িয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী আসে। গানের বাণী দিয়ে, শ্লোগান ফেষ্টুন, ফুল, মালা আর ব্যানারের মাঝে সকলেই ২১শে-কে শ্রদ্ধা জানায়। কিন্তু এর মাঝে একুশের সার্থকতা কোথায়? একুশের সার্থকতা তখনই আসবে যখন বাংগালী তার জীবনের প্রতিটি কাজ-কর্মে, আদর্শে, সংস্কৃতিতে একুশের আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে। বাংলা ভাষাকে আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল করে তুলতে পারবে। একুশকে কেন্দ্র করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংগালী জাতীয়তাবাদের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। একুশকে কেন্দ্র করে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে জোয়ার এসেছে সত্য, তবুও বলবো—হয়েছে অনেক—কিছু আবার অসমাপ্তও রয়েছে। আত্ম-

সমালোচনার দর্পণে যদি সেই অক্ষমতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করি, তাহলে দেখবো—প্রতিবারই একুশ এসেছে, আবার বিদায় নিয়েছে। একুশেতে শপথ নিয়েছি মায়ের মুখের ভাষাকে জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহার করার। পরাধীন জীবনে সে স্বপ্ন ও সাধনাকে বাস্তবায়িত করার পথে হয়তো বহু প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর সে প্রশ্ন উত্থাপিত হবার কোন অবকাশ নেই। এবারের একুশ যেন ঠিক এমনি একটা গতানুগতিক শপথ বাণী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত না হয়, সেদিকে আমাদের নেত্রপাত করতে হবে। লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা এসেছে তাকে সার্থক করে তুলতে হবে বাংলাভাষা আর শিল্প-সাহিত্যকে হৃষ্টপুষ্ট, সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে। আর একুশই হবে তার প্রেরণার উৎস। নতুবা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে কালক্রমে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য অসাড় ও অর্থহীন হবে।

মায়ের কান্না, বোনের অশ্রুর বন্যায় অবগাহন করে আবার ফিরে এসেছে অমর একুশে ফেব্রুয়ারী। বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে সংগ্রামী জনতার উচ্ছ্বসিত বাণী বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার জয়গানে। শহীদ ভাইয়েরা মরেও অমর হয়ে আছে এই সুন্দর ধরণীর বুকে, থাকবেও তারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ইতিহাসের পাতায় আর বাংগালীর মনের মণিকোঠায়। বছরের পর বছর একুশে ফেব্রুয়ারী আসে নবশক্তির প্রেরণা নিয়ে, স্বাধীনতার বিজয় টিকা ললাটে পড়ে। বন্দিনী 'মা'কে মুক্ত দেখে প্রাণ খুলে হাসে তাদের অমর আত্মা, ফেলে তারা মুক্তির সুস্থ নিঃশ্বাস। মাতৃভাষার পরম পর্যাদা রাখতে গিয়ে স্বৈরাচারীর বুলেটের নির্মম শিকার হয়েছিল কত তরুণ প্রাণ।

আজ বাংলার প্রতিটি গৃহে মা-বোনেরা রক্তের আল্‌পনার মাঝে প্রস্ফুটিত ফুলের স্তবক দিয়ে পালন করছে যাদের স্মৃতির পবিত্র অনুষ্ঠান, তাদের মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হোক, বাংলার প্রতিটি প্রাণ, ধন্য হোক পবিত্র মাতৃভূমি। তাদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, আমাদের মন আজ ভারাক্রান্ত, ভাষা আজ স্তব্ধ, লেখনীর গতি আজ মন্থর।

হে শহীদ ভাইয়েরা আমার! তোমাদের আত্মোৎসর্গের আজ ৩০টি বছর ঘুরে এসেছে। তাই আমার অন্তরের ত্রিশটি রক্ত-গোলাপ দিয়ে জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। পরিশেষে মনে পড়ে একুশের সেই অমর পদ্যছত্রঃ

"মায়ের বুকের ধন
মায়ের নয়নমণি, আশা
বক্ষ রক্তে লিখে গেছে
বাংলা মোর ভাষা।"

(১৯৮১ সালে শহীদ দিবস উপলক্ষে রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত)

ঋতুর খেলা

সালাউদ্দিন হেলাল, ১৮২৫
অষ্টম শ্রেণী 'খ'

বাংলা তোমায় ভালবাসি,
তাই তোমাকে 'মা' ডাকি।
ছয় ঋতুর খেলা খেলে,
চলছ তুমি দিনে-রাতে।
গ্রীষ্ম আসে, মাটি ফাটে,
আম, কাঁঠালের ধূম যে পড়ে।
যখন মাগো বর্ষা আসে,
ধান-পাট যে ডুবে মরে।
খালে-বিলে শাপলা ফুটে
শরৎ যখন আসে,
শিশির বিন্দু ছড়িয়ে পড়ে
প্রভাতের ঘাসে।
ধান পাকতে শুরু করে
হেমন্তেরই সাথে,
চাষী ভাইদের সাড়া পড়ে
ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে।
শীত যখন এসে পড়ে
ষড়ঋতুর মাঝে,
অরণ্যের সব পশু-পাখী
গর্তে গিয়ে ঢুকে।
কোকিলের কুহু কুহু তান আসে
বসন্তেরই সাথে,
নানা রকম ফুল ফোটে
মাতৃভূমির কোলে।

●

'ঐ গৃহে রহমতের ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করেনা, যথায় কুকুর কিংবা জীবের ছবি আছে'।

— আল-হাদীস

কাল্ট দেশে দেশে

ইকবাল হাবীব, ১৮৮৪
দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

স্বামী সাতসমুদয় ওরফে ডেভিড একস্টেইন একজন ইহুদী। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিটলারের ৫টি Concentration Camp-এ তাঁকে কাটাতে হয়েছে। ক্যাম্পের অভিজ্ঞতার কারণে তাঁকে ছয়বার অপারেশনের টেবিলে শুতে হয়েছে। এই ডেভিড তারপর হতাশাচ্ছন্নভাবে জীবন কাটাতে থাকে। তারপর একদিন তিনি 'রজনীশ আশ্রম' থেকে এক সন্যাসিনীর চিঠি পান। চিঠির আবেগপূর্ণ বক্তব্য তাকে 'রজনীশের' বিষয়ে পড়াশুনা করতে আগ্রহান্বিত করে। অতপর সোজা আশ্রমে আগমন। তার মতে আশ্রমের সাহচর্যে সে এখন শান্তিময় জীবনের অধিকারী।

ভারতবর্ষের বর্তমান Favourite গুরু 'ভগবান রজনীশের আশ্রম' সম্পর্কে এই ধারণা ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরের এক ইহুদীর। টুরিস্টদের প্রধান আকর্ষণ এখন এই 'রজনীশ আশ্রম'।

গায়ানায় প্রায় ৯০০ একর ঘন জঙ্গল পরিস্কার করে প্রায় হাজারখানেক মার্কিনী তাদের নেতা 'জিম জোনসের' নেতৃত্বে পত্তন করেছিল 'জোনস টাউনের People's Temple' নামক সংস্থা। এইতো গত বৎসরের প্রথমভাগে সেই জিম জোনসের নির্দেশে তার ৯০০ অনুসারী পটাসিয়াম সায়নাইড পানে আত্মহত্যা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এত ভয়াবহ নির্লিপ্ত আত্মহত্যা আর কখনও ঘটেনি।

দু'টি ঘটনা, একটি প্রাচ্যের এবং অপরটি পাশ্চাত্যের, দু'টি কাহিনীরই একটি জায়গায় মিল রয়েছে; তা হচ্ছে একটিমাত্র ব্যক্তি বিশেষের কাছে আত্মসমর্পণ; সে ব্যক্তির ইচ্ছাকে আদেশ হিসেবে মেনে নেয়া, আর এ থেকেই উৎপত্তি 'কাল্ট'-এর। কাল্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে 'কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি গভীর অন্ধ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপনকারী সম্প্রদায় সংক্ষেপে যাকে বলা হয় 'অবতারবাদী'।

জোনস টাউনের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। ৯০০ লোক কি ভাবে নির্দ্বিধায় বিষ পান করে মারা গেল। অবশ্য এটাও সত্যি যে অনেকেই বিষ পান করতে চায়নি, কিন্তু অধিকাংশই স্ব-ইচ্ছায় করেছিল। অর্থাৎ নেতা জোনস তার অনুসারীদের মন সম্পূর্ণভাবে নিজের মুঠোয় নিয়ে এসেছিলেন।

এবার দেখা যাক কাল্ট সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীদের ধারণা কি? তাঁরা ধর্ম এবং সেক্ট থেকে আলাদা করেছেন। ধর্ম সাধারণ মূল্য বোধের রক্ষক, সেক্ট হচ্ছে ধর্ম সম্প্রদায়, এরা আংশিকভাবে সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে; প্রতিষ্ঠিত নীতিকে পরিশুদ্ধ করার মানসে।

কিন্তু যখন একটি গ্রুপ সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত ধর্মীয় পদ্ধতি ত্যাগ করে এবং এককভাবে একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ, জাঁকালো, চমক লাগানো সর্বোপরি সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীন ব্যক্তির নেতৃত্বকে মেনে নেয় তখনই 'কাল্ট'-এর সৃষ্টি হয় এবং এভাবে একেকটি কাল্ট ভক্ত সৃষ্টি করে বড় হয়ে উঠে। পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে এ ধরনের কাল্ট প্রচুর। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে 'কাল্ট জ্বরের' আধিক্য লক্ষিত হচ্ছে।

কাল্টকে আমরা আবার একটি সংস্থা হিসাবেও গণ্য করতে পারি। যেমন জোনসের পিপল্‌স টেম্পল; কারণ সংগঠন না থাকলে নেতা হওয়া যায় না এবং সংগঠনে কিছু কর্মী থাকে যারা অহরহ তাদের গুরুর ভাবমূর্তি গড়ে তোলায় ব্যস্ত।

প্রায় প্রতিটি কাল্ট নেতাই সমাজ সেবার মধ্য দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করেন। তার মধ্যে খানিকটা ধর্মীয় দিক, খানিকটা আধ্যাত্মিক ভণ্ডামী থাকে। পরবর্তীতে ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা হয়ে উঠে বিলাসী ও উদ্ধত।

সমাজ বিজ্ঞানী ম্যানহেইমের মতে, 'বেকারত্ব, ধনবৈষম্য, ব্যার্থতা, গ্লানিবোধ ইত্যাদি কারণে যখন মানুষের জীবন-পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যায় তখনই তারা কাল্টের শরণাপন্ন হয়।'

কাল্টের কর্মীরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পরীক্ষার সময় হয় তখনই এই সব এলাকায় হানা দেয়। কারণ স্বভাবতই এই সময় ছাত্র-ছাত্রীরা মানসিকভাবে দুর্বলতা বোধ করে। এইভাবে ব্যার্থতা আর গ্লানি বোধে বিপর্যস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের খুঁজে বের করে খেলাধূলা, নৃত্য-গীত, ভাসা-ভাসা ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে তাদের দলে টানে এই নতুন সদস্য-সদস্যাদের সহজে ঘুমাতে বা চিন্তা করার অবকাশ দেওয়া হয় না। তাদেরকে বলা হয়—'চিন্তা করার কিছু নেই, নেতা বা গুরুই তোমার জন্য চিন্তা করছেন।' এভাবেই নতুন সদস্য-সদস্যাদের কাল্টের একনিষ্ঠ অনুসারীতে গড়ে তোলা হয়।

এবারে কিছু এই ধরনের কাল্ট সংগঠন সম্বন্ধে বলবো।

সিনানোন ঃ ১৯৫৮ সনে, প্রাক্তন এক মদ্যপ, চার্লস ডেডেরিচ ক্যালিফোর্নিয়ায় এর প্রতিষ্ঠা করেন। তখন একে বলা হতো "মদ্যপ বা ড্রাগসেবীদের সুস্থ করে তোলার প্রতিষ্ঠান।" বর্তমানে এই সিনানোন ৯০০ সদস্যের একটি কাল্ট সংস্থায় পরিণত হয়েছে। ডেডরিচ নাকি এখন চেষ্টা করছেন তার মতবাদকে ধর্মে রূপ দিতে।

ডিভাইন লাইট মিশন ঃ ১৯৭১ সনে মাত্র ১৫ বছরের এক গুরু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান একবার আমেরিকায় মহা হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছিল। ঐ সময় সমগ্র বিশ্বে ঐ গুরুর প্রায় ১০ মিলিয়ন অনুসারী ছিল। এই গুরুর নাম "সত্যগুরু মহারাজ জী।" তার একটি "রোলস রয়েস" গাড়ী ছিল।

পিপলস টেম্পল ঃ এর প্রতিষ্ঠাতা জেমস ওয়ারেন জোনস। কাল্ট নিয়ে সারা বিশ্ব জোড় আলোচনার সৃষ্টি হয়, তা এই জোনসের কারণেই। এর সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে।

এছাড়া আরও অনেক এরূপ সংগঠন আছে। যেমন, ইউনিফিকেশন চার্চ, চিলড্রেন অব গড ইত্যাদি।

ভারতের দুইজন সেরা কাল্টের একজন "রজনীশ" যার সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে, অপরজন হচ্ছেন সাঁই বাবা, পণ্ডিত রবিশংকর পর্যন্ত এর ভক্ত।

একবার হয়েছে কি, ভারতের বিখ্যাত যাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র সাঁই বাবার সাথে দেখা করতে চাইলেন। সাঁই বাবা রাজি হলেন না। পি. সি. সরকার জুনিয়র পরে আবার নাম বদলিয়ে তার সাথে দেখা করতে চাইলেন এবার অনুমতি মিললো, তিনি গিয়েই সাঁই বাবাকে প্রণাম করতে সে "শূন্য" থেকে এক টুকরা সন্দেশ এনে পি.সি. সরকারকে খেতে দিলো। উল্টো পি. সি. সরকারও তৎক্ষণাৎ তাকে শূন্য থেকে আর একটি সন্দেশ এনে খেতে দিলেন। ব্যাপারটি বুঝতে পেরে সাঁই বাবা তাকে তাড়িয়ে দিলেন। পি. সি. সরকারের মতে, "স্রেফ ভণ্ডামীর জোরে আর কিছু কলাকৌশল শিখে সাঁই বাবা টিকে আছেন।" ভক্তরা বলে তার ছবি থেকে নাকি জ্যোতি বের হয়। মূলতঃ ছবিতে এক ধরনের পদার্থ মেখে দেওয়া হয়।

আসলে শুধু সাঁই বাবাই নয়, পাশ্চাত্যেও যারা "গুরু" তারাও খানিকটা কলাকৌশল আত্মসম্মোহন প্রভৃতির মাধ্যমে অজ্ঞ ভক্তদের সম্মোহিত করে।

বছর কয়েক আগে, আমাদের ঢাকা শহরেও এক কাল্টের উদ্ভব হয়েছিল "নূরা পাগলার" বদৌলতে। বিধাতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে অংকুরেই তার বিনাশ সাধন হয়েছে।

কাল্টের গুরুরা ভক্তদের বন্ধন দৃঢ় রাখার জন্যে জাল ভালবাসার বদলে এক কল্পিত শত্রুও সৃষ্টি করে এবং ভক্তদের বুঝানো হয় যে গুরু তাদের এই শত্রু থেকে মুক্ত রাখবেন, বর্তমানে এই কাল্টদের প্রসার বাড়ছে।

তবে জোনস টাউনের ট্রেজেডীর পর বিভিন্ন দেশের সরকার 'কাল্ট' নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা করছেন। কিন্তু এইসব ব্যবস্থাকে কাল্ট গুরুরা আবার চিহ্নিত করছেন মৌলিক নাগরিক অধিকার ও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ হিসাবে। আসলে এই সমস্যার সমাধান তখনই হবে যখন সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। সামাজিক নিপীড়ন ও বৈষম্য থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। কারণ স্বার্থান্বেষীরাই তাদের স্বার্থে "কাল্টকে" জিইয়ে রাখতে চায়।

●

ওরা (মুমিনরা) সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, বিনয়ী, আল্লাহর পথে খরচ করে এবং রাত্রির শেষ ভাগে মাগফেরাতের জন্য কাঁদে'।

—আল-কুরআন

সেজান

তানভীর আহ্‌সান, ২৮৭০
চতুর্থ শ্রেণী 'খ'

কার্টুন ছবির নায়ক সেজান।
তাকে দেখলে সবাই এদিক-সেদিক পালান।
দুটি আংটিতে লাগলে ঘষা,
হবে কিনা তারি দশা
জানা-অব-দি-জঙ্গল পারে না তার সাথে
একবার যদি পড়ে হাতে নাতে।

শিয়াল মামা

কাজী সাজ্জাদ হোসেন, ২৫১৭
চতুর্থ শ্রেণী 'খ'

হুক্কা হুয়া! ওটা কি?
শিয়াল মামার চশমাটি
চশমা যদি না পায়,
শিয়াল মামা চটে যায়।
কুকুর যদি ধাওয়া করে,
লেজ গুটিয়ে দৌড় মারে।
মোরগ-মুরগী ধরলে পরে,
ঘার মটকিয়ে মাথায় ধরে।

আমাদের হোষ্টেলে

এ, কে, এম, শাম্মি মাহ্‌বুব, ২৮২৩
দ্বিতীয় শ্রেণী

আমাদের হোস্টেলে
হাসি আর খুশী আছে।
বড় বড় মাঠ আছে,
পাখী ডাকে গাছে গাছে।
নেই কোন ঝোঁপ ঝাড়
আছে শুধু ফুল গাছ।
বড় বড় দালান আর
পুকুরেতে মাছ।

ভুড়িওয়ালা

আবুল খায়ের, ২৮১৬
দ্বিতীয় শ্রেণী

সে এক ভুড়িওয়ালা
হাটে শুধু বাড়িয়ে গলা।
কেউ তাকে খুঁজলে,
শুধু পালিয়ে বেড়ায়।
সে শুধু বলে,
জেলে নিল আমায়।

কৌতুক

জিয়া মহিউদ্দিন, ২৫১০
চতুর্থ শ্রেণী 'খ'

এক

দারোগা (চোরকে) : গতবার তো চুরি করে এসেছিলে। এবার কি করে আসলে?

চোর : পুলিশের গাড়ীতে করে।

দুই

প্রথম বন্ধু : বৈজ্ঞানিকরা যখন শুন্যে রকেট পাঠায়, তখন তাতে ইঁদুর চাপিয়ে দেয় কেন?

দ্বিতীয় বন্ধু : ইঁদুর পৃথিবীর শষ্যের ক্ষতি করে, তাই।

তিন

দুইজন লোক খুনের দায়ে ধরা পড়লো। বিচারে তাদের ফাঁসির হুকুম হলো।

প্রথম খুনীকে ফাঁসি দিয়ে নদীতে ফেলে দেয়া হলো। তাই দেখে দ্বিতীয় খুনী কাঁদতে লাগলো। দারোগা জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কাঁদছো কেন?" উত্তরে সে বললো, "ফাঁসি দেওয়ার পর আপনারা আমাকে নদীতে ফেলে দিবেন। কিন্তু আমি তো সাঁতার জানি না।"

চার

প্রথম লোক : আপনি তো আপনার ভাইয়ের বিয়েতে গেলেন। কি খেলেন, কি পেলেন, কি দিলেন?

দ্বিতীয় লোক : কিল খেলাম, ব্যথা পেলাম, দৌড় দিলাম।

পাঁচ

এক পথচারী অন্য এক পথচারীর ঘাড়ে হাত দিয়ে জানতে চাইলো, "এই যে ভাই, এটা কি গুলিস্তান।"

দ্বিতীয় পথিক গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, "না, এটা আমার কাঁধ।"

পৃথিবীর উৎপত্তি রহস্য

কবিরুল ইয়াজদানী খান, ২৯০২
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)

আমরা বিধাতার সুন্দর সৃষ্টি এ ধরণীতে বাস করছি। চারিদিকে মৃদুমন্দ বাতাস, ফুলের মিষ্টি হাসি আর পাখীর কলগানে ধরিত্রী যেন মেতে উঠেছে--তার সাথে মেতে উঠেছি আমরা পৃথিবীর সৌন্দর্য-সুরা পান করে। এ সুন্দর ধরণীর উষালগ্ন কবে, কোন দিন, তা জানার ইচ্ছা আমরা পোষণ করি কি? পৃথিবীতে বাস করে আমরা অনেকেই পৃথিবীর উৎপত্তির ইতিহাসই জানিনে। এই নিবন্ধে সে বিষয়ে আলোকপাত করতে চেষ্টা করবো।

আমাদের এই পৃথিবীর বয়স আনুমানিক পাঁচশত কোটি বছর। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মতবাদ প্রণয়ন করেছেন। ওয়েগনার, ড্যালী, জেফারসন প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ রেখেছেন। তবে অধ্যাপক টি.সি. চেম্বারলিন ও অধ্যাপক এম. আর. মুলটনের 'গ্রহকণা মতবাদ' সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তথ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই মতবাদ অনুসারে জ্বলন্ত বাষ্পকুণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত সূর্য হতে পৃথিবী তথা সৌরজগতের উৎপত্তি হয়েছে। সূর্য বৃহৎ জ্বলন্ত বাষ্পকুণ্ডলী ছাড়া আর কিছুই নয়। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে, সূর্যের পৃষ্ঠদেশ সব সময় উত্তাল ও বিক্ষুব্ধ। কখনো কখনো প্রচুর সৌর-বস্তু সৌর বিস্ফোরণের আকারে প্রচণ্ড গতিতে সূর্যপৃষ্ঠ হ'তে বাইরের দিকে শত শত মাইল পর্যন্ত ধেয়ে আসে। চেম্বারলিন ও মুলটন চিন্তা করেন যে, যদি অপর একটা নক্ষত্র স্থির-বাষ্পাকার সূর্যের নিকটস্থ হয় তবে নিঃসন্দেহেই সূর্যপৃষ্ঠে ভয়ঙ্কর জোয়ারের সৃষ্টি হবে এবং বিস্ফোরণ ঘটানোর সম্ভাবনা দেখা দিবে। সৌরজগত সৃষ্টির সময় এইরূপ অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল। কোন একটা দ্রুতগতিসম্পন্ন শক্তিশালী বৃহৎ নক্ষত্র স্বীয় গতিপথে চলতে চলতে সূর্যের নিকটবর্তী হয়, তখন বাষ্পীয় সূর্যের উপরিভাগের বৃহৎ এক অংশ অজানা নক্ষত্রটির বিপুল আকর্ষণে সূর্য হতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং নক্ষত্রটির গতিপথ অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিখণ্ডিত অংশটি উক্ত নক্ষত্রটির নিকটবর্তী হবার বহু পূর্বেই বিপুল গতিসম্পন্ন হেতু উহা বহুদূর পথ অতিক্রম করে ফেলে এবং খণ্ডিত অংশের আকর্ষণের বাইরে যায়। তখন উহা অসহায় অবস্থায় উলম্ব আকারে নিকটবর্তী নক্ষত্র সূর্যের চতুর্দিকে পরিক্রমণ শুরু করে। বহুকাল ঘূর্ণনের মধ্য দিয়ে এই বৃহৎ জ্বলন্ত বাষ্প-পিণ্ডের মধ্যস্থ বস্তু-কণাগুলো তাপ বিকিরণ করে ধীরে ধীরে শীতলতা প্রাপ্ত হয়। বৃহৎ বস্তু-কণাসমূহ ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র কণাগুলোকে আকর্ষণ করে আয়তনে বড় হয়ে উঠে। এভাবে বিখণ্ডিত সম্পূর্ণ অংশটি কতকগুলো বৃহৎ বলের আকারে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। সূর্যকে প্রদক্ষিণরত এই বৃহৎ জ্যোতিষ্কগুলোকে আমরা গ্রহ বলে জানি। নমনীয় ও প্রসারণশীল পদার্থকে দু'দিক থেকে টান দিলে উহার প্রান্তদ্বয়ের দিকে

চিকন ও মাঝখানে মোটা আকার ধারণ করে। ঠিক তেমনিভাবে সূর্যের নমনীয় ও প্রসারণশীল উপাদান কোন নক্ষত্রের আকস্মিক আকর্ষণে সূর্য হতে লম্বা আকারে বিচ্ছিন্ন হয় বলে উহার প্রান্তদ্বয় প্রথমতঃ সূক্ষ্ম ও মাঝখানে বেশ মোটা থাকে এবং তাই পরবর্তীতে উহা হ'তে উৎপন্ন প্রান্ত গ্রহগুলো আকারে ছোট ও মাঝখানের গ্রহগুলো অপেক্ষাকৃতভাবে আকারে বড় হয়। সূর্যের নিকটবর্তী বুধ, শুক্র এবং সূর্য হতে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী নেপচুন, প্লুটো প্রভৃতি গ্রহ মধ্যম দূরবর্তী গ্রহ বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি অপেক্ষা আকারে ছোট। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী তথা সৌরজগতের গ্রহসমূহ অজানা নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্য হতে সৃষ্টি।

এই গ্রহগুলোর আশে পাশে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিসম্পন্ন কেন্দ্রকে ঘিরে আরও ছোট ছোট গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও নিজেদের গতিবেগের ফলে বৃহদায়তন কেন্দ্রগুলোর আকর্ষণে তাদের সাথে সম্মিলিত না হয়ে বরং নিকটস্থ কেন্দ্র বা গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করা শুরু করে। এগুলোকে উপগ্রহ নামে অভিহিত করা হয়। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চন্দ্র ২৯ দিনে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

আমাদের এই পৃথিবী তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিক্ষিপ্ত নক্ষত্ররাজির নিছক সমাবেশ নয়। ইহা সুপরিকল্পিত জটিল সৃষ্টি। পৃথিবী ও সৌরজগতের উদ্ভব সম্পর্কে কোন্ মতবাদ সম্পূর্ণ সঠিক তা নির্দিষ্ট করে বলা এখনো সম্ভব হয়নি এবং আদৌ সঠিক মতবাদ প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে কিনা তাও বলা শক্ত। প্রকৃত পক্ষে প্রণয়নকৃত মতবাদসমূহ Hypothesis-এর উপর নির্ভরশীল। তবে মহাশূন্যে মানুষের বিজয়-কেতন উড়তে শুরু করেছে। সুতরাং আশা করা যায় যে, মানুষ অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে গমন ও অনুসন্ধান করে অদূর ভবিষ্যতে সৃষ্টির আদি রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হবে। এ সৃষ্টি যে বিধাতার সুষ্ঠু, সুন্দর, সুপরিকল্পিত সৃষ্টি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

●

'বিবাদ ও কলহ্‌প্রবণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সর্ব্বাধিক ঘৃণিত'।

—আল-হাদীস

পৃথিবী ও মানুষের জন্ম কথা

(সংকলিত)

সৈয়দ ইউসুফ কামাল, ২৩৯৫
সপ্তম শ্রেণী 'ক'

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঃ

বৈজ্ঞানিকদের মতে কোটি কোটি বছর পূর্বে ঘূর্ণায়মান নীহারিকা পুঞ্জ কয়েকটা খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় এবং একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে মূল নীহারিকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। প্রথমাবস্থায় এগুলি ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত ও তরল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আবর্তনের ফলে ক্রমে এই অংশগুলির উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে আসে এবং কঠিন আকার ধারণ করে। বৈজ্ঞানিকরা এগুলির নাম দিয়েছেন গ্রহ। এ পর্যন্ত তারা বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মংগল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো নামে নয়টি গ্রহ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আকস্মিক কোন একটা ঘটনার মাধ্যমে নীহারিকার বুক থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে অন্যান্য গ্রহগুলিসহ পৃথিবী একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব ও নির্দিষ্ট গতি বজায় রেখে মূল নীহারিকাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। লক্ষ লক্ষ বছর ঘুরার পর পৃথিবী এমন অবস্থায় এসে পৌঁছায়, যখন তার বুকের ওপর বৃক্ষলতা জন্মাতে শুরু করে। জন্মায় জীবজন্তু, পশু-পক্ষী। তারপরও কেটে যায় লক্ষ লক্ষ বছর।

মানুষ নামের কোন প্রাণী যে কোনদিন স্বর্গচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করছে, একথা বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করেন না। তাদের মতানুসারে পৃথিবীর আবর্তন বিবর্তনের ফলে তার বৃক্ষলতা জীবজন্তুরও পরিবর্তন সাধিত হয়। মানুষ সেই পরিবর্তনেরই স্বাক্ষর। অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের বানর জাতীয় কোন প্রাণীর উত্তর পুরুষ আজকের মানুষ। বিবর্তনের যে রূপরেখা বৈজ্ঞানিকরা অংকন করেছেন, তার চমৎকারিত্বে অবাক বিস্ময় নিয়ে এই যুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া বিশ শতকের যুক্তিবাদী পৃথিবীর সামনে প্রতিবাদ জানানোর মতো দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই।

ধর্মের দৃষ্টিতে ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে 'কুন' (হও) শব্দ দ্বারা খোদা পৃথিবী সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ খোদা বলেন, 'হও'। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সৃষ্টি। তারপর একে একে তিনি বৃক্ষলতা, নদী-নালা, সাগর-ভূধর, পশু-পক্ষী, জীবজন্তু দিয়ে পৃথিবীকে সজ্জিত করেন। অতঃপর স্বর্গ থেকে আদম এবং হাওয়াকে পাঠান দুনিয়া আবাদ করতে।

এখানে নির্দিষ্ট কোন সময়সূচী নেই। কতদিনে পৃথিবী গঠিত হল, মানুষহীন অবস্থায় কতদিন পৃথিবী বিরাজ করেছিল কিংবা কত বছর পূর্বে আদম-হাওয়ার আবির্ভাব ঘটেছিল। পৃথিবীর এই জন্ম ইতিহাস যাই হোকনা কেন, তার সময়সীমা নির্দিষ্ট করে কেহ বলতে পারে না। ইসলামও সেখানে নীরব এবং বৈজ্ঞানিকরাও তাঁদের গবেষণালব্ধ লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি শব্দগুলি প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। এর বেশী এগুলো সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

তবুও আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি যে, বৈজ্ঞানিকদের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শব্দগুলি 'কুন' শব্দেরই আওতাধীন। অর্থাৎ খোদার কাছে যেটা মুহূর্ত সাধারণ মানুষের কাছে তা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছরের ব্যাপক সময়সীমা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ কোরান শরীফে যখন নির্দিষ্ট সময় কিছু দেওয়া নেই, তখন তা মুহূর্তও হতে পারে আবার একদিন কি এক বছর বা এক লক্ষ কোটি বছরও হতে পারে। সুতরাং পৃথিবী ও তার জীবজন্তু বৃক্ষলতা, জন্ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকের মতের সাথে ধর্মীয় মতের কোন বিরোধ থাকতে পারেনা।

মানুষের জন্ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও ধর্মমতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। কারণ বৈজ্ঞানিকের মতে মানুষের পূর্ব পুরুষ বানর জাতীয় জীব। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বছরের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বানর জাতীয় সেই তথাকথিত জীব আজ মানুষ রূপে আখ্যায়িত হয়েছে।

এখন আমাদের সমস্যা-এর কোনটা বিশ্বাস করতে হবে।

শুধু ইসলাম নয়, যে কোন ধর্মের থিওরীতে মানুষ মানুষ হিসেবেই জগতে আবির্ভূত, বানর হিসেবে নয়। যদি আমি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করি, তবে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, হযরত আদম (আঃ) আদি মানব এবং পৃথিবীর সকল মানুষই তার বংশধর। পক্ষান্তরে যদি বিজ্ঞানের থিওরী মেনে নেই তাহলে আমাকে নাস্তিক বা ঐ ধরনের কোন একটা রূপ লাভ করতে পারে।

এবার আসা যাক বানর ও মানুষের মাঝে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসূত সম্পর্কের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান বলে, মানুষ বানর জাতীয় প্রাণীর উত্তর পুরুষ। অর্থাৎ বানর জাতীয় কোন প্রাণী লক্ষ লক্ষ বছর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ হিসেবে রূপান্তর লাভ করেছে।

যদি তাই হয়ে থাকে, তবে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে আরো বহু প্রাণী, জীবজন্তু ছিল। তাদের বিবর্তনের পরিণতি কি? বিজ্ঞান সেখানে নীরব।

লক্ষ লক্ষ বছরের এই বিবর্তনের ফলে বহু জীবজন্তু পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হয়ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন প্রাণীই আজ আর অবশিষ্ট নেই একমাত্র বানরের অত্যাধুনিক সংস্করণ ছাড়া। তাহলে দেখা যাচ্ছে বানরই একমাত্র সৌভাগ্যবান প্রাণী।

বৈজ্ঞানিকের এই আবিষ্কারের মূল্য এবং মূল সংজ্ঞা হচ্ছে বাননের আকৃতির সাথে মানুষের আকৃতির সাদৃশ্য এই সংজ্ঞার ওপর নির্ভর করে, বিবর্তনের ছবি এঁকে এঁকে বানরকে মানুষের আকৃতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

বানরের মগজে বুদ্ধি আছে এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু জগতে এমন অনেক প্রাণী আছে, যারা বুদ্ধির খেলায় বানরকে হার মানায়। কিন্তু সে সব প্রাণীর সৌভাগ্য হয়নি মানুষে রূপান্তরিত হবার। এর কারণ কি আকৃতি গত? যদি তাই হয় তবে বনমানুষও তো মানুষ হতে পারত।

একথার উত্তরে বলা যায়-- বানর জাতীয় প্রাণীই মানুষের পূর্ব পুরুষ। সুতরাং তা বানর, হনুমান, শিম্পাঞ্জি, গরিলা প্রভৃতি যে কোন প্রাণী হতে পারে বা এর সবগুলিই হতে পারে।

যদি তাই হয়, তবে তো বানর জাতীয় প্রাণীরই অস্তিত্ব আজ পৃথিবীতে না থাকাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ বিবর্তনের ছোঁয়ায় বানর জাতীয় সকল প্রাণীই তো মানুষে রূপান্তর লাভ করেছে। তাহলে আবার আমরা উক্ত প্রাণীগুলো দেখি কেন? কোথা থেকে এগুলি আসল? আর এদেরই বা রূপান্তর হয় না কেন? অথবা রূপান্তরশীল বানরের উত্তর পুরুষ মানুষেরই বা পুনরায় আকৃতির অন্য কোন রূপান্তর ঘটছে না কেন। এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর বিজ্ঞান দেয়নি। সুতরাং এই প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে আমরা বিজ্ঞানের এই থিওরীটাকে আপাততঃ অযৌক্তিক বলে গ্রহণ করতে পারলেও আর গবেষণাকে একদম উড়িয়ে দিতে পারিনে। যেটুকু অস্বীকার করতে চাই তা হল বানরের মানুষের রূপান্তর লাভ। এখানে আমরা হযরত (আঃ)-কে আদি ও অকৃত্রিম মানব বলেই স্বীকার করব। তারই ঔরসে ও বিবি হাওয়ায় গর্ভে যে সব সন্তান জন্মে, বর্তমান পৃথিবীর সকল মানুষ তাদেরই বংশধর।

আদি যুগের মানুষের সমাজ জীবন, আকৃতি-প্রকৃতি, জীবন-প্রণালী কিরূপ ছিল, তা সঠিক ভাবে জানার কোন উপায় নেই। তবে বর্তমান যুগের মানুষের তাদের সার্বিক স্তরের বৈসাদৃশ্য ছিল যে বিরাট-বিপুল তা সর্ববাদী সম্মত। তাদের দেহ নগ্ন, চুল-দাড়ি লোমাবৃত, গুহা, বৃক্ষ কোটর বা শাখা তাদের আশ্রয় স্থল, ফলমূল, কাঁচা মাংস তাদের জীবন ধারণের জন্যে একমাত্র খাদ্য। ভাষায় অস্পষ্টতা বা অবোধ্যত। এমতাবস্থায় লক্ষ লক্ষ বছর পরে সেই আদি যুগের মানুষকে বানর বলে কল্পনা করে নেওয়া স্বাভাবিক। কারণ সভ্যতার আলোকজ্জ্বল এই বর্তমান যুগেও পাশ্চাত্যের বর্ণবৈষম্যবাদীরা একশ্রেণীর মানুষকে ঘ্যাকলিস্টভুক্ত করে রেখেছে। মানুষের কোন অধিকার তারা পায়না। তারা মানুষ নয়—নিগ্রো। কিছুদিন আগে পাক-ভারতের মানুষও ছিল তাদের কাছে অস্পৃশ্য। এমনকি ব্যারিস্টার মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীকেও সাধারণ বৃটিশ সৈনিকের পদাঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। তৎকালীন ভারতের এই অবিসংবাদী নেতাকে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী 'কুলি' বলে আখ্যায়িত করেছিল।

ভারতীয় মহাবিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যক্ষ ভারতীয় ছাত্রকে 'বানর' বলে গালি দেওয়ার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নেতাজী সুভাষ বসুকেও মহাবিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কালো আদমীদের মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার দাবীর চরম মূল্য দিতে হয়েছে এই কয়েক বছর পূর্বে মার্টিন লুথার কিংকে। সুতরাং শ্বেত মনোবৃত্তির এই থিওরীতে আদি যুগের সভ্যতার যাবতীয় উপকরণহীন সেই মানুষগুলোকে বানর বা বানর জাতীয় প্রাণী বলার মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টি তারা বানর বা বানর জাতীয় প্রাণী হলেও আসলে তারা খোদার প্রেরিত বান্দা হযরত আদম (আঃ) এবং মা হাওয়ার বংশধর ও অকৃত্রিম মানুষ।

কবিতা

মোঃ জহির উদ্দীন, ৯২৮
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)

ভাবময় কিছু ব্যথা কিছু সুখ নীরবতা
আর কিছু অনুভব মরমে মরমে
জীবনের রসপন্না অনুপম কথামালা
কহিছে মনের কথা নিয়ত স্মরণে
গোপন রহিয়াছে কিছু কল্পনার রঙের পিছু
স্বর্গ হতে আসিয়াছে যেন অভিমানী,
জগৎ জীবনময়, হৃদয়ের কথা কয়,
কবিতা মানব মনে স্বপ্নের রানী।
কভু দুঃখ কভু স্ফূর্তি অপরূপ বাণীমূর্তি
হৃদয়ের শতকথা নিমেষে প্রকাশ
আদিম ভাবনা রাশি যুগ চেতনায় মিলি--
কবিতা তাহারই যেন নবীন বিকাশ।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

মেহেদী হাসান, ২৫২৮
চতুর্থ শ্রেণী 'খ'

এক যে ছিল কৃষক ভায়া,
জাল পেতে দেয় ক্ষেতে।
আখ ক্ষেতেতে আখ থাকে না,
শিয়াল মামার দাঁতে।
ধুত্তরী ছাই প্রাণের কথা
মনেই তাহার নাই,
অমনী গিয়ে পড়ল সে যে
সেই জালেতে ভাই।
কৃষক ভায়া ক্ষেত পাহারায়
এল যখন সাঁঝে,
দেখে শিয়াল ডিগবাজী খায়
জালের রশির মাঝে।
পড়লো মারা শিয়াল মামা
কিষাণ ভায়ার হাতে
শিয়াল বলে জান হারালাম
এসে আখের ক্ষেতে।

জোকার

শাহেদ কামাল, ২৯৭১
প্রথম শ্রেণী

তার ছিল লম্বা দাড়ি
লম্বা চুলের বাহার
টুপিটাও তার অনেক লম্বা
ঠিক যেন এক পাহাড়।

ইদানিং জীবন

আকবর রেজাউল হায়দার, ৩১০০
একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

মানুষের সভ্যতা এগিয়ে গেছে
নগ্নতা বেড়ে গেছে,
সুর ফুরিয়ে গেছে।
তাই কলিকালে ভালবাসা,
বালুচরে আটকে গেছে।
পুণ্যতার মাঝে আজি শুন্যতা বিরাজ করছে।
সব কিছু সুর হারা কিন্তু তার--
গর্ব অশেষ,
চলছে যেন ভান করা কৃত্রিমতা,
'আমি'টার স্থান নেই, সেথা--
নকল নিয়ে টানা হেঁচড়া।
কি বলব জীবন যেন ইদানিং গদ্য কবিতা
আজ-কালকার কবিতা যেমন মাথায় তালগোল পাকায়--
তেমনি জীবনটাও সুর হারায়,
শুধু মেকির পিছনে ছুটাছুটি সার।

●

'ইহজগতে তুমি এইরূপ জীবন-যাপন কর যেন তুমি একজন পর্যটক বা পথচারী'।

—আল-হাদীস

নজরুলের প্রেমিক সত্তা

মোঃ মনিরুল ইসলাম, ২৯৯৩
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)

বিশ্বপ্রকৃতিতে দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি একই সত্তায় অবস্থান করতে পারে না। মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির অংশবিশেষ হলেও এই বৈচিত্র্যময় মানব-হৃদয়টাকে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম কিংবা আইনের ছকে বেঁধে রাখা যায় না। হয়ত এজন্যেই বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী শিল্পী কাজী নজরুল ইসলামের মাঝে পাশাপাশি দুটো বিরুদ্ধ সত্তার অবস্থান ছিল। একটি তাঁর বিদ্রোহী ও বিনাশী সত্তা, অপরটি প্রেম ও সৃজনের সত্তা। যে 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্যে নজরুল সর্বপ্রথম 'বিদ্রোহী কবি' নামে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে পরিচিতি লাভ করেছেন, তাতেই তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেছেন ঃ

মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য।
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম; আমি ধন্যি!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি; ছল করে দেখা অনুক্ষণ,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন-কন্।

অতএব, বিদ্রোহী কবি বলার সাথে সাথেই নজরুলকে আমরা রোমান্টিক প্রেমিক কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। তাঁর অন্তর্লোকেও দেখেছি দুটো আলাদা কোঠা—এ-কক্ষ ওকক্ষ দুটো সদর অন্দরের মতো একেবারে ভিন্ন জগৎ। একটিতে অগ্নি, অপরটিতে অশ্রু। বলা যেতে পারে, বিদ্রোহমূলক পৌরুষ ও প্রেমের কবিতার আলুলায়িত আবেগ নজরুল সত্তার যেন দুই বিপরীত মেরু।

॥ ২ ॥

নজরুলের এই দ্বৈত সত্তার উৎস ও উদ্দেশ্য নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। একে অনেকে স্ববিরোধিতা বলেন এবং কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন, এ তাঁর একনিষ্ঠ বোধ, প্রত্যয় ও প্রজ্ঞার অভাবপ্রসূত কিংবা চঞ্চলচিত্তের অস্থির প্রকাশ সজ্ঞাত অথবা একটা 'মিটিংকা বাত' অপরটা অন্তরঙ্গ আলাপ--হেথায় হৃদয়ের ফেনিল উচ্ছ্বাস, সেথায় হৃদয়ের বিকাশ। সে যাই হোক, আমরা বলি ঃ

(ক) রেনেসাঁস বা নবজাগৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে নজরুলের ইচ্ছা চেয়েছিল তাঁকে বিপ্লবী বানাতে, বিদ্রোহী করতে কিন্তু হৃদয় চেয়েছিল তাঁকে প্রেমিক হতে, চিরন্তন সুন্দরের উপাসক হতে। কিন্তু চিরন্তনে কিংবা পুরাতনে ফিরে যাওয়া তো রেনেসাঁস নয়,

জীবনপ্রীতি তথা মুক্তবুদ্ধি, বিশুদ্ধ অনুভূতি ও সৃজনশীল কল্পনাপ্রীতিই রেনেসাঁস। তিনি বুঝেছিলেন, জীবনচর্চাই জীবনের উদ্দেশ্য; আর নূতনতর প্রেম, সৌন্দর্য, কল্পনা ও বিচারবুদ্ধির অনুশীলনই জীবনের অনুশীলন। বৃহত্তর জীবনে মনুষ্যত্বের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা, বুদ্ধি ও হৃদয়ের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই নজরুলকে রেনেসাঁসের দীক্ষা দিয়েছিল। কুসংস্কার, ভণ্ডামী, গোঁড়ামী ও শঠতার স্থলে সত্য, ন্যায়, উদার চিন্তার জয় ঘোষণা করতে গিয়েই তিনি হতে চেয়েছিলেন ভলটেয়ার, রুশো, টলস্টয়, গোর্কী, বায়রন, শেলী কিংবা সুইনবার্ন কিন্তু সেজন্যে চণ্ডীদাস, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কালিদাস না হলে চলবে কেন?

(খ) সমাজে বিক্ষোভ, আলোড়ন, জাগরণ এনে নূতন মূল্যবোধ জনমানসে সঞ্চারিত করতে উন্মুখ ছিলেন তিনি, কারণ সমাজ তখন নূতন নির্মাণের জন্য পাগল; কিন্তু প্রেম ছাড়া তা গড়ে উঠবে কি করে? তাই নজরুল বিদ্রোহ ও বিপ্লব কামনা করেছেন, সেই সাথে প্রার্থনা করেছেন প্রেম ও সৌন্দর্য।

(গ) যে পঁচিশটি বৎসর (১৯১৭-৪২) তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সেই কালটি কী অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, দুরন্ত! নজরুল তাঁর সাহিত্যে আনলেন সেই প্লাবন, আনলেন প্রাণপ্রবাহ, নূতন সুর। তাঁর কাব্য সাধনার আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি এমন একটা সময়ে হয়েছে, যখন বাংলার রাজনৈতিক জীবন ছিল অস্বাভাবিক মাত্রায় উদ্দাম, রূপান্তরের ঘূর্ণাবর্তে বিক্ষুব্ধ। তার অপ্রাসঙ্গিক ফিরিস্তি দিয়ে এ রচনাকে অকারণ ভারাক্রান্ত করব না। আবার অনেকে বলেন, নারী প্রেমের প্রেরণাই তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে নবজাগরণমূলক কবিতা ও গান রচনায়। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের ব্যর্থতা কবির অন্তরে জাগায় অভিমান এবং সেই অভিমান জাগায় বিদ্রোহ। সুতরাং প্রেম ও বিদ্রোহ নজরুলের অবিচ্ছেদ্য দুই সত্তা হবেই তো।

॥ ৩ ॥

কাব্যক্ষেত্রে দোলনচাঁপাতেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়াপত্তন হয়েছিল, সিন্ধু-হিন্দোলে এসে তার নিঃসঙ্গ অভিব্যক্তি ঘটেছে। না পাওয়ার বেদনা, পেয়ে হারানোর জ্বালা, অবহেলা প্রাপ্তির ক্ষোভ, ভুলতে না পারার যন্ত্রণা, ব্যর্থ সাধাসাধির হতাশা, বঞ্চনার অবমাননা, প্রিয়ার স্মৃতি-সঞ্চয়ে ঠাঁই না পাওয়ার ব্যথা, মিলনের উৎকন্ঠা, বিচ্ছেদ-শঙ্কা, স্মৃতি-বিস্মৃতির আনন্দ-বিষাদ, বিরহ বিধুরতা, অতৃপ্তির অস্থিরতা, প্রতিদান না পাওয়ার দাহ কিংবা পূর্ব-রাগের মান-অভিমান প্রভৃতিই তাঁর প্রেম বিষয়ক কবিতায় ও গানে অভিব্যক্ত। 'পূজারিনী'কে কবি বলেছেন--

এ-তুমি আজ সে-তুমি তো নহ;
আজ হেরি--তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী!
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকী,--

এই ঈর্ষা ও ঈর্ষাজাত অভিযোগ, অনুযোগ ও অভিমান দোলনচাঁপার অনত্রও রয়েছে--

যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে
...সখি নতুন ঘরে গিয়ে আমায় পড়বে কি আর মনে?

আবার অন্যদিকে প্রতীক্ষার অঞ্জলিও হাতে নিয়ে বসে--

আবার কখন আসবে ফিরে সেই আশাতে জাগব রাত
...আমি শ্রান্ত হয়ে আসব যখন পড়ব দোরে টলে,
আমার লুটিয়ে পড়া দেহ তখন ধরবে কি ঐ কোলে?

এবং অনন্ত কবির স্বীকারোক্তি--

তুমি আমায় ভালবাস তাই তো আমি কবি
আমার এ রূপ, সে যে তোমার ভালবাসার ছবি।

'চক্রবাকে'র কবিতাগুলোতে কবির বিরহ-বেদনাই মুখ্য। নজরুল একদা তাঁর পরিত্যক্ত প্রথমা পত্নীকে লিখেছিলেন--'আমার চক্রবাক নামক কবিতা পুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছো? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে।' ব্যক্তি-জীবনের নিরিখে বিচার করলে হয়ত কবির বিরহ-বেদনা সুচারুভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর। চক্রবাকে কবির সুর—

এ-পারে ও-পারে মোরা, নাই নাই কূল!
তুমি দাও আঁখিজল, আমি দেই ফুল।

তাঁর রোমান্টিক আত্মময়তায় মুখর 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও প্রেমউন্মুখ, সোহাগ সচকিত, স্পর্শভীরু কবির উপস্থিতি দুর্নিরীক্ষ্য নয়—

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি
...চিত-চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
.. আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলী নিচোর!

বিদ্রোহী ভূমিকার অন্তর্পটে প্রেমের আতি আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে কবিতান্তরে--

...একি মায়া! তার মাঝে মাঝে
মনে হত কতদূর হতে, প্রিয়া মোর নাম ধরে যেন...

'ঝড়' কবিতায়ও সে অভিজ্ঞতা বিধৃত –

আমি বলি, ছুটে চল প্রলয়ের লাল ঝাণ্ডা হাতে
...সহসা কম্পিত-কণ্ঠ-ক্রন্দন শুনি কার
সজল কাজল-পক্ষ কে সিক্ত বসনা একা ভিজে
.. কে তুমি পূরবী বালা? আর যেন নাহি পাই জোর।

'মুক্ত পিঞ্জর' কবিতায় বিদ্রোহের অন্তরালবর্তিনী 'পূরবী বালা' কবির নয়নে—

এল কবে মরু মায়াবিনী
সিংহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম-হর্ম্য-মূলে!
...কোন চপলার কেশজাল
কখন জড়াতে ছিল গতিমত্ত আমার চরণে!

অবশ্য 'পূজারিনী' কবিতায় কবি আশা করেছিলেন বাহুতে শক্তি সঞ্চার করে তাঁর প্রিয়া বিদ্রোহীর জয়-লক্ষ্মী হবেন ঃ

ভেবেছিনু, বিশ্ব যারে পারে নাই তুমি নেবে তার ভার হেসে,
বিশ্ব বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন

কিন্তু কবির সে আশা ভঙ্গ হয়

‥ কিন্তু হায়! কোথা সেই তুমি
…কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কাঁদি?
…এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা
কেমনে হানিতে পার, নারী।

অনেকে তাই বলতে চান যে, কৈশোরের ভাসমান জীবনযাত্রা কবিকে স্পর্শকাতর করে তুলেছিল। 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' নজরুলও তাঁর প্রিয়াকে রচনা করতে চেয়েছিলেন--

'তোমায় আমি করব সৃজন, এ মোর অহঙ্কার'

অথবা অনত্র--

শিল্পী আমি, আমি কবি
তুমি আমার আঁকা ছবি
আমার লেখা কাব্য তুমি, আমার রচা গান।

অথবা,

তুমিই আমার মাঝে আসি
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি।

কিন্তু পরিণামে অপ্রাপনীয় প্রেমের আর্তি ও রোমান্টিসিজমে নির্জিত বিষাদ নজরুলের প্রেমকে ক্লান্ত ক্লিষ্ট করেছে। তাঁর গৃহমুখী অভিমানী প্রেমই প্রহত ও প্রতারিত হয়ে উপলক্ষহীন বিদ্রোহের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ফেনায়িত হয়ে উঠেছে ঃ

আমার সে চারিপাশে ঘরে ঘরে কত পূজা কত আয়োজন
তাই দেখে কাঁদে আর ফিরে ফিরে চায় মোর ভালবাসা ক্ষুধাতুর মন।
…ওরে মোর যুগ যুগ অনাদৃতা হিয়া, আয় ফিরে যাই
…উপেক্ষিত আমার এ ভালবাসা মালা নয় খর তরবার।

॥ ৪ ॥

নজরুলের গদ্য-সাহিত্যেও তাঁর দুই মূর্তিমান সত্তা সমভাবে বিরাজিত। তাঁর 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাসেই কবি সর্বপ্রথম একজন অসাধারণ ভাববিলাসী ও অভিমানী পুরুষ--ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় গভীরভাবে মুহ্যমান--অবশ্য বাইরে নয়, অন্তরে। কিন্তু এই নিষ্করুণ আঘাতে তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে একটি নিরবচ্ছিন্ন মধুস্রোত। তাই পরবর্তীকালের প্রতিটি রচনায়ই প্রেমের একটি আবেশময় গন্ধ আমাদের চমক লাগায়। কবির ভাষায়--'এই ভাল লাগাটাই হচ্ছে পূর্বরাগ।' বস্তুতঃ এখন থেকেই প্রেমিক কবির যাত্রারম্ভ।

'ব্যথার দান' গ্রন্থে সবক'টি গল্পেরই প্রাণ হলো প্রেম। কিন্তু তাদের স্বরূপ এক নয়, প্রেমের বিভিন্ন আদর্শায়নের প্রয়াস সেখানে লক্ষ্যণীয়। তবে পরিশেষে প্রেমের পরাজয় দেখালেও মূল বক্তব্য নজরুল কোন না কোন পন্থায় অবলীলাক্রমে প্রেমের জয়ই ঘোষণা করেছেন। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভ্রান্ত প্রেমের অদ্ভুত কাহিনী। তাঁর নায়কেরা নায়িকাকে খুঁজে পায় প্রকৃতির

রূপের মাঝে, যেভাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ পেয়েছিলেন লুসিকে। নজরুলের 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থেও ব্যর্থ প্রেমের হাহাকার আছে কিন্তু দীর্ঘশ্বাস নেই, এখানেই পাঠকের স্বস্তি। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে প্রেমের তাত্ত্বিক দিক পর্যালোচিত হয়েছে। তবে 'আলেয়া' নাটকের ভূমিকাতেই নজরুল প্রেমকে মায়া-মরিচীকা আর সোনার হরিণী রূপে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, এই পুরুষই 'ব্যথার দানে' বলেছেন ঃ 'লোহার শিকল ছিন্ন করবার মত ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু ফুলের শিকল দলে যাবার মত নির্মম শক্তি তো নেই আমার।'

॥ ৫ ॥

বলা যেতে পারে, গান ও গজলেই নজরুলের বৈচিত্র্যময় প্রেমের স্বরূপ আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বিদ্রোহী-যুগের প্রচণ্ড উদ্দীপনা পরিণতি লাভ করার পূর্বেই বিস্মিত দেশবাসী তাঁর কণ্ঠে শুনতে পেল--'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল্।' শোনা যায় নজরুলের গানের কথা ঃ শুধু রবীন্দ্রনাথই বা বলি কেন পৃথিবীতেই নাকি কোন একজন কবি এতো বেশী গান রচনা করতে পারেননি। মনে হয়, Pangs of separation and disappointed' তাঁর প্রেমের কবিতা ও গানের প্রধান সুর। তবে তাঁর ভক্তিমূলক গানগুলোর প্রেমরহস্য পৃথিবীর মরমীয়া সাধকেরাই অনুধাবন করতে পারেন ভাল। আমরা বলি, গানের ক্ষেত্রে নজরুল প্রেমকে শুধু কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করেছেন, প্রেমের কোন প্রগাঢ় অনুভূতি সেখানে দানা বেঁধে উঠেনি। মনে হয়, সাময়িক প্রয়োজনীয়তাটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি অধিক।

॥ ৬ ॥

নজরুলের প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমেই মনে আসে-করুণরস, বিরহগাথা, এসব বাংলায় জমে ওঠে যেন অতি সহজে। শেষ পর্যন্ত তাই বাঙালীর অবলম্বন হয়েছে তার নগণ্য গৃহ, বহতা নদী, সবুজ প্রান্তর, নীল আকাশ, কাগজকালো মেঘ আর তার প্রেমময়ী নারী। সেজন্যেই বাংলার যে আবহমান প্রাণধারা, তার সঙ্গে নজরুলের যোগ অনিবার্যভাবে নিবিড়। কিন্তু আশ্চর্য এখানেই যে, তাঁর প্রেম রাধিকার সেই 'তনু-মন-ধন-জীবন-যৌবন তব পায়ে সমর্পণের প্রেম নয়, তাঁর বিরহ বুক ভাঙ্গা বিরহ নয়। যে বিরহের কল্পছবি তাঁকে প্রতি-নিয়ত মুগ্ধ করে রেখেছে, সেটি সংসার অভিজ্ঞ অবুঝ কিশোর-কিশোরীর নিঃসম্বন্ধ প্রেম--যে বিরহ তাদের জীবন ব্যর্থতায় তিক্ত হয়ে উঠেনি, সে বিরহবোধ যেন জীবনের এক অভিনব অভিজ্ঞতা, স্পর্শমনির ছোঁয়াচ। তাই মনে হয়, চির-বিদ্রোহী নজরুল-মন চিরবিরহী হলেও প্রেমের ব্যাপারে তিনি বিরহানুভূতিতেই বেশী স্বস্তি পান। আত্মক্ষরণেই তাঁর সুখ, পাওয়াকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কারণ নজরুল মনে করতেন, না-পাওয়ার মধ্যেই মহাপাওয়ার স্বাদ রয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় দীর্ঘ ষোল বৎসর পর নার্গিসকে লেখা নজরুলেরই চিঠিতে 'লায়লি মজনুকে পায়নি, শিরি ফরহাদকে পায়নি, তবু তাদের মত করে কেউ কারো প্রিয়তমকে পায়নি'; তাই পাওয়ার ব্যথাটাই হচ্ছে নজরুলের কাছে সবচেয়ে বেশী মর্মন্তুদ। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত প্রেম তো বটেই, অযাচিত প্রেমও তিনি পেয়েছেন। তথাপি সর্বত্রই চিরবিরহের পথেই তাঁর প্রেমানুভূতি অবধারিতভাবে পরিচালিত হয়েছে। এর জন্য তিনি কোন না কোন যুক্তি, অজুহাত

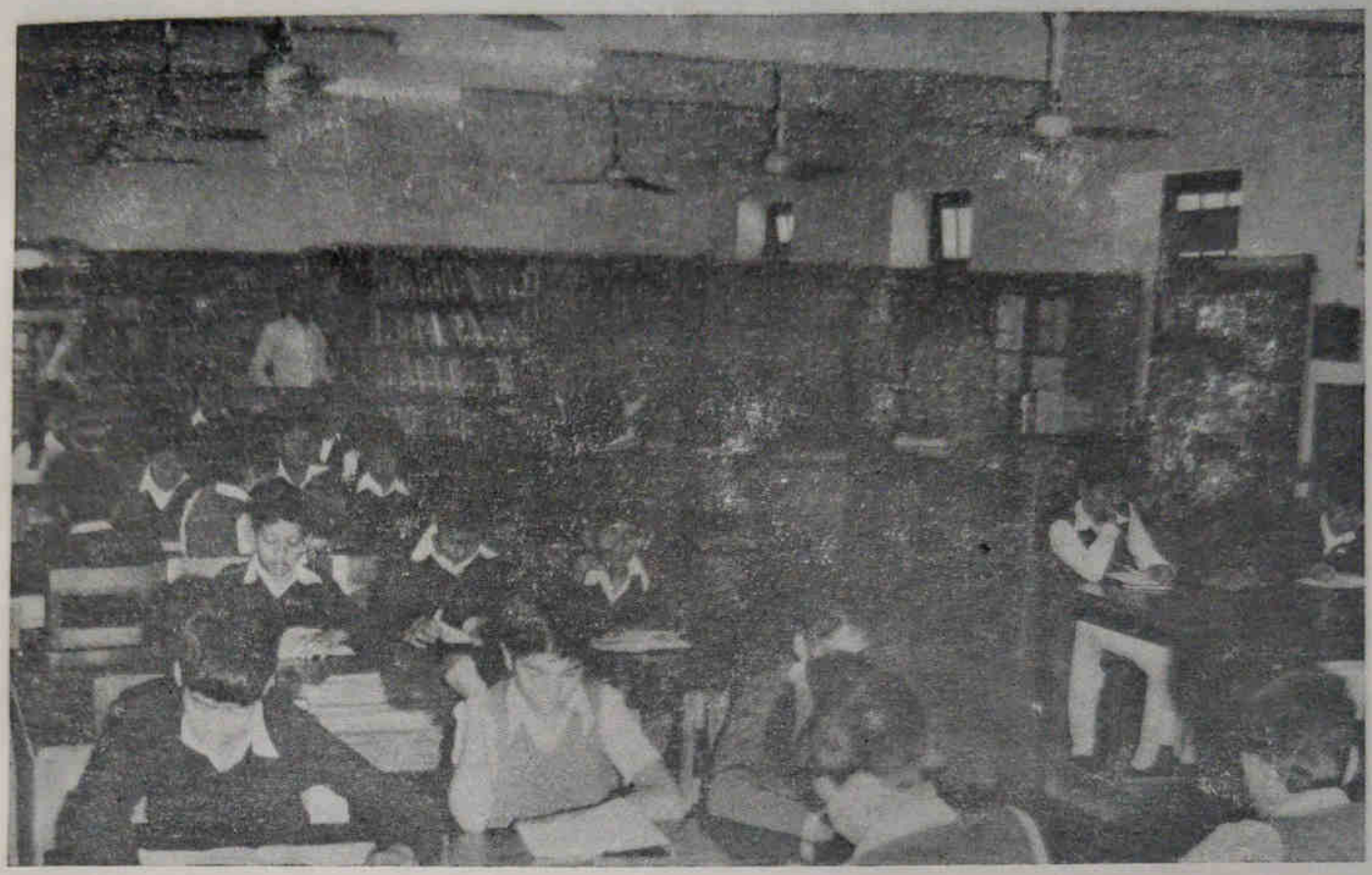

গ্রন্থাগার

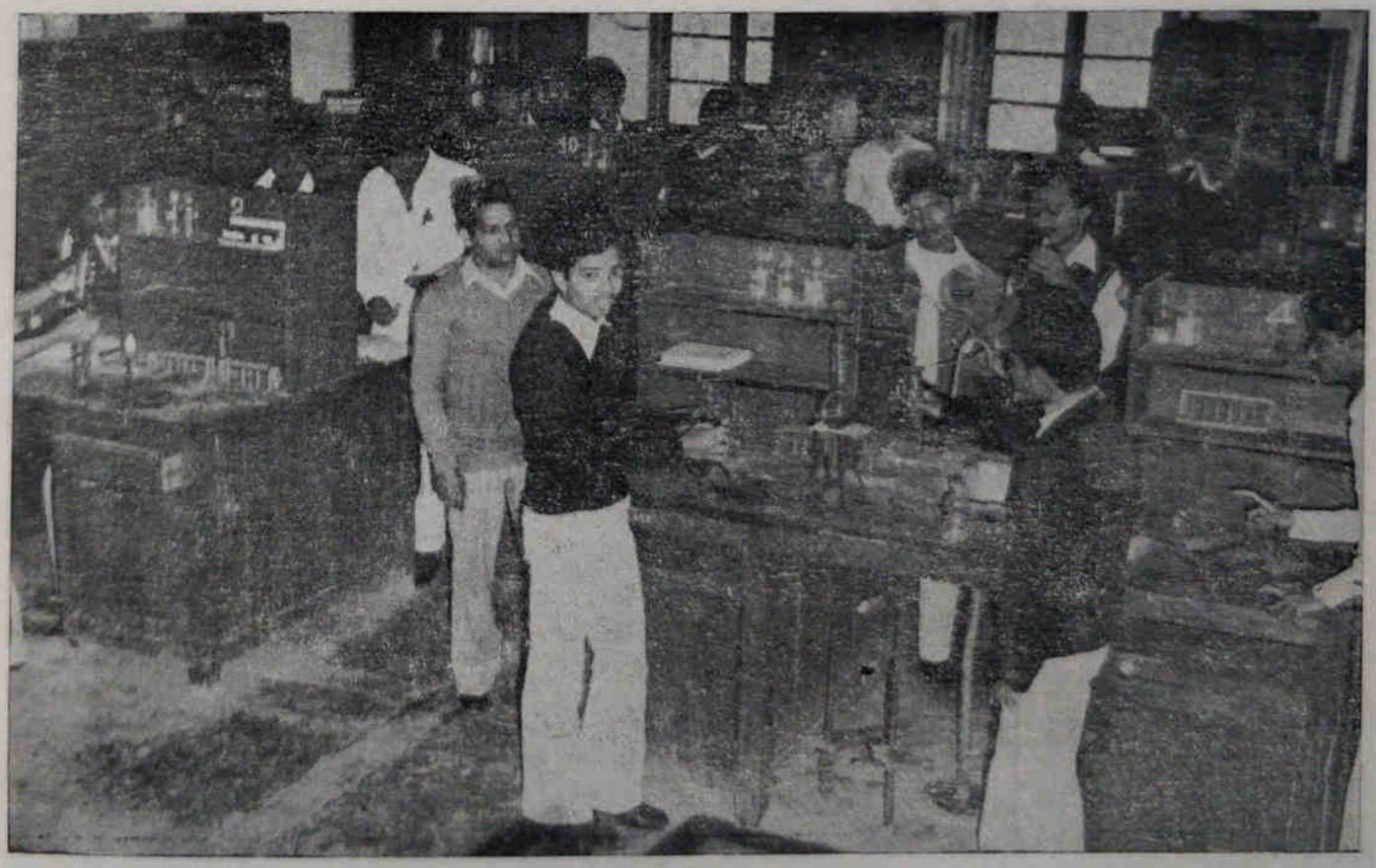

রসায়নবিজ্ঞান গবেষণাগার

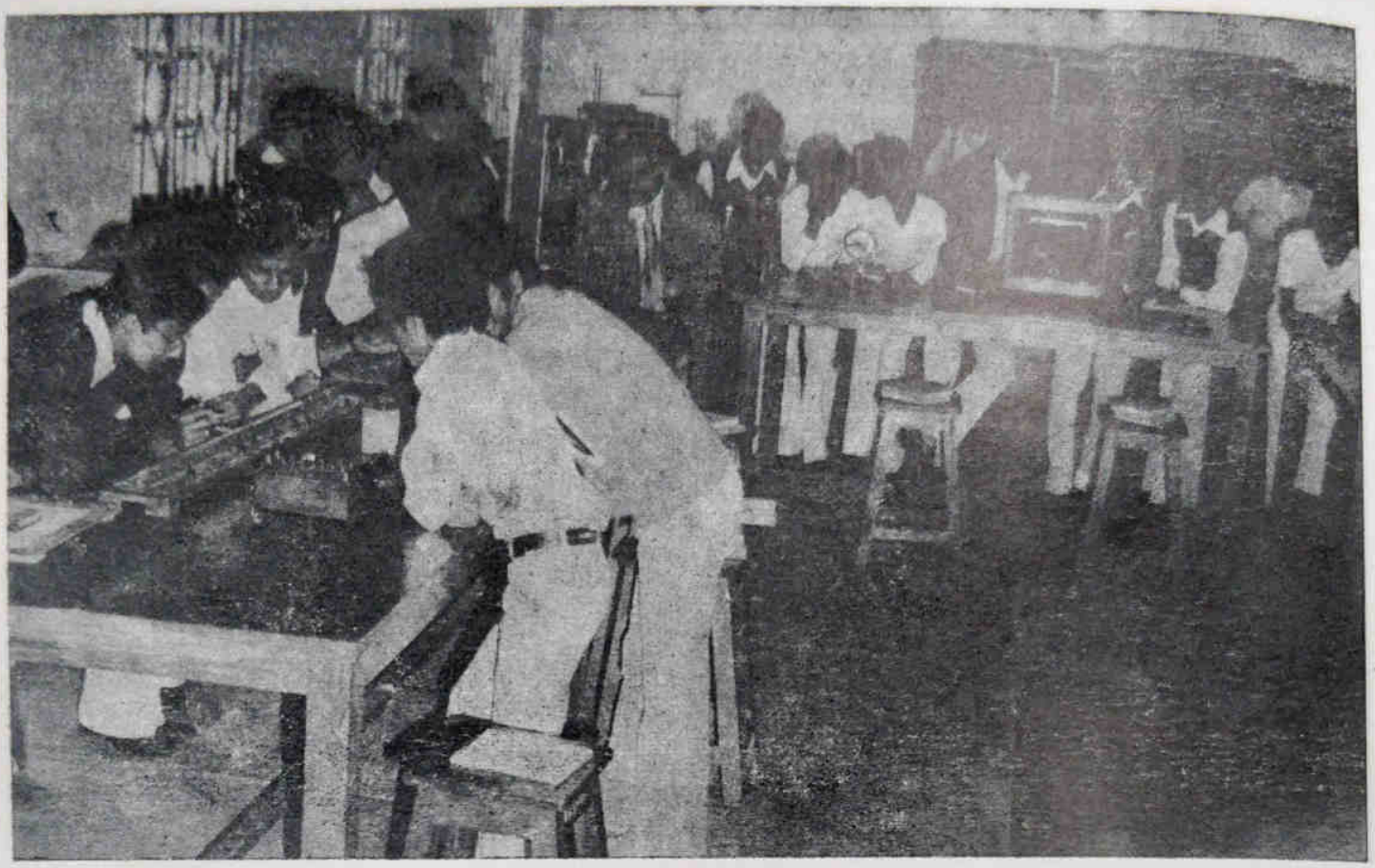

পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার

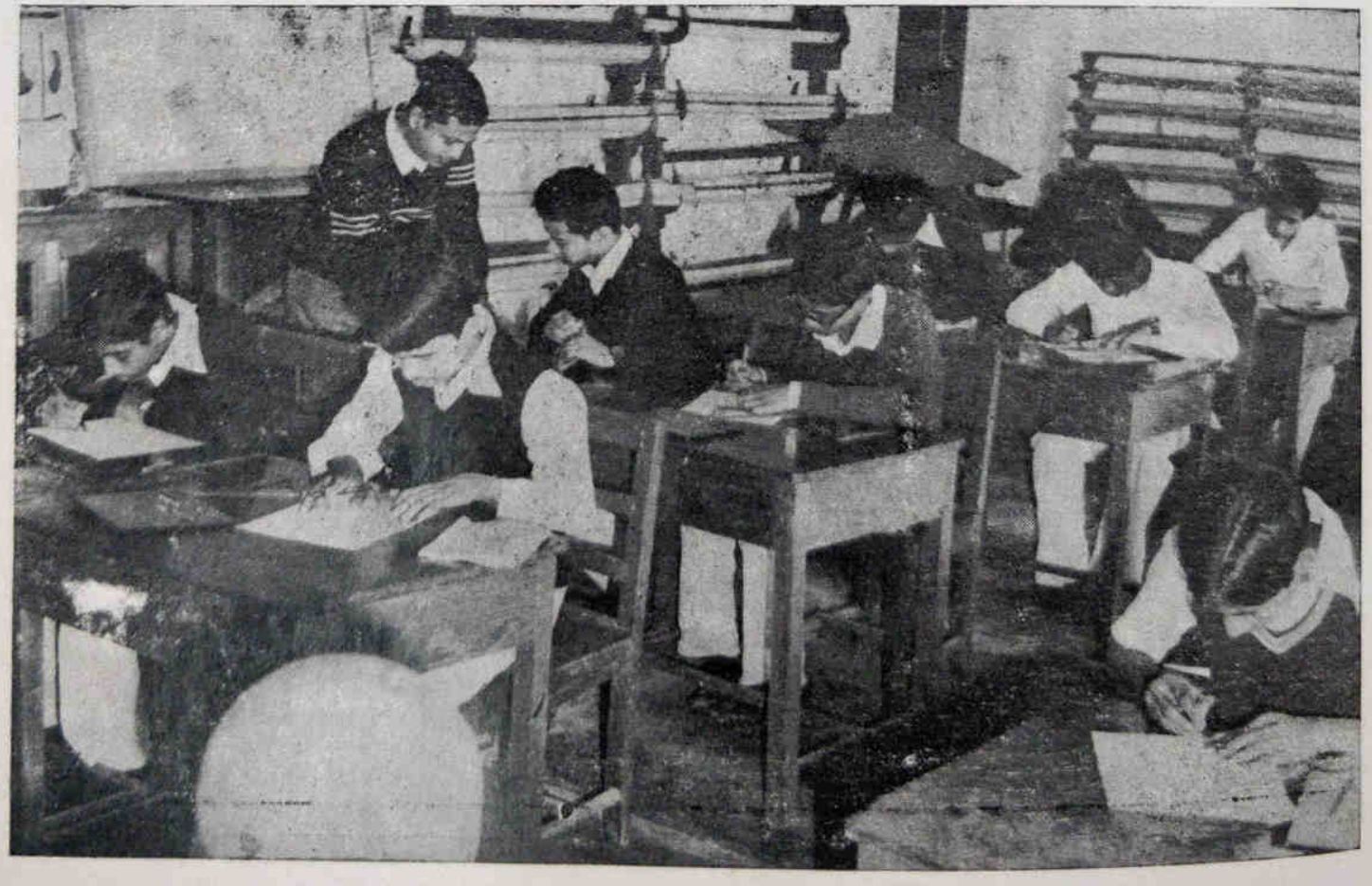

ভূগোল গবেষণাগার

কিংবা আদর্শায়ন খুঁজে নিয়েছেন। তাঁর চিরবিদ্রোহীর মতো চিরবিরহী মনোভাবের উৎসও সেই অসন্তোষ, অতৃপ্তি, বাঁধা না-পড়ার আর্তিতে আকুল উত্তেজনা ও অস্থিরতায় খুঁজে পাওয়া যায়। এইটে আত্মসমর্পণের ভান নয় এবং নয় বলেই তাঁর প্রেমের কবিতায় আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত আছে, আত্মসমর্পণ নেই।

নজরুল আঘাত পেয়েছেন, দিয়েছেন, কেঁদেছেন, ভালোবেসেছেন। কিন্তু কোন অর্থেই তিনি নৈরাশ্য, ক্লেদ ও ক্লান্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। এর ফলে নজরুল রচনার বহু ক্ষেত্রেই স্ববিরোধিতা এসেছে অনিবার্যভাবে। যে প্রিয়াকে তিনি কল্যাণময়ী, তপঃশুদ্ধা পূজারিণী-রূপে বন্দনা করেছেন পূর্ণ বিশ্বাসে, তাকেই ডাকিনী, মিথ্যাময়ী, কলঙ্কিনী, মায়াবিনীরূপে সন্দেহ হয়েছে। পক্ষান্তরে, যে ঈশ্বরের নির্মমতায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, যার আসন ভেদ করে আত্মপ্রকাশের দম্ভ করেছেন, সেই ঈশ্বরের প্রেম ও করুণায় তিনি মুগ্ধও হয়েছেন—'এত ভালো তুমি, এত ভালবাসা, এত তুমি মহিয়ান···।

অনির্দেশ্যতা (uncertainty) নজরুলের প্রেমের কবিতার যেন আর একটি বিব্রতকর দিক। অনেকস্থলে উপলক্ষ্য নেই, নিছক ভাব ও ছন্দের মনভুলানো মালাগাঁথা যেন। যেমন—

আদল গর গর
বাদল দর দর
এ-তনু ডর ডর
কাঁপিছে থর-থর।
নয়ন ঢল-ঢল
সজল ছল-ছল,
কাজল কালো জল
ঝরে লো ঝর-ঝর।

অথবা, অলক ছায়
কপোল ছায়
পরশ চায়
অলস চুল
বিনুন-বুল
কেশের উল
দোদুল দুল।

কিংবা নিরুদ্দেশ্যতার অন্য প্রমাণ—

'পোড়া প্রাণ জানিল না কারে চাই
চিৎকারিয়া ফেরে তাই—'কোথা যাই
কোথা গেলে ভালবাসাবাসি পাই?'

অথবা বলা চলে, নজরুলের প্রেমের কবিতা যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অনন্তর উচ্ছ্বাস, এতে পারম্পর্য-তার কোন ইতিহাস নেই। কোন একটি বিশেষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই চেতনা বিকাশ লাভ করেনি। যাযাবর-সুলভ আকস্মিকতা ও উদ্বেলতা দ্বারা এ সমস্ত প্রেমের রশি বিচ্ছিন্ন, বিখণ্ডিত বিপর্যস্ত তাঁর পলায়নী মনোবৃত্তির উৎপত্তি হয়ত এখানেই।

প্রসঙ্গান্তরে দেখি, অ-নামিকা কবিতায় কবির দেহ-সচেতনতাতত্ত্বের রূপলাভ করেছে। নজরুল এখানে প্রবহমান বাংলা প্রেমের কবিতার চিরাচরিত রং উপমা ও ভাষা ব্যবহার করেছেন অতি নিষ্ঠা ও অনুশীলনের সঙ্গে—

আজ লালসা-অলস মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধনি স্মরিছে পতি
তার নিধুবন-উন্মন
ঠোঁটে-কাঁপে চুম্বন,

বুকে পীন যৌবন
উঠেছে ফাঁড়ি
মুখে কাম-কণ্টক ব্রন মহুয়া-কুঁড়ি।

নজরুলের প্রেমানুভব সৌন্দর্যানুভূতির এই তীব্র দেহসচেতনতা তাঁর পৌরুষের পরিচয়-বাহী এবং কাব্য ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। আরেকটি প্রমাণ—

যা কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন
যা কিছু চুম্বন দিয়ে করেছি সুন্দর—
সে সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি।----আজ মনে হয়,
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
...প্রেম এক প্রেমিকা সে বহু
বহু পাত্রে ঢেলে পিব সেই প্রেম
সে শরাব লোহু।

॥৭॥

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুলের প্রেমিক সত্তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই বলা যায়, তাঁর প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলো ব্যক্তিগত অনুভূতির নিবিড় প্রকাশে উজ্জীবিত। এখানে বলিষ্ট পৌরুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ রয়েছে। তবে তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় নিছক নিসর্গ বন্দনা কি বর্ণনার স্থলে ব্যক্তিগত অনুভূতিই প্রাধান্য পেয়েছে। সুবিখ্যাত 'সিন্ধু' কবিতাগুচ্ছ এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এসব কবিতায় অসংযম ও অতিকথন ধরা পড়ে, যেকথা তাঁর বিদ্রোহমূলক কবিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য--

কোথা তব ব্যথা বাজে! মোরে কও, কারে নাহি কব!
কারে তুমি হারালে কখন,
কোন মায়া-মণিকার হেরিছি স্বপন
কে সে বালা? কোথা তার ঘর?
কবে দেখেছিলে তারে? কেন হল পর?
...এসো বন্ধু, মুখোমুখি বসি।

জীবন শিল্পী জীবন-প্রেমিক নজরুলের প্রেমের কবিতা জীবন্ত প্রাণবন্ত হলেও লক্ষ্য নিরপেক্ষ সামগ্রিকতাহীন ব্যক্তিগত জীবনকাহিনীর আত্মমগ্ন অনুভূতিপ্রবণতার প্রাবল্যই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা দেখেছি, নজরুলের আত্মপ্রসাদপ্রবণ মনোভাবের মোড়ে মোড়ে জড়িত আছে এক অজানিত কান্না, তাই কোন পাওয়াকেই সহজভাবে নিতে পারেন না তিনি। পরিচর্যাহীন মানস জটলার অবশ্যম্ভাবী শিকার হলেও হৃদয়ধনে একান্তই বলিষ্ঠ ছিলেন বলে অনন্ত স্বতঃস্ফূর্ত উৎসরণে তাঁর কোন অসুবিধে ছিল না। প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে তীব্র Situation সৃষ্টি করে তিনি ঐ অস্থির মনে অফুরন্ত সঞ্চালন এনেছেন। তাঁর স্বভাবজাত যৌবন ও তারুণ্যের

উত্তেজনা, বীর্যমত্তা, সহৃদয়তা, প্রচণ্ড প্রেমাবেগ, অতীব্র সহমর্মিতা এক শক্তিমান মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। তিনি হয়ে উঠলেন যৌবনের কবি--আর যৌবন মানেই তো শক্তি ও প্রেমের প্রতীক। নজরুল যে বলেছেন--'প্রেম চিরকালেই পবিত্র, দুর্জয়, অমর···ধীর, শান্ত, চিরন্তন।'

বিরহ বিচ্ছেদের কবিতাবলীতে নৈরাশ্য হতশার শেষ উত্তরণ ঘটেছে প্রার্থনায় কিংবা প্রত্যাশায়। তাই তাঁর ধ্বংসের আহ্বান হয়ে উঠেছে সৃষ্টিরই প্রণোদনা। তবে প্রেমের খামখেয়ালীপনা কখনো আশ্চর্যভঙ্গিতে উঠে গেছে এক উন্নততর স্তরে। সেখানে কবি একসাথে হয়েছেন জ্ঞানী ও প্রেমিক। বস্তুতঃ যে অন্তর্জ্বালা অনির্বাণ আলোর মত জ্বলতে থাকলে কবি-হৃদয় অনন্ত সৃজনী-মুখর থাকে, নজরুলের তা ছিল--ছিল অতৃপ্তি, অসন্তোষ, চাঞ্চল্য এবং বন্ধনের আশঙ্কা ও উত্তেজনা। তাই আবারও বলি, নজরুলের প্রেমে সর্বত্র সূক্ষ্ম ও মহৎ দর্শন নেই--নিতান্ত শরীর ও নির্লক্ষ্য এই প্রেমে একনিষ্ঠতাও আছে কেবল হৃদয়ের আকুতি ও প্রণয় বিহ্বলতা। একটা অসহ্য আবেগ, অদম্য আকর্ষণ, অশেষ বাসনা, একটা অস্থির অতৃপ্তি কবিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। মনে হয়, একটা পৌনঃপুনিক কারণ, একটা কৃত্রিম বিরহ বিলাস যেন কবিকে নিয়ে সর্বত্র ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই এই শরীর প্রেম তাঁকে কোন এক উপলব্ধির জগতে উত্তীর্ণ করেনি, কবির চৈতন্য স্বরূপ হয়ে ফোটেনি।

প্রেমের রূপকল্প নির্মাণে নজরুলের প্রধান উপকরণ-উৎস ছিল হিন্দু পুরানের ভাণ্ডার। সীতা, উমা, শকুন্তলা তাঁর কবিতায় প্রিয়ারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তেমনি আরব-ইরানীয় পুরানেও নজরুল মানস আকৃষ্ট হয়েছে। লায়লী-মজনু, শিরী-ফরহাদ স্বাভাবিকভাবেই কবির হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, কাব্যের অমরত্ব অপেক্ষা সমকালীন সত্য ও সৌন্দর্যের সন্ধানই নজরুলের প্রধান অভীষ্ট। তাঁর সৌন্দর্যাভিসার তাই আন্তরিকতার তীব্র আলোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু মিলন অপেক্ষা বিরহের সুরই প্রধানতর হয়েছে বলে সেই অভিসার তাঁর অন্তরাকাশে জাগিয়েছে ঝড়ের আবর্ত। অবশ্য নজরুল এই শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রেম দিয়ে এক পূর্ণ পরম প্রেমময়ে যাওয়া যায়। কিন্তু ধরার দুলালী মানবীকে পেয়ে প্রেমে পূর্ণ তৃপ্তি ঘটে না। তবু আজীবন তাকে কবি বিচিত্র ছন্দে ও সুরে রচনা করেছেন অজস্র গান ও কবিতার মাধ্যমে। আরো একটা বিষয় সচেতন মহলে আলোচ্য--তা হল, নজরুলের কবিতায় যে সমর্পিত প্রেমের দীনতা ও সান্ত্বনাহীন রোদন কিংবা অশ্রু ভারাক্রান্ত প্রেম-পৌরুষদীপ্ত কবির পক্ষে তা সম্ভব হলো কি করে? তাঁর ব্যক্তিত্বের স্ববিরোধীতা, না চূর্ণ মানসিকতার ফসল? কিন্তু নজরুলের এই দুই সত্তা নানা কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত। কিন্তু এ আলোচনা আমাদের প্রবন্ধের আওতা-বহির্ভূত, এবং পূর্বালোচনায় কিছুটা বিধৃত।

অনেক কবির সাথেই নজরুলের বৈসাদৃশ্য থাকলেও সাদৃশ্য যে নেই, তা নয়। দায়িত্বহীন ভবঘুরে জীবনের অভিলাষী নজরুলের প্রিয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, ওমর খৈয়াম আর ইরানী কবি হাফিজ--তাঁদের সুফীতত্ত্বের জন্যে নয়, বলা চলে প্রেমের উন্মাদনার জন্যে। প্রেম ধারণার ক্ষেত্রে সমসাময়িক মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর নিকট বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। মোহিতলালের মানবিক প্রেম আধ্যাত্মিকতার আবরণ ত্যাগ করে। দেহাত্মবাদের মহিমা কীর্তন করেছে। নজরুলের মানবিক প্রেমও অনেকস্থলে স্বভাবসুন্দর দেহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। তবে জীবন-সম্ভোগের ক্ষেত্রে যে অগ্রসরমানবোধ ও বাস্তব বুদ্ধি তাতে মোহিতলাল

অগ্রগামী। তবে এ ক্ষেত্রে কীটস্‌য়ের Full throated case উপভোগের মানসিকতায় নজরুলের মিল রয়েছে। এজন্যেই তাঁর মধ্যে দেহাতীত প্রেম দুর্বল নয়।

কবিতার জন্ম সেই প্রাণে-যে প্রাণ জীবনের দ্বন্দ্বে আহত, মৃত্যুর লাঞ্ছনায় ব্যতিব্যস্ত। নজরুলের যন্ত্রণা নজরুলকে বিদ্রোহী করেছে, বিরহবিলাসী করেছে। কিন্তু তাই বলে দেশ-প্রেমিক কবি না হয়ে বিশ্বপ্রেমের কবিতা হতে তাঁর বিবেকে বাঁধত। এ জন্যেই রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর সৃষ্টি, দৃষ্টি ও সৃষ্টিধর্মের প্রভেদ ছিল। নজরুল মানসে স্বতোৎসারিত প্রেম ও বিদ্রোহ পরিপূরক ছিল বলেই তিনি স্পষ্ট ও স্পষ্টবাদী। সমকালীন কবিদের সাথে তাঁর পার্থক্য এখানেই। নজরুলের মূলধন যেখানে হৃদয়, তিরিশের কবিদের অধিকাংশেরই মূলধন সেখানে মনন। কিন্তু নজরুলের মন তাঁর মস্তিষ্কের সহযোগিতা পায়নি কখনো। হয়ত তা-ই, রবীন্দ্রনাথ, চিত্রাঙ্গদা, সোনারতরী, চিত্রা, মানসীতে যে প্রেমের আলোচনা আঁকলেন, সমকালীনদের উপর তার প্রভাব থাকলেও নজরুলে নেই। তাঁর কাব্য উচ্ছাসে অধীর কিন্তু কদাচিত ভাব গাম্ভীর্যে প্রশান্ত। কীট্‌স যে বলেছেন'-Poetry should please by a fine excess। নজরুলের কাব্যে প্রায় সবটাই exeess, অত্যাল্প fine। কারণ, তাঁর কল্পনা যতোটা আবেগবিধুর, মনন ততটা স্থিত প্রাজ্ঞ নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী', 'প্রেমের অভিষেক' নজরুলের 'পূজারিণী,, 'অ-নামিকার সমগোত্রী বৈকি!

॥ ৯ ॥

বলা বাহুল্য, বিশ্বজনীন কল্যাণের স্বার্থেই নজরুল তাঁর বাঁশরীতে করেছেন প্রেমের সুরের সাধনা, কণ্ঠে হয়েছে তুর্য-নিনাদ। কোন বিশিষ্ট অনুভূতি নয়, সমগ্র কবি-মানসের আলোকে দেখলেই নজরুল কাব্যে প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনার স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। উপসংহারে আরো বলা যায়, সংগ্রামী পৌরুষের মাঝে লুক্কায়িত প্রেমিক সত্তাও তাঁকে চিরকালীন মনে স্মরণ করিয়ে দেবে কারণ এখানেও তাঁর প্রতিষ্ঠা সমভাবে স্বীকৃত—উজ্জ্বল ও অমলিন। বলা যায়, নজরুল সাহিত্যে একবিন্দুই যদি চিরন্তন অমৃত থাকে, তবে তাতে তাঁর প্রেমিক সত্তার অংশও অপরিহার্যভাবে বিদ্যমান। নজরুলের কথাই বলা চলে—'তুমি ভুলে যেও না আমি আঘাত করলেও ফুল দিয়ে আঘাত করি।'

'ভাল ব্যবহারের বিনিময়ে ভাল ব্যবহার—ইহার নাম ভাল ব্যবহার নহে। মন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাল ব্যবহার—ইহার নামই ভাল ব্যবহার'।

—আল-হাদীস

কাকতালীয়

মুনীর আহমেদ কাদরী, ১৮৩৩
দশম শ্রেণী (বিজ্ঞান)

আর ভাল লাগে না তাপসের। হতাশাপূর্ণ এই জীবন থেকে মুক্তি চায় সে। যে ইট ছোড়া যায় তা কি আর ধরা সম্ভব? যা ও করেছে তা আর ফেরাবার নয়। তাই ওর অবস্থাও উড়ন্ত ইটের ন্যায়। উচ্ছলতায় ভরা কৈশোর পেরিয়ে তাপস আজ যৌবনের দ্বারপ্রান্তে সমুপস্থিত। কিন্তু আজও সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে তাপসের শৈশবের স্মৃতি। কত সুন্দর ছিল সেই জীবন। বার বার মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা।

এইতো সেদিনের কথা—তাপস তখন স্কুল জীবনের ইতি ঘটাতে যাচ্ছে। ওর পদ-চারণায় সারাটা পাড়ায় অস্থিরতা লেগেই থাকতো। কিন্তু কি যে হল, মাথায় বোধ হয় ওর ভূত চেপেছিল। লেখাপড়া ছেড়ে দিল। তার পরিবর্তে পাড়ার ক্লাবটার কীড়ান্নোয়নের প্রতি ওর মাথা ব্যথা বেড়ে গেল। ওর লেখাপড়ার যত্ন নেয়ার জন্যে বাড়ী থেকে কড়া শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'ল। এতে ফল হ'ল বিপরীত। তাপসের একগুঁয়েমি ভাব কাটল না। একদিন তাই ওর উপর দিয়ে বয়ে গেল কালবৈশাখী ঝড়। মধ্যবিত্ত ঘরে এক পাল ছেলেমেয়েদের মাঝে ওর উপস্থিতি অনাবশ্যক হয়ে দাঁড়াল। ওর ভরণপোষণ, অতিরিক্ত খরচ এবং সংসারে ওর অনাবশ্যকতা অনুভব করে তাপস একদিন চরম সিদ্ধান্ত নিল। বেরিয়ে গেল সে বাড়ী থেকে। এতে প্রথমে কেউই তেমন উদ্বিগ্ন হয়নি। সবাই ভেবেছিল ঠিকই একদিন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে। কিন্তু তা আর হল না। শেষে খোঁজাখুজিটা থানা পুলিশ, খবরের কাগজ পেরিয়ে রেডিও পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু তাতে করেও তাপসকে পাওয়া যায়নি।

ইতিমধ্যে তাপস ঠিক করে ফেলেছে, ও আর কোনদিনও ঘরমুখো হবে না, যাই থাকুক ওর কপালে। কিছুদিন শহরের এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে কাটল। তারপর হাতের পাঁচ হাল্কা হতেই ওকেও উদ্বিগ্ন হতে হ'ল। এমনি সময়ে একদিন তাপস উপস্থিত হ'ল এক প্রেক্ষাগৃহের সামনে। প্রচণ্ড ভিড়। তাপস দেখল, সমস্ত লোক একটি টিকিটের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। কয়েকজনকে সে টিকিট বিক্রি করতেও দেখল। ওর সমবয়সীও কয়েকজন আছে। দ্বিগুণ-ত্রিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে টিকিট। অপেক্ষা করল তাপস। এক-সময় ভিড় কমতেই সে এগিয়ে গেল টিকিট বিক্রেতার কাছে। সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। হিসাব করছে ওরা। ধীরে ধীরে পরিচিত হ'ল তাপস। একই গোয়ালের গরু ওরা। পরিশেষে ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে মুক্ত হ'ল তাপস।

বেশ কাটছিল তাপসের দিন। বাড়ীর কথা আর মনে পড়ে না। কিন্তু কতিপয় অপরাধের জন্যে একদিন ওর হাতে হাত-কড়া পড়ল। বেশ কিছুদিন চৌদ্দ শিকের অভ্যন্তরে কাটিয়ে মুক্তি পেল তাপস। বেআইনী কাজগুলোয় ওর মনোযোগ বেশী হ'ল। সেই সাথে পুলিশের পরিচিতও হ'ল।

অনেকদিন পর। এর মধ্যে পাল্টে গেছে শহরের জীবনধারা। বেড়েছে অপরাধ, সেই সাথে পুলিশের কর্মব্যস্ততা। এখন তাপসকে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়, প্রতিটি মুহূর্ত। দিন কাটে সুখে নয়, নিশ্চিন্তেও নয়। সেজন্যে হতাশায় ছেয়ে গেছে ওর মন। বর্তমান জীবনটা আর ভাল লাগে না। বার বার মধুর অতীত ওর মানসপটে ভেসে ওঠে। অতীত রোমন্থন করে আনন্দ পায় তাপস। ফিরে পেতে চায় সেই অতীতকে। কিন্তু আর যে উপায় নেই। এমনিভাবে পদ্মা, মেঘনা আর যমুনায় অনেক জল গড়িয়ে যায়। একদিন ঘটল সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তাপসের সংগে ওর ছোট ভাই তপনের দেখা হয়ে যায় হঠাৎ করে। দুজনই বড় হয়েছে, পরিবর্তন এসেছে ওদের মধ্যে। কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে এতটুকু দেরী করে না। সব ভুলে যায় তাপস। কিন্তু তপনের চোখ তখন ছলছল।

ইতিমধ্যে ওদের সংসারের উপর দিয়ে চলে গেছে দুঃখের "ষ্টীম রোলার"। হঠাৎ ওর বাবা মারা গেছেন। সংসারের হাল তখন তপনের হাতে। মা'র শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ডাক্তার দেখিয়ে বিলাসিতা করার মত অবস্থা ওদের আর নেই। ওর মা এখনও ওর কথা মনে করে কাঁদে। এমনি ধরনের কত কথা শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় তাপস। কথা দেয় তপনকে, সে বাড়ীতে ফিরে যাবে।

দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব তাপসকে গ্রাস করে। যে সংসার থেকে, মায়ের কাছ থেকে নিজেকে ও বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল, সেখানে ও কিভাবে ফিরে যাবে? কিন্তু বড় বিচিত্র মানুষের জীবনের স্রোতধারা। একদিন তাপসের মন মানসিকতা পাল্টায়। ভুলে যায় ও অন্ধকার দিনগুলির কথা। মায়ের স্মৃতি মনে পড়ে। শত দুঃখ কষ্ট সহ্যকারিণী সেই অত্যাচারিণী স্নেহময়ী মা। যার স্নেহছায়ায় স্বর্গীয় শান্তি। সেই মা'র কথা মনে হতেই হৃদয়ে হাতুড়ির আঘাত হড়ে। "মা" বলে ডাকতে বড় ইচ্ছে হয় তাপসের। তাই সে ছুটে মা'র কাছে। ছোট ভাইবোনদের ক্রন্দনরোলে চমকে ওঠে তাপস। দ্রুত এগিয়ে যায় মার শয্যার পানে। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে ডাকে "মা",--'তাপস?' মাত্র একটি শব্দ উচ্চারিত হয় মার মুখ থেকে। তারপর একদিকে হেলে পড়ে মাথাটা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তাপস।

আবার জ্ঞান ফিরে আসে তাপসের। কে আর রইল ওর? সবইতো শেষ ভাবতে থাকে তাপস--মা কি ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল? এমন সময় উঠানের তালগাছ থেকে একটা তাল পড়ে ওর সামনে। উপরে তাকিয়ে দেখে একটা কাক উড়ে গেল। ভাবে কাক উড়ে যাবার জন্যেই হয়ত সেই তালটা পড়েছে। কিন্তু তাল পড়ার জন্যেও তো কাকটা উড়ে যেতে পারে। এমনি কাকতালীয় ঘটনা কতজনের জীবনেইতো ঘটে। শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাপস তাকিয়ে দেখে, তপন ওকে ডাকছে।

EVER-LASTING CALENDAR

কাজী নজরুল হক, ২৯০৫
দ্বাদশ শ্রেণী, (মানবিক)

আপনি কি আপনার জন্ম তারিখের বারটি জানতে চান? কিংবা অন্য কোন তারিখের বার? নীচের পঞ্জিকাটির সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি তা বের করে নিতে পারেন। এ ধরনের পঞ্জিকা আরও রয়েছে। তবে এর বিশেষত্ব এই যে, এটি দিয়ে আপনি একদিকে যেমন শতাব্দী, বছর, মাস ও দিনের প্রবাহের গতি সম্পর্কে সম্যক বৈজ্ঞানিক ধারণা পাবেন, অন্যদিকে হিসেবটা জানা থাকলে যেকোন তারিখের বার কোন পঞ্জিকার সাহায্য ছাড়াই বের করতে পারবেন।

CENTURY

Num.													
1	FRI	2	THU	3	WED	4	TUE	5	MON	6	SUN	0	SAT

YEAR

Num.														
0	0	5	11	22	28	33	39	50	56	61	67	78	84	89	95
1	6	12	17	23	34	40	45	51	62	68	73	79	90	96	
2	1	7	18	24	29	35	46	52	57	63	74	80	85	91	
3	2	8	13	19	30	36	41	47	58	64	69	75	86	92	97
4	3	14	20	25	31	42	48	53	59	70	76	81	87	98	
5	4	9	15	26	32	37	43	54	60	65	71	82	88	93	99
6	10	16	21	27	38	44	49	55	66	72	77	83	94		

MONTH

Num.							
0	JAN.	3	FEB.	3	MAR.	6	APR.
1	MAY.	4	JUN.	6	JUL.	2	AUG.
5	SEP.	0	OCT.	3	NOV.	5	DEC.

DAY

Num.					
0	1	8	15	22	29
1	2	9	16	23	30
2	3	10	17	24	31
3	4	11	18	25	
4	5	12	19	26	
5	6	13	20	27	
6	7	14	21	28	

কিভাবে হিসেব করবেন

শতাব্দীর ঘর ঃ প্রথমে শতাব্দীকে ৭ দিয়ে ভাগ করুন। কারণ, প্রতি ৭ শতাব্দীর পর একই বার ফিরে আসে। শতাব্দীর বারের এই প্রবাহ পর্যায়ক্রমিক, তবে সম্মুখগামী নয়, পশ্চাতমুখী। শতাব্দীকে ৭ দিয়ে ভাগ করার পর ভাগ শেষ যা থাকবে তাকে শতাব্দীর ঘরের সংখ্যার সাথে মিলিয়ে দেখুন কোন বারে পড়ল।

বছরের ঘর ঃ বছরটি কোন সংখ্যায় পড়ল দেখে নিন। এবার শতাব্দীর বারের পরের বার থেকে ততবার এগিয়ে যান। কি বারে পড়ল দেখে নিন।

যদি বছরের ঘরটি মনে রাখতে চান তাহলে জেনে রাখুন যে শতাব্দীর ১ম বছর যে বারে পড়বে, তার ৫, ১১, ২২, ২৮, ৩৩, ৩৯, ৫০, ৫৬, ৬১, ৬৭, ৭৮, ৮৪, ৮৯, এবং ৯৫ বছরও সেই একই বারে পড়বে। এরপর এদের থেকে এক বছর করে এগোতে হলে এক-বার করে এগিয়ে যাবেন এবং এক বছর করে পিছুতে হলে একবার করে পিছিয়ে আসবেন। তবে লিপিয়ার (Leapyear) বছর থেকে পরের বছরে যেতে হলে দু'বার এগোবেন এবং কোন বছর থেকে তার আগের লিপিয়ার বছরে আসতে হলে দু'বার পিছিয়ে আসবেন। কারণ লিপিয়ার বছরে ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন বেশী থাকায় সে বছরের হিসেবে একবার কম বেশী হবে।

মাসের ঘর ঃ এবার মাসটা কোন সংখ্যায় পড়ল দেখুন। তারপর আগের মত বছরের বারের পরের বার থেকে ততবার এগিয়ে যান। মনে মনে হিসেব করার জন্য শতাব্দী ও মাসের নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলো মুখস্ত করে নিতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, লিপিয়ার সনে মার্চ মাস থেকে শুরু করে অন্য মাসগুলোর সংখ্যার মাথে ১ যোগ করে হিসেব করতে হবে।

দিনের ঘর ঃ দিনের তারিখটা কোন সংখ্যায় পড়ে তা দেখে নিয়ে মাসের বার থেকে ততবার এগিয়ে যান। আপনার আকাংখিত বারটি পেয়েছেন কি?

একটি উদাহরণ ঃ মনে করুন, আপনি ১৯৭৬ সালের ৫ই জুলাই তারিখের বার জানতে চান। ১৯৭৬ সাল ২০শ শতাব্দীতে পড়ে। ২০ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ৬ অবশিষ্ট থাকবে। অর্থাৎ ২০শ শতাব্দী শুরু হয়েছে রবিবারে। ৭৬ সাল পড়েছে ৪ সংখ্যায়। সুতরাং ৭৬ সন রবি থেকে ৪ বার পরে বৃহস্পতিবারে শুরু হবে। জুলাই-এর সংখ্যা ৬। তবে জুলাই এখানে লিপিয়ার সনে পড়েছে বলে এর সংখ্যা হবে ৬+১ = ৭ = ০ (যেহেতু ৭কে ৭ দিয়ে ভাগ দিলে কোন অবশিষ্ট থাকে না)। অর্থাৎ জুলাই মাসও বৃহস্পতিবারে শুরু হবে। এবার দিনের ঘরে আসুন। ৫ তারিখ ৪ সংখ্যার অন্তর্গত। তাই এর বার হবে বৃহস্পতি থেকে ৪ বার এগিয়ে সোমবার।

'তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না। যতক্ষণ না তোমার--প্রিয় জিনিস (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে'।

—আল-কুরআন

রবিনের জন্মদিন

জিয়াউদ্দিন হায়দার, ২২৯৬
নবম শ্রেণী (বিজ্ঞান)

আজ রবিনের জন্মদিন। জীবনের দশটি সিঁড়ি ডিঙিয়ে আজ সে একাদশ সিঁড়িতে পা রাখতে যাচ্ছে। প্রতিবারই এ দিনটিতে রবিনের জন্মোৎসব পালিত হয়। তাই, প্রতিবারের মত এবারও সেই সকাল থেকেই চলছে আয়োজন। রবিন আজ ভীষণ খুশী। সমস্ত বাড়ীটাকে সে আনন্দে মাতিয়ে রেখেছে। শান্ত, স্থির রবিন আজ কেন জানি অশান্ত, অস্থির হয়ে উঠেছে। জোরে গলা ছেড়ে গান গাইছে,

"আমার যাবার সময় হল দাও বিদায়।"

রবিনের কচিকণ্ঠে এ গান কেমন জানি লাগল। তবুও সবাই এ গানকেই রবিনের কণ্ঠে আনন্দ সঙ্গীত হিসাবেই ধরে নিল। আবার কিছুক্ষণ পর সে চীৎকার করে আবৃত্তি করছে—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।"

তার মা পাশের ঘরেই কি যেন একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি রবিনের এই অকস্মাৎ পরিবর্তনে কিছুটা বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। তাই তিনি রবিনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রবিন এসব কী হচ্ছে?"

তখন রবিন বলল, "বারে আজ না আমার জন্মদিন, তাই আমি আনন্দ করছি।"

তার মা রবিনের উত্তরে কিছুটা লজ্জা পেলেন। তিনি মনে করলেন, তাই তো, আজ তো তার জন্মদিন, সে আনন্দ করবে বৈকি। কিন্তু, তবুও কেন জানি তার হৃদয় একটা অজানা আশঙ্কার দোলায় দুলে উঠল।

রবিন তখনও কল্পনার উড়োজাহাজে চড়ে বেড়াচ্ছে। মিন্টু, রিন্টু, টুম্পা সবাইকে নিয়ে সে কি করবে, কিভাবে তার জন্মোৎসব আনন্দমুখর হবে, এই সবের একটা রঙ্গীন চিত্র সে মনে মনে এঁকে রাখল।

হঠাৎ করে রবিনের মনটা কেন জানি খারাপ হয়ে গেল। সে দৌড়ে চলে গেল তার মার শয়নকক্ষে, আর গিয়েই তার ছোট ছোট চোখ দুটো নিবদ্ধ করল দেয়ালে টাঙানো কাঠের ফ্রেমে বাঁধা একটা ফটোর উপর। সে আপন মনে বলতে লাগল, "বাবা তোমাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েনি, মার কাছে শুনেছি, তুমি নাকি আমার জন্মের সময় যুদ্ধরত ছিলে, সেই যে একাত্তরের ২৬শে মার্চ রাত্রিতে গেলে, আর ফিরে এলে না। বেঁচে আছ নাকি মরে গেছ"..... একথা বলতেই রবিন চীৎকার করে কেঁদে ফেলল। ওদিকে তার মা কখন

যে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা সে মোটেই আঁচ করতে পারেনি। তাই, যখন রবিন কান্নায় ভেঙে পড়ল, তখন তার মা তাকে বুকে তুলে নিলেন আর বল্লেন, "কাঁদিস নে বাবা, তোর আব্বু যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে তিনি আসবেনই।" একথা শুনে রবিন কিছুটা শান্ত হোল। সে ধীর পদক্ষেপে ফিরে গেল তার খেলার ঘরে। আর তার মা তখনও একটা প্রশ্নের সমাধান খুঁজছিলেন। রবিনকে তিনি কোনদিন এভাবে তার বাবার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখেননি। অথচ, আজ কেন ও এভাবে কাঁদল? এর কারণ কি?

কখন যে সূর্য পাটে নেমেছে, কেউ বুঝতেই পারেনি। ইতিমধ্যে বহু অতিথির আগমন ঘটে গেছে। সারা বাড়ী আজ যেন আনন্দ সাগরে ভাসছে। একসময় যখন "রবিন" নাম লেখা কেকটি কাটার সময় হয়ে এলো, তখন রবিনের ডাক পড়ল। তার মা ডাকতে লাগলেন, "রবিন, রবিন, এই রবিন।"

আর রবিন? সে তখনও তাদের বাড়ীর ছাদের উপর রিন্টু, মিন্টুদের নিয়ে দৌড়া-দৌড়ি করছিল। এভাবে খেল্‌তে খেল্‌তে রবিনের পা দুটো হঠাৎ করে ফস্‌কে যায়। রবিন যে কখন ছাদের একপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল, তা কেউই টের পায়নি। রিন্টু চীৎকার করে উঠল। সে দৌড়ে গিয়ে রবিনের মাকে বলল, "খালাম্মা, খালাম্মা রবিন।" তিনি তার কথা কেড়ে নিয়ে বল্লেন, "রবিন, রবিন কোথায়? ওকেই তো খুঁজছি আমরা। এদিকে দেখতো বাবা, মেহমানরা সবাই বসে আছেন।" রিন্টু বলল, "না খালাম্মা তা নয়, রবিন ছাদ থেকে নীচে পড়ে গেছে।" এ কথা শোনা মাত্রই রবিনের মা একটা আর্তনাদ করে সংজ্ঞা হারালেন।

আর ওদিকে? ওদিকে রবিনের দেহের রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে রাস্তার উপর দিয়ে। তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি জড়ো করা হচ্ছে। রাস্তায় একটা থম্‌থমে ভাব বিরাজ করছে! কতকগুলো কাক এসে ভীড় করেছে। এক সময় রবিনকে ধুয়ে মুছে খাটিয়ায় শুইয়ে দেয়া হলো। এবং রবিন চলল তার জীবনের শেষ স্টেশনের পথে।

ওদিকে তার মার জ্ঞান এতক্ষণে ফিরল। তিনি চোখ মেলেই বল্লেন, "আমার রবিন, আমার রবিন কোথায়?" তখন কে যেন প্রত্যুত্তরে বলল "ও চলে গেছে।"

তার মা চীৎকার করে বল্লেন, "না, না, আজ রবিন কিছুতেই যেতে পারে না, আজ রবিনের জন্মদিন, আজ তার মৃত্যুদিন নয়।"

আজ রবিন নেই। কিন্তু তার স্মৃতি আগলে বেঁচে আছেন তার জননী। রবিনের মা আজও কিশোরদের মেলার মাঝে খুঁজে বেড়ায় এগার বছর বয়সের উচ্ছল ছেলে রবিনকে।

হাজার তারার ভিড়ে

মহাশূন্য ভিত্তিক (বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনী)

এ,টি,এম রিজওয়ানুল কবির, ২৬৫৯
নবম শ্রেণী, (বিজ্ঞান)

চারদিকে পিন পতন স্তব্ধতা। সকলে একটি গোল টেবিলের চারদিকে উদ্বিগ্ন মনে বসে আছেন। দীর্ঘদিন পর আজ তারা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। প্লেটে রাখা স্টার টেবলেটগুলো ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক রন এভার্ড ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন এবং সকলকে বললেন, "আজ আমরা এক অত্যন্ত জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়েছি। আমাদের গ্রহ কোয়াজার আজ এক মহাসংকটের সম্মুখীন। কারণ, আমাদের হিসাব মতে এক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরবর্তী একটি গ্রহ NGK-133 হতে ওমিক্রন রশ্মি পাঠানো হচ্ছে আমাদের কোয়াজারে। এই রশ্মির প্রেরকের মনোভাব আক্রমণাত্মক। কম্পিউটর SK-5 এর মতে এটা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ এবং অতি শক্তিশালী বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ যা যে-কোন মুহূর্তে কোয়াজারকে কক্ষপথ হতে অনেক দূরে নিক্ষেপ করতে পারে।"--একটানা এতগুলো কথা বলে তিনি প্লেটের স্টার টেবলেটের দিকে হাত বাড়ালেন। তখন বৈজ্ঞানিক ক্রিস জনসন সশব্দে উঠে বললেন, "এমতাবস্থায় এক মাইক্রোসেকেণ্ডও আমাদের কাছে অত্যন্ত দামী। খুব শীগগীরই এর একটা প্রতিকার করা দরকার।"

বিজ্ঞানীরা নড়ে চড়ে বসলেন। সমস্যাটি খুবই মারাত্মক। কোয়াজারের সেরা বিজ্ঞানীদের ভয় পাওয়া মুখের কালো ছায়া পড়েছে গোল ইমারতের গোলাপী দেওয়ালে। বুকের ভেতর তাদের শিরশিরে অনুভূতি।

... ...

যে কালটার কথা বলা হচ্ছে সেটা ৫৫৮১ সন। পৃথিবী তখন উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে। পৃথিবীর লোকেরা তখন প্যারালাল ইউনিভার্সে অবাধে যাতায়াত করছে। তাদের গন্তব্য সিওনা (৮১ নম্বর নীহারিকা) পর্যন্ত বিস্তৃত। সিওনার একপাশে পড়ে থাকা ছোট্ট একটি সবুজ রঙের গ্রহ এই কোয়াজার। কোয়াজারে আসতে পৃথিবীর মানুষদের মাত্র ৩২ সেকেণ্ড সময় লাগে। তাদের বাহন এখন টেলিপোর্টেশন। কিন্তু এই চরম উন্নতির শিখরে আরোহন করেও তারা এক অজানা ভয়ঙ্কর শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন যাকে তারা প্রতিরোধ করতে অক্ষম হচ্ছেন।

... ...

তীব্র গতিতে ধেয়ে চলেছে স্পেসশিপ নিনুপ-৩৭। কোয়াজারের অনন্য আবিষ্কার এটা, যা সর্ব গুণের সমাহার। পোর্টহোল দিয়ে দেখা বাইরেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ককপিটে বসা

দু'জন পাইলটের উত্তেজনায় যেন শিড়দাঁড়া খাড়া হয়ে উঠেছে। হঠাৎ কো পাইলট রন চেঁচিয়ে উঠলো, "একি! বাইরেটা এমন বেগুনী হয়ে গেল কেন! আমরা কি কোন ইন্টার ডাইমেনশনাল ডোরে ঢুকছি?' এদিকে পাইলট ক্রিস চেঁচিয়ে উঠলো," আরে! আরে! টাইম পেনেলগুলো কি রকম উল্টো পাল্টা কাজ করছে! ইন্সন্ট্রুমেন্টস্ পেনেলগুলোও গোলমেলে হয়ে গেছে! তবে কি ···।" কথাটা শেষ হলো না। তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করলো নিনুপ-৩৭। সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়লো ক্রিস ও রন এবং স্পেসশিপ কোন এক অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে ধীরে ধীরে একটা ক্ষুদ্রাকার গ্রহের দিকে নামতে শুরু করলো।

তীব্র বেগে একটা এয়ার বক্সে ধাক্কা খেয়ে ল্যাণ্ড করলো স্পেসশিপ। কিছুক্ষণ পর দু'জন অদ্ভুতাকার জীব এসে তাদের শক্তিশালী মারণাস্ত্র দিয়ে নিনুপের এক অংশ খুলে ফেললো। সাথে সাথে বের হলো এক ঝলক নীল আলো। চোখ ধাঁধিয়ে গেল ঐ আলোতে। পিছিয়ে গেল তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সেই আলো সহ্য করে। স্পেসশিপের ভিতরে ঢুকে পড়লো এবং তাদের ভাষায় একজন কি যেন বললো। তখন বাকী পাঁচজন স্পেসশিপের ভিতর হতে দু'টো সংজ্ঞাহীন দেহ বের করলো। সমস্ত ঘটনা ঘটলো মাত্র চার মিনিটে।

··· ··· ···

চারদিকে হালকা লালচে আলো। দু'টো সংজ্ঞাহীন দেহ পড়ে আছে। তাদের একটি মহাশূন্য গবেষণা ইন্সস্টিটিউটের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক রন এভার্ড এবং অন্যটি প্রখ্যাত মহাশূন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক ক্রিস জনসন। কিছুক্ষণ পরেই রন এভার্ড ধীরে ধীরে উঠে বসলেন এবং অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, "স্টার টেবলেট! স্টার টেবলেট!" (৫৫৮১ সনে পানির পরিবর্তে স্টার টেবলেট খাওয়া হবে এবং খাদ্যের পরিবর্তে এনার্জি টেবলেট খাওয়া হবে)। কিন্তু উত্তর আসল না। কোন উত্তর না আসায় রন ক্রিসকে জাগালো। অকস্মাৎ ঘরের আলোটি পরিবর্তিত হয়ে নীলাভ আলোতে পরিণত হলো এবং সাথে সাথেই ক্যাঁচ করে শব্দ হতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকলো চারটি অদ্ভুত দর্শন প্রাণী। কর্তব্য স্থির করে ফেললো রন ও ক্রিস। তারা নিউক্লিয়ার প্যাড থেকে কয়েকটি এনার্জি টেবলেট বের করে খেয়ে ফেললো। ঠিক তখনই জীবগুলো তাদের দিকে মরণরশ্মি তাক করতেই তারা যুগ্মভাবে ঐ চারজনের উপর ডাইভ মারল। তাদেরকে মেরে মারণাস্ত্র কেড়ে নিল। তারা ঐ মারণাস্ত্রের সাহায্যে চারটি প্রাণীকেই অণু পরমাণুতে বিভক্ত করে ফেললো।

একটানা অনেকক্ষণ যুদ্ধ করার পর তারা সময় জানার জন্য ঘড়ির দিকে তাকাতেই আঁৎকে উঠল। রন বললো, "ঘড়ির কাঁটা যে উল্টো দিকে ঘুড়ছে। তবে কি আমরা অতীতের ডায়মেনশনে চলে এসেছি?" ক্রিস ঘড়ির দিকে তাকিয়েই মন্তব্য করলো, "আমরা বোধ হয় সময়ের সেভেন্থ ডায়মেনশনে চলে এসেছি? চলো, একটু বাইরে যাওয়া যাক। এর রহস্য আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।" এই বলে তারা খোলা দরজা পার হয়ে এক প্রশস্ত করিডোরে উপনীত হলো।

করিডোরে পৌঁছেই তারা নিজেদের আবিষ্কার করলো এক নতুন জগতে। তারা বিস্মিত হয়ে দেখলো এই আশ্চর্য গ্রহের নিকটবর্তী নক্ষত্র 'প্রক্সিমা সেন্টরাই' এখান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত যার থেকে আলো ও উত্তাপ খুবই কম পাওয়া যায়। তাই এই গ্রহের বাসিন্দারা

তাদের গ্রহের দু'দিকে দু'টি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করেছে যা প্রক্সিমা সেন্টরাই থেকে আলো প্রতিফলন করে এই গ্রহতে পাঠাচ্ছে। তারা সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাদের স্পেসশিপের খোঁজ করলো কিন্তু কোথাও তার কোন হদিস পেল না। অবশেষে তারা সেখানে ফিরে এলো। অনেকক্ষণ পর এবার রন বললো, "এত জায়গা ঘুরলাম অথচ একটা প্রাণীর চিহ্নও গেলাম না। তবে এ গ্রহের বাসিন্দারা থাকে কোথায় ?" ক্রিস তার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বলল, "চল যে করেই হোক সেই ওমিক্রন রশ্মিকে এখন ধ্বংস করতে হবে। আমি বুঝতে পেরেছি এটাই সেই NKG-133 গ্রহ এবং এখান থেকেই সেই মারাত্মক রশ্মি পাঠানো হচ্ছে।

তারা ঘরের ভিতরে এসে দেখলো যে, ঘরের রং পরিবর্তিত হয়ে নীলচে সবুজাভ হয়ে গেছে। তারা অবসন্ন হয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। হঠাৎ তারা অনুভব করল ঘরের মেঝোটা যেন ক্রমশঃ নীচের দিকে নামছে। মৃদু একটা ঝাঁকুনি খেয়ে মেঝোটা হঠাৎ থেমে গেল এবং প্রায় সাথে সাথেই দরজা খুলে বের হলো পাঁচটি ত্রিপদী প্রাণী। তাদের প্রত্যেকের দু'টি হাতে ছয় ধরনের অস্ত্র। হাতগুলো অনেকটা অক্টোপাসের মত। এসেই তারা তাদের অস্ত্র তুলে ধরল। "খট্" সেফটি ক্যাচ অন্ করার শব্দ হল। প্রস্তুত হল ক্রিস ও রন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মৃত্যুদূত।

... ...

মৃত্যুর প্রহর গুনছে ক্রিস ও রন। হঠাৎ ক্রিসের ইশারায় ক্রিস ও রন একসাথে ডাইভ মারল সেই অদ্ভুত দর্শন পাঁচটি প্রাণীর উপর। সুকৌশলে তাদের ছ'টি হাতের প্যাঁচে তাদেরকেই জড়িয়ে ফেলে মেঝেতে ফেলে রেখে দরজার দিকে পা বাড়াল ক্রিস ও রন। দরজা অতিক্রম করে তারা বারান্দায় পৌঁছুতেই কানে এলো এক তীক্ষ্ণ শব্দ এবং সেইসাথে ভেসে এলো কতগুলো সাংকেতিক ধ্বনি যেগুলো শুনতে প্রায় তাদের কোয়াজারে আগত সেই অজানা আলোকরশ্মির শব্দের মত। তারা সেই শব্দের অনুসরণে একটি ঘরের দরজায় উপনীত হল। দরজায় একটি মাত্র বোতাম। বোতামটি টিপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল এবং সেই তীক্ষ্ণ শব্দ আরো তীক্ষ্ণভাবে তাদের কানে তালা লাগিয়ে দিল। কোনরকমে সহ্য করে ভিতরে ঢুকতেই দেখলো ঘরের ছাদ খোলা এবং মেঝেতে একটা অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র যা থেকে এক রকম নীল আলোকরশ্মি খোলা আকাশের পানে চলে যাচ্ছে। ক্রিস যন্ত্রটিকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বুঝলো এটাই সেই ওমিক্রন রশ্মি যা মহাশূন্যে চলতে চলতে সময়ের সেভেন্থ্ ডায়মেনশন অতিক্রম করে তাদের কোয়াজারের সামনে উপনীত হয়েছে। এটাকে ধ্বংস করতে পারলেই সেই রশ্মিও প্রতিহত হবে। সাথে সাথে যন্ত্রটির টাইমিং জিরোতে দিয়ে ক্রিস চেঁচিয়ে বললো, "রন! ডান দিকে ডাইভ মারো!" তৎক্ষণাৎ এক উজ্জ্বল নীল আলোয় ঘর ভরে গেল এবং তীব্র শব্দে যন্ত্রটি চারদিকে ছিটকে পড়লো। এতে ক্রিস ও রন অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

... ...

ক্রিস ও রন ধীরে ধীরে জেগে উঠলো। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল তারা জানে না। উঠে দেখলো তারা এক ধ্বংসস্তূপের মাঝে পড়ে আছে এবং সম্মুখের দিকে তাকাতেই তারা অবাক হয়ে দেখলো সম্মুখেই তাদের স্পেসশিপ নিনুপ-৩৭। তারা ধীরে ধীরে স্পেসশিপে উঠলো এবং

আশ্চর্য হয়ে দেখলো যে, স্পেসশিপ সম্পূর্ণ অক্ষত। তারা তাদের নিজ গ্রহে ফিরে যাবার এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপভোগ করলো। কয়েকটা স্টার টেবলেট ও এনার্জি টেবলেট খেয়ে ক্রিস পাইলটের সিটে এবং রন কো-পাইলটের সিটে বসলো।

একটা প্রচণ্ড শব্দে স্পেসশিপ নিনুপ-৩৭ স্টার্ট নিল। ক্রিস ও রনের অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ভেসে এলো প্রশান্তির নিঃশ্বাস। আবার তারা ফিরে চলেছে তাদের মায়া মমতায় মাখা কোয়াজারে। চারদিকের নিকষ কালো অন্ধকার ভেদ করে এখন মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে স্পেসশিপ নিনুপ-৩৭ সুদূর সিওনার একপাশে পড়ে থাকা ছোট্ট সবুজ গ্রহ কোয়াজারের পানে।

●

'মোমেন না হইলে বেহেশ্‌ত পাইবে না, পরস্পর ভালবাসা না হইলে মোমেন হইবে না ; ভালবাসা সৃষ্টির সূত্র হইল সালামের আদান-প্রদান'।

—আল-হাদীস

ফাগুন

জাহাংগীর আলম, ২৫৭৭
দ্বাদশ শ্রেণী, (বিজ্ঞান)

অবাক নিশুতি রাতে চাঁদের পূরবী
প্রভাতে ফুলের বনে এনেছে সুরভি
কুমুদ কমল জলে মৃদু শিহরণ
ফিরোজায় পেশোয়াজে লাল আবরণ
গোলাবের রাঙাগুল হসিত আননে
রাঙা চঞ্চু কলমীর অভিশাপ হানে।

নওরোজ সওগাতে বনের কেতকী
মজলিসে ফুলদানে চিনি তোমা চিনি॥
পরিমলে লতাপাতা বসন্ত পুলকে
সোহাগী লাইলী কত চেপে ধরে বুকে।
দিনচক্রের দীন ঐ নতুন নায়রী
আদিম বন্ধন তার কত বিভাবরী
চিরঞ্জিবী প্রিয়া তুমি ফুলেল ফাগুন
কেমনে নিবাই বলো! বুকের আগুন!

●

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা খোদাকে ভয় কর যেমন করে ভয় করা উচিত, আর সম্পূর্ণরূপে মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না'।

—আল-কুরআন

কোরআনই বিজ্ঞান

এ, কে, এম, এনামূল হক, ২৯৪৩
দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

কোরআনের দোহায় দিও নাকো শুধু
অন্ধের মত আর,
চোখ খুলে আগে পড়ে দেখ তুমি
বুঝে দেখ বার বার।

অতল সমুদ্র কোরান মোদের
জ্ঞান-বিজ্ঞানের খনি,
তলদেশে তার খুঁজে দেখ কত
রয়েছে মুক্তা মণি।

ডুবরীর সাজে সাজিয়া তবে
দেখ তার কোথা কি!
কূলে দাঁড়াইয়া বলিও না আর
কত শত দেখেছি॥

সাধনার বলে হইয়াছি সাধু
চোখ বুঁজে সব দেখি,
বলা নাহি যায় দেখাইয়া ভয়
দিও নাকো আর ফাঁকি।

সত্যের দ্বার দাওগো খুলিয়া
কুহকের ঘোরে আর,
সৃষ্টির সেরা মানুষের তুমি
ঠকাইওনা বার বার॥

●

'মুসলমান সেই ব্যক্তি যিনি হাতের দ্বারা, কথার দ্বারা বা অন্য কোন ব্যবহার দ্বারা কাহাকেও কোনরূপ কষ্ট দেন না'।

—আল-হাদীস

কৌতুক

মোঃ মনিরুল হক, ৩০৪৪
অষ্টম শ্রেণী 'ক'

১। মাষ্টার সাহেব স্কুলের চেয়ারে বসে ঘুমুচ্ছিলেন। এমনি সময় স্কুল ইন্‌স্‌পেকটর ক্লাশে হাজির। একজন ছাত্র সংকেত দিতেই মাষ্টার চোখ মেলে দেখলেন সামনে দণ্ডায়মান ইন্‌স্‌পেক্‌টর। অমনি ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন ঃ বুঝলে ইহাই নিদ্রা, আর হ্যাঁ, আগামীকাল সকাল সকাল আসবে, নিদ্রার প্রেকটিকেল ক্লাশ হইবে।

২। মেয়ের বাবা ঃ আচ্ছা ঘটক সাহেব, জামাই নামাজ পড়ে তো?
ঘটক ঃ কি যে বলেন, জামাই তো সারাদিন মসজিদেই থাকে।
বিয়ের পর দেখা গেল জামাই নামাজ পড়ে না।
মেয়ের বাবা ঃ (রাগান্বিত কণ্ঠে) ঘটক সাহেব আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন কেন? জামাই তো নামাজ কোন দিনই পড়ে না।
ঘটক ঃ আমি তো নামাজের কথা বলিনি। জামাই সারাদিন মসজিদে থাকে বলেছিলাম। এখনও থাকে, সেখানে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে।

৩। জনৈক ব্যক্তির বাম পায়ে ব্যথা অনুভব হওয়ায় ডাক্তারের নিকট গেলে ডাক্তার বললেন ঃ ইহা বার্ধক্যের জন্যে হয়েছে। এ ছাড়া আর কিছুই নয়।
জনৈক ব্যক্তি ঃ তা না হয় মানলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে ডান পা আর বাম পায়ের বয়স সমান। তো ডান পায়ে ব্যথা না হয়ে বাম পায়ে হোল কেন?

৪। একজন পথচারী আর একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করল ঃ আচ্ছা, ভাই দেখুন তো কটা বাজে?
২য় পথচারী ঃ বেজে পাঁচ মিনিট।
১ম পথচারী ঃ আরে! বাজে পাঁচ মিনিট, কটা বেজে পাঁচ মিনিট?
২য় পথচারী ঃ বল্লাম তো বেজে পাঁচ মিনিট।
১ম পথচারী ঃ আবার, পাঁচ মিনিট। ক'টা বেজে পাঁচ মিনিট সেটা বলবেন তো?
২য় পথচারী ঃ কি আর বলব, বিয়ের সময় শ্বশুর আমাকে একটি ঘড়ি দিয়েছিল, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটাই নাই।

৫। ডাক্তার ঃ এবার আপনার অসুবিধাগুলো বলুন।
রোগী ঃ এবারই আমাকে বিপদে ফেল্লেন। আমার তো কোন অসুবিধা নেই।
ডাক্তার ঃ (বিস্ময়ের সাথে) তবে এসেছেন কেন?
রোগী ঃ কিভাবে অসুখ করতে হয় তা জানতে। আমার একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট দরকার কি না তাই।

৬। এক ছেলে তার স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়ে হেরে গেল। তার মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিরে মিঠু তুই না বরাবর দৌড়ে প্রথম হস, এবার হারলি কেন?
মিঠু উত্তর দিল ঃ কেন, মা, আমার কি দোষ? টিভিতে দেখি সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান স্লো মোশনে সব সময়ই প্রথম হয়, আমিও স্লো মোশনে দৌড় দিয়েছিলাম।

একটু হাসি

আব্দুল মুহিত, ২২৪১
ষষ্ঠ শ্রেণী 'ক'

১। একবার এক ভদ্রলোকের গাড়ী দুর্ঘটনায় পড়ে একেবারে চুরমার হয়ে গেল। সেই ভদ্রলোক তার গাড়ী যে কোম্পানীতে বীমা করেছিলেন, সেখানে গিয়ে টাকা দাবী করলেন। তখন কোম্পানীর ম্যানেজার তাকে টাকা দেওয়া হবে না বলে জানালেন। কিন্তু অনুরূপ আর একটি গাড়ী দেওয়া হবে। ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন আমার স্ত্রীর বীমাও তো এই কোম্পানীতে করা আছে। আপনারা কি আমার স্ত্রী মরে গেলে আর একটি নতুন স্ত্রী এনে দেবেন।

২। একবার এক টেকো মাথা শিক্ষক ক্লাশে চুলের যত্ন সম্বন্ধে পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় এক দুষ্টু ছেলে দাঁড়িয়ে বলল স্যার, আপনার চুল এত যত্ন নেওয়ার পরও উঠে গেল কেন? শিক্ষক একথা শুনে রেগে গিয়ে ছেলেটির চুল টেনে ধরলেন। ছেলেটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "স্যার প্রাকটিক্যাল করে না দেখালেই হত। মুখে বললেই বুঝতে পারতাম যে আপনার শিক্ষক ছোট বেলায় আপনার চুল এভাবে টানার ফলে ছিঁড়ে গেছে।"

৩। এক অধ্যাপক ক্লাশ নিচ্ছেন।
অধ্যাপক ঃ (ঘুমন্ত ছেলেকে লক্ষ্য করে) এই ছেলে তুমি আমার ক্লাশে কখনই ঘুমাতে পার না।
ছাত্র ঃ (মুখ তুলে) পারি স্যার আপনি একটু আস্তে লেকচার দিলে।

৪। দুই বান্ধবীর কথা হচ্ছিল। এক বান্ধবী অন্য জনকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা তোর স্বামীর ভুলোমনার জন্যে কোন অসুবিধা হয় না?"
অপর বান্ধবী জবাব দিল, "না, বরং সুবিধাই হয়। অনেক সময় মাসে দুইবার সংসার খরচ দেন।"

৫। পথিক ঃ এই রিকসাওয়ালা, বায়তুল মোকাররম যাবে?
রিকসাওয়ালা : যামুনা কেল লাইগ্যা, যাওনের লাইগাই তো বয়া আছি।
পথিক : কত নেবে?
রিকসাওয়ালা : দুই ট্যাকা।
পথিক : কেন এখান থেকেই তো দেখা যাচ্ছে!
রিকসাওয়ালা ঃ জমিন থেইক্যা তো চাঁদ দেহন যায়। আমি আপনেরে দশ ট্যাকা দিমু, লইয়্যা যান তো দেহি।

নববর্ষ

রফিকুল ইসলাম সিদ্দিক, ২৪৩২
দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

পুরাতনের বিদায় বেদনা আজিকে বিধুর,
নতুনের আগমনে ধন্য হোক এ জীবন মধুর।
যেতে দিতে চাই নাকো আজি তোমাকে,
কালের স্রোতে ভেসে যাও এসো নাকো ফিরে।
তবু মোরা ভুলবো নাকো তোমার স্মৃতি,
তোমারি মাঝে গড়ে তুলবো মোরা নতুন প্রীতি।

হে, নববর্ষ, তোমারে জানাই সম্ভাষণ
তোমার আগমনে হেসে উঠুক বিশ্বভুবন।
পুণ্য হোক ধ্যানে ধনে পুষ্প বনে বনে,
ভবিষ্যতের বাণী নিয়ে এসেছো আজ দ্বারে।

ছড়া

মাহ্‌বুবুর রহমান, ২৬৭৭
তৃতীয় শ্রেণী 'খ'

আসফাক নবী,
হতে চায় কবি।
পড়া লেখা শেষ করে
খাতা নিয়ে বসে পড়ে,
লিখে শুধু গল্প,
ছড়া কাটে অল্প।

নিয়াজ মোরশেদের সাথে কিছুক্ষণ

জাহাঙ্গীর হোসেন, ২৮৯৫
দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

ঐতিহ্যবাহী R.M.S-এ দাবা এক অতি জনপ্রিয় খেলা। নিবন্ধ লেখার সময় জোরে সোরে আমাদের ইনস্টিটিউশনে দাবা প্রতিযোগিতা চলছে। এমন সময় স্থির করলাম জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও আন্তর্জাতিক মাস্টার নিয়াজ মোরশেদের একটা সাক্ষাৎকার নেব।

রোববার, ২৫শে অক্টোবর, সকালে দুরু দুরু বুকে গেলাম নিয়াজদের ঝিগাতলার বাসার উদ্দেশ্যে। একে আমি সাংবাদিকতা জীবনে একেবারে অর্বাচীন, আর নিয়াজ Interview দিতে প্রবীণ। যা হোক বেলটি পড়তেই দরজা খুললেন সদা হাসি-খুশি মাহবুব ভাই। উনিই, নিয়াজের বড় ভাই। নিয়াজরা তিন ভাই, নিয়াজ, মাহবুব ও ফায়সাল মোরশেদ।

মাহবুব ভাই এর কাছে জানলাম অল্পক্ষণ আগে জাতীয় ক্রীড়া পত্রিকা 'ক্রীড়াজগৎ' নিয়াজের সাক্ষাৎকার নিয়ে গেছে। নিয়াজ আসলে, ওকে বললাম, "আমার তো ভাই কোনদিন সাক্ষাৎকার নেবার বা দেবার সৌভাগ্য হয়নি, তাই তুমিই এতে যুগপৎ দুই ভূমিকা পালন কর।" আমার কথায় নিয়াজ অল্প হেসে সম্মতি জানাল। তারপর, জীবনের বিরল ২ ঘন্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল জানলাম না। ভুলেই গেলাম আমি এক বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে বসে আছি, যার সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি দেশী-বিদেশী গণমাধ্যমে নিত্যনৈমিত্তিকভাবেই প্রকাশিত হচ্ছে!

নিয়াজ মোরশেদ সম্পর্কে অনেকেই আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। তবু কোন কোন পুরানো কথা আছে যা কোন দিনই পুরানো হয় না।

নিয়াজ মোরশেদ সেন্ট যোসেফ স্কুলের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর বর্তমান বয়স ১৫ বছর। মাত্র ৬ বছর বয়সে ১৯৭২ সালে বড় ভাই মাহবুবের কাছে তাঁর দাবায় হাতেখড়ি। তারপর নিয়াজ আর পিছনে ফিরে তাকাননি। একে একে দেশী-বিদেশী অনেক দুর্লভ সম্মান যোগ হয়েছে তাঁর নামের পাশে।

১৯৭৫ সালে সোভিয়েট গ্র্যাণ্ডমাস্টার আনাতোলী লুতিকভ বাংলাদেশে আসেন এবং বালকদের সাথে Simultaneous প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। তখন ২০ জন বালকের মধ্যে নিয়াজই একমাত্র লুতিকভের সাথে ড্র করে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করে। পরের বছর ১৯৭৬ সালে নিয়াজলুতিভকে Simultaneous খেলায় পরাজিত করে Sensation সৃষ্টি করেন। ১৯৭৭ সালে নিয়াজ তৃতীয় জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতায় অষ্টম ও মোহসীন স্মৃতি দাবা প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৮-এ ৪র্থ জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতায় তৃতীয় ও মোহসীন স্মৃতি দাবা প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান অধিকার করে অনেকটা এগিয়ে আসে।

এল ১৯৭৯। বাংলাদেশে দাবার স্বর্ণবৎসর। বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মত ঘটল এক বিস্ময়। ৩৬ দিনব্যাপী সুদীর্ঘ শ্বাসরুদ্ধকর দাবা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। বিস্ময় বিমূঢ় দেশবাসী প্রত্যক্ষ করল ১২ বছরের নিয়াজ বাংলাদশের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন।

এর ক্যাপাব্লাঙ্কার পর নিয়াজই ২য় ব্যক্তি যিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে নিজ দেশের চ্যাম্পিয়ন-শীপ অর্জন করলেন। নজীরবিহীন এই ঘটনার নায়ক বিশ্বের দাবা ইতিহাসে এক স্থায়ী আসন অধিকার করে নিলেন। পর পর তিনবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন নিয়াজ স্বাধীনতা উত্তরকালীন বাংলাদেশে সর্বাধিক বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেন।

১৯৭৯ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত আলেখিন দাবা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ সাবজুনিয়র পুরস্কার নিয়াজের প্রথম আন্তর্জাতিক কৃতিত্ব। তারপর ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সিলভার কিং আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায় যুগ্মভাবে রানার্স আপ হন। এবছরই নিয়াজ প্রথম বাংলাদেশী খেলোয়াড় যিনি আন্তর্জাতিক রেটিং পেলেন। ১৯৮০ সালে ১ম কিউ. এম. হোসেন আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা ও ১৯৮১ সালে ২য় কিউ. এম. হোসেনে নিয়াজ যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ৩য় স্থান অধিকার করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের দলনেতা হিসাবে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশীয় দলগত দাবায় অংশ নেন। বাংলাদেশ এশীয় 'B' গ্রুপে প্রথম হয়। মাদ্রাজে এশীয় জুনিয়র দাবায় ৮ম স্থান অধিকার করেন। উল্লেখ্য শেষ দুইটি প্রতিযোগিতায় নিয়াজ অসুস্থ ছিলেন।

এবার ১৯৮১ সালে দুবাই-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে এশীয় জোন-৯এ নিয়াজ রানার্স আপ হয়ে আন্তর্জাতিক মাষ্টার খেতাব লাভ করেন। বর্তমান পৃথিবীতে ১৫ বছর বয়সের মাত্র ৪ জন আন্তর্জাতিক মাষ্টার আছেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১। নিজেল শর্ট—যুক্তরাজ্য

২। নিয়াজ মোরশেদ—বাংলাদেশ

৩। সায়েদ আহমেদ সায়েদ—সংযুক্ত আরব-আমিরাত

৪। দিবেন্দ্র বড়ুয়া—ভারত

ভারতীয় উপ-মহাদেশের ৪ জন আন্তর্জাতিক মাষ্টারের মধ্যে নিয়াজ একজন। বিশেষজ্ঞ-দের মতে নিয়াজের বর্তমান স্থান এশিয়ার ২০ জন আন্তর্জাতিক মাষ্টারের মাঝামাঝি।

এবার নিয়াজের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে যে কথোপকথন হয়েছিল তা তুলে দিচ্ছি।

প্র ঃ তোমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় খেলা কোন্‌টি?

উ ঃ অনেকের কাছে জেতা খেলাই স্মরণীয় হয়। তবে আমার কাছে প্রথম কিউ, এম হোসেন আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় ভারতের আন্তর্জাতিক মাষ্টার ম্যানুয়েল অ্যারনের কাছে পরাজয়টিই সবচেয়ে বেশী স্মরণীয়। এ খেলায় পরাজয়ের ফলে আমাকে পুরো এক বছর একরকম নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে হয়।

প্র ঃ তুমি কি পেশাদারী প্রথা সমর্থন কর?

উঃ নিজের ক্ষেত্রে নয় তবে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে। সুষ্ঠ Professionalism ছাড়া বাংলাদেশের দাবার মান উন্নয়ন খুব দুরূহ হবে। ব্যক্তিগতভাবে পড়াশুনাই আমার জীবনের মূল লক্ষ্য।

প্রঃ গত ২০/৩০ বছর আগেও আমরা দেখেছি পৃথিবীর দাবা অঙ্গনে প্রবীণদের এক-চেটিয়া আধিপত্য ছিল। কিন্তু, হঠাৎ কিভাবে সম্প্রতি তরুণরা দাবায় দক্ষতা অর্জন করল, এই সম্পর্কে তোমার মতামত কি?

উঃ (সহজ স্বভাবসুলভ হাসি দিয়ে) এ প্রশ্ন যতটা সহজ, উত্তরটা তত নয়। আমরা যদি বিশ্বের পরিসরে না দেখে শুধু আমাদের দেশের পরিসরে এ ঘটনা পর্যালোচনা করি তবে বুঝতে পারব সময়ের সাথে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এর জন্য দায়ী। বছর ২০/৩০ আগে আমাদের সমাজে গুরুজনদের ছোটদের উপর কর্তৃত্ব ও অনুশাসন অনেক বেশী দৃঢ় ছিল। তাঁরা ছোটদেরকে পড়াশুনা ইত্যাদি কারণে দাবা খেলতে দিতেন না। ফলে দাবা খেলায় বড়দের নিরংকুশ প্রাধান্য ছিল। কিন্তু আজকের সমাজে এই প্রতিকূলতা অনেকাংশে হ্রাস পাওয়ায় দাবার অঙ্গনে তরুণদের শুভাগমন সম্ভব হয়েছে। আর, বয়সের সাথে IQ. সৃজনশীলতা ইত্যাদি হ্রাস পায়, ৪০ উর্ধ্ব বয়সে Originality প্রায় নগণ্যে পৌঁছায়। তাই প্রাণ প্রাচুর্যের অধিকারী তরুণ সমাজ সহজেই বৃদ্ধদের Outsmart করছে।

এছাড়া, দাবা, বক্সিং, সকার ইত্যাদি খেলা থেকে কোন ব্যতিক্রম নয়। ধীরে ধীরে হলেও বয়সের সাথে দাবাড়ুর ফর্ম খারাপের দিকে যায়।

প্রঃ দাবাগুরু ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে তোমার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

উঃ টুর্ণামেন্ট চলাকালীন সময়ে, দুবাইতে অবস্থানকালে দাবাগুরুর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই মনে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে আমি নিদারুণ-ভাবে মর্মাহত হয়েছি এবং তাঁর অভাব সত্যিই অপূরণীয়।

প্রঃ পড়াশুনা ও দাবা এক সাথে চালিয়ে যেতে তোমার অসুবিধা হয় না?

উঃ অসুবিধা? সে তো অবশ্যই হয়। তবে সেন্ট যোসেফ স্কুলের আদর্শ শিক্ষা পরিবেশ, প্রধান শিক্ষক ব্রাদার্স রাল্ফ ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের স্নেহ-সহযোগিতা এসবের জন্যই বোধ হয় আমার পক্ষে এখনও এভাবে চলা সম্ভব হচ্ছে।

প্রঃ তুমি কি অদূর ভবিষ্যতে রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র হতে চাও?

উঃ মডেল কলেজ সম্পর্কে আমি অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করি। উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা পেলে রেসিডেন্সিয়াল মডেল-এর ছাত্র হওয়ার গৌরব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব না।

প্রঃ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের দাবা খেলোয়াড়দের প্রতি তোমার বলবার রয়েছে কি?

উঃ দুই ধরনের খেলোয়াড় সব জায়গাতেই আছে। একদল খেলেন Amusement বা বিনোদনের জন্য। "They are welcome to play with me anytime" আর যাঁরা দাবা খেলোয়াড়রূপে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চান তাঁদের প্রতি আমার উপদেশ তাঁরা যেন সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে অনুশীলন ও অধ্যবসায় অব্যাহত রাখেন।

নিয়াজ মোরশেদ বাংলাদেশের দাবা অঙ্গনে এক জীবন্ত কিংবদন্তী। বাংলাদেশের দাবার অগ্রগতির পিছনে নিয়াজের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা কতখানি অবদান রেখেছে তা কেবল ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরাই জানেন। মুষ্টিযুদ্ধের রাজা মোহাম্মদ আলী বলেছেন "I owe boxing nothing,

Boxing owes me"। আর তেমনি আমরা বাংলাদেশীরা সগর্বে বলতে পারি "নিয়াজ মোর্শেদ-কেই জাতীয় দাবার প্রয়োজন নিয়াজ মোরর্শেদের জাতীয় দাবার প্রয়োজন নেই।" নিয়াজের সাফল্যমণ্ডিত জীবন কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

একান্ত ব্যক্তিগত

নাম	--	নিয়াজ মোরশেদ
ডাক নাম	—	গোগো
জন্মস্থান	—	ঢাকা
জন্ম তারিখ	--	১৩ই মে ১৯৬৬
উচ্চতা	--	৫"-৬"
ওজন	--	১২৫ পাউণ্ড
পেশা	--	ছাত্র
প্রিয় খাদ্য	—	হালুয়া
,, পানীয়	--	লেমোনেড
,,	—	ড্যালাস
,, চলচ্চিত্র	—	নাই
সবশেষ পড়া বই	—	ম্যাক্রিম গোর্কির "মা"
প্রিয় গায়ক	—	ভূপেন হাজারিকা / বিলি জোয়েল
কুসংস্কার	--	নাই
ভয়	—	নাই
পছন্দ	--	যা কিছু ভাল
অপছন্দ	--	সরীসৃপ
সখ	--	গান শোনা, ফুটবল খেলা
প্রিয় বিনোদন	—	গল্পের বই পড়া
প্রিয় বন্ধু	--	আমি নিজেই
সবচাইতে সৌভগ্যজনক মুহূর্ত	--	দুবাই-এ আন্তর্জাতিক মাস্টার শিরোপা লাভ
সর্বকালের প্রিয় খেলোয়াড়	--	কারপভ এবং ক্যাসপারভ
দেশের মধ্যে প্রিয় খেলোয়াড়	--	ইউনুস হাসান এবং রেজাউল হক
কোন্ কোন্ দেশে খেলেছেন	--	সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, ভারত।

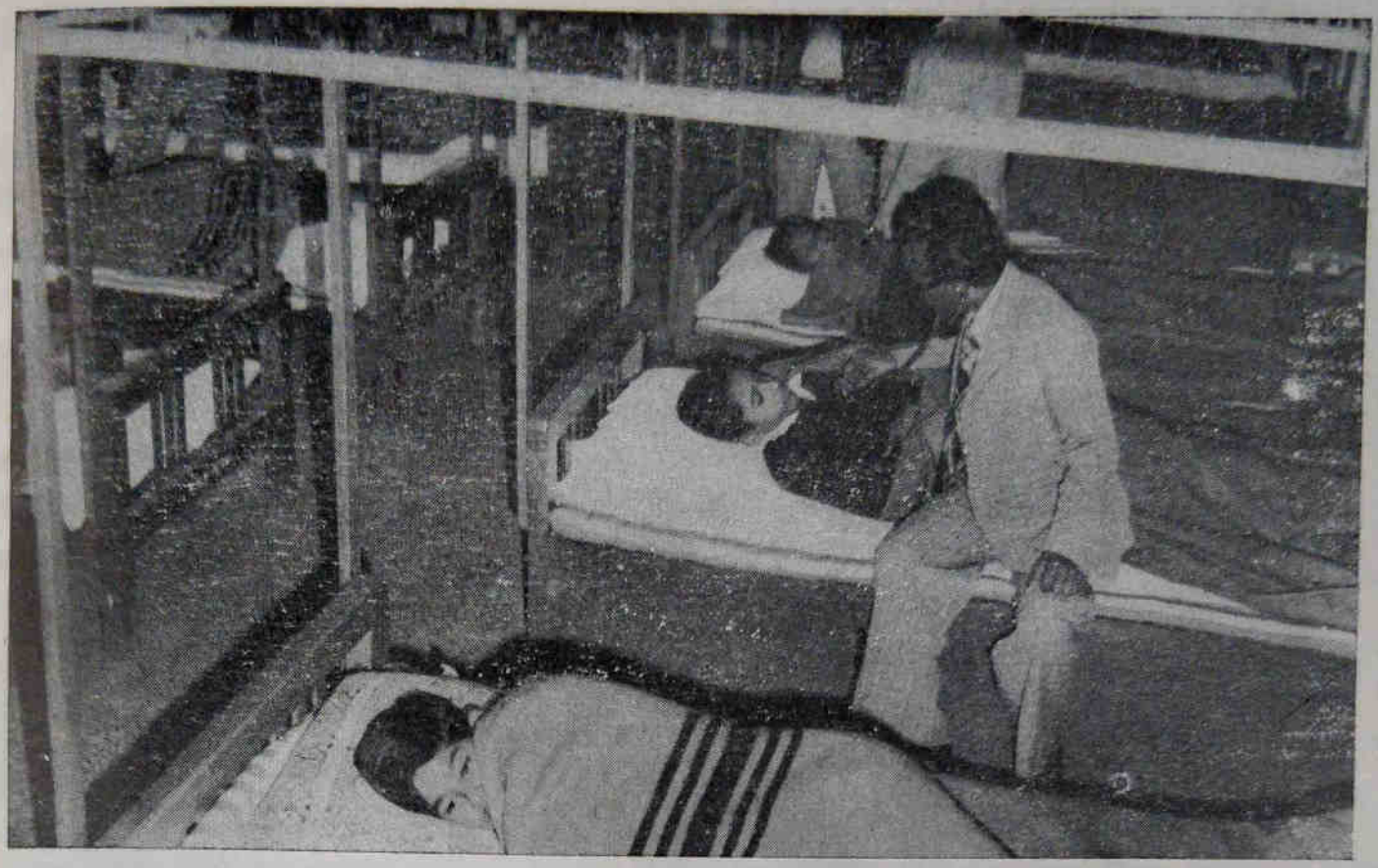

চিকিৎসা কেন্দ্র

প্রাণীবিজ্ঞান গবেষণাগার

ফুটবল টিম

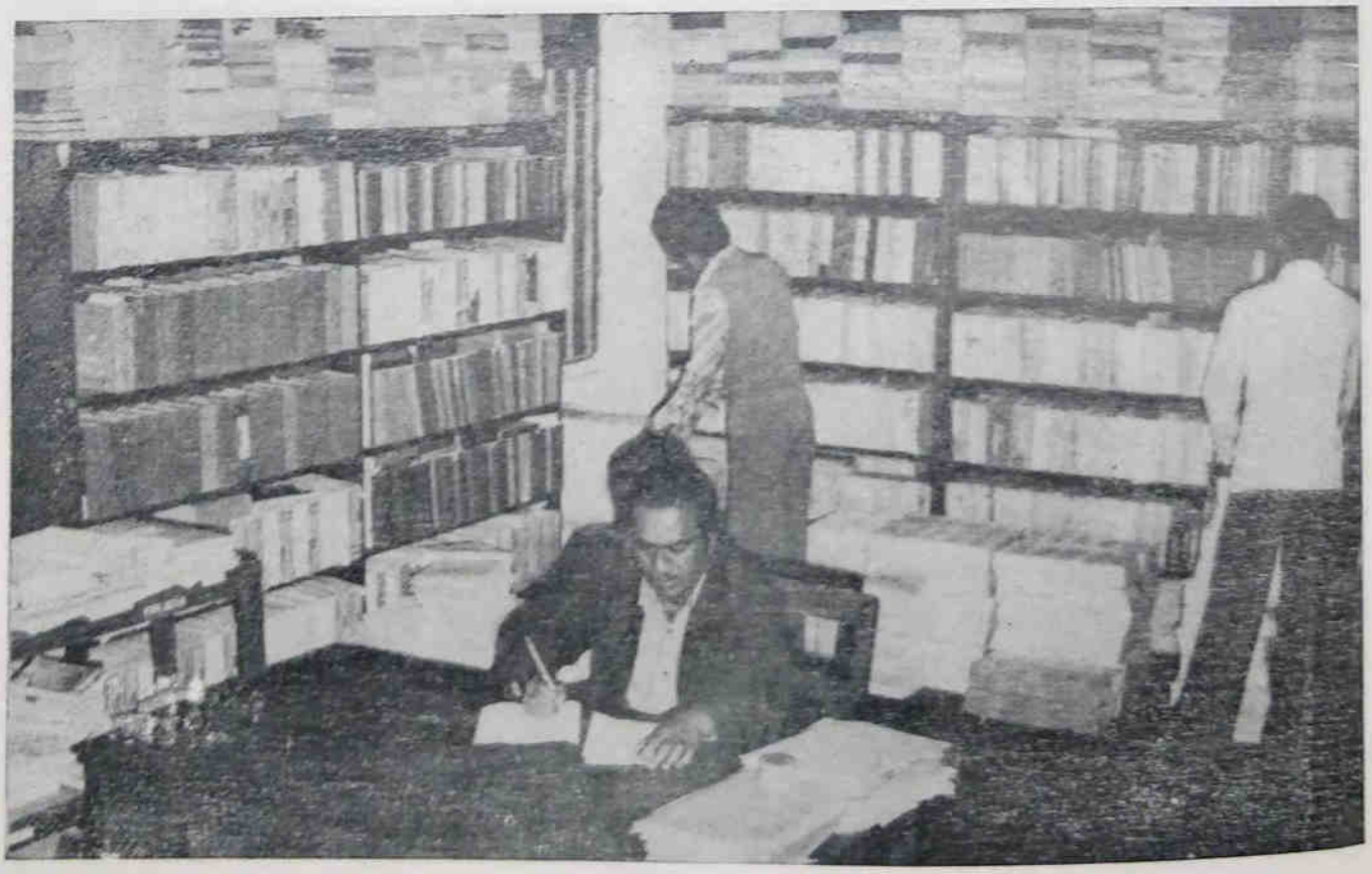

টেক্সটবুক সেন্টার

জীবনে লক্ষ্য

মোঃ আখ্‌তারুজ্জামান তালুকদার, ২৮৯৮
দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

আমরা শিক্ষিত সমাজ 'জীবনের লক্ষ্য' কথাটার সঙ্গে অতি পরিচিত। বিদ্যারম্ভ লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার লক্ষ্য করেছি, হয়তো আরো লক্ষ্য করবো। কিন্তু এর গূঢ়ার্থ তলিয়ে দেখেছেন ক'জন?

কথাটি দুটি শব্দাংশ নিয়ে গঠিত—'জীবন', ও 'লক্ষ্য'। 'জীবন' হচ্ছে আমাদের নশ্বর দেহের পরিচালক। সে তার ইচ্ছামত দেহকে কাজে নিয়োগ করে তার মূল্য আদায় করে নিতে পারে। 'জীবন' ও 'দেহ' আলাদা জিনিস তবে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত! একটা বৈদ্যুতিক বাতির সাথে তুলনা করে 'জীবন' ও 'দেহের' সম্পর্ক ও প্রভেদ উপলব্ধি করা যাবে। বৈদ্যুতিক বাতিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ ও বাল্‌ব দুটিই অত্যাবশ্যক। বিদ্যুৎ প্রবাহিত না করে শুধু বালব থেকে যেমন কোন আলোক পাওয়া যায় না তেমনি বালব সংযুক্ত না করে শুধু তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলেও তা থেকে আলোক পাওয়া যায় না, তবে তাতে শক্তিটা নিহিত থাকে—আলোকরূপ তার প্রকাশের অপেক্ষা মাত্র। 'জীবন' ও 'দেহ' তদ্রুপ 'জীবন' শক্তি আর 'দেহ' ধারণকারী; শুধু একটি দ্বারা মানবের অস্তিত্ব অসম্ভব। লক্ষ্য করার বিষয়, বিদ্যুৎ প্রবাহের আলোক রূপে প্রকাশের সাহায্যকারী হিসেবে যেমন বালবের প্রয়োজন তেমনি 'জীবন' এর মানবরূপে প্রকাশের সাহায্যকারী হল দেহ। সুতরাং মানুষের জীবনটাই মুখ্য দেহটা গৌণ।

মানবজীবন বলতে আমরা ব্যবহারিক অর্থে যা বুঝি তা 'জীবন' ও 'দেহ' এ দুয়ের সমষ্টি। যেহেতু 'জীবনটা' মুখ্য কাজেই মানব জীবনের লক্ষ্য বলতে 'জীবন'-এর লক্ষ্যই বুঝায়।

জীবন (Life) হচ্ছে আত্মার (Soul) সক্রিয় অবস্থা। জড়বাদী ছাড়া আপনি যে ধর্মেরই অনুসারী হোন না কেন আপনার ধর্ম আপনাকে শিখিয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময় (Period) পৃথিবীতে অতিবাহিত করে আপনি মরবেন—তখন দেহটা পৃথিবীতে রবে, কিন্তু আত্মা স্রষ্টার কাছে চলে যাবে এবং অতঃপর বেহেশত বা দোযখ, স্বর্গ বা নরক heaven বা hell এ প্রবেশাধিকার পাবে পার্থিব জীবন কালের কৃতকর্মের ফলাফলের ভিত্তিতে। বুদ্ধি দিয়ে যতই তর্ক করুন না কেন সবাই বেহেশত, স্বর্গ বা heaven এ প্রবেশাধিকার চান। আর এও আপনার ধর্ম আপনাকে শিখিয়েছে যে, সৎকর্ম, জনসেবা, পরার্থে আত্মোৎসর্জন এসব পরলোকে উপরোক্ত প্রার্থিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। যেমন ইসলাম ধর্মের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন—"যে ব্যক্তি পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি সদয় হয় ঊর্ধ্বলোকের প্রভুও তার প্রতি সদয় হন।

বাইবেলের কথা—"To love man is to love God"। স্রষ্টা সন্তুষ্ট হলেই মানুষ তাঁর অনুগ্রহে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে পারবে। কোন Idealist হয়তো বা তেতে উঠেছেন—তবে

কি তথাকথিত সৎকর্ম, জনসেবা পরার্থে আত্মোৎসর্জন স্বার্থবাদিতার নামান্তর নয়? তা বৈকি? পরম এর সাপেক্ষে এটা স্বার্থবাদ হতে পারে। কিন্তু এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবই আপেক্ষিক (Relative)। কেবল স্রষ্টা পরম (alsolute) নিষ্ক্রয়তা বা অসৎকর্ম, স্বার্থপরতা এসবের সাপেক্ষে উপরোক্ত গুণগুলো স্বকীয়নামে সার্থক।

জড়বাদীদের ক্ষেত্রে যুক্তি হল, জাগতিক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি সৎকর্ম, জনসেবা, পরার্থে আত্মোৎসর্গ এসব ছাড়া কেউ পৃথিবীতে প্রতিপত্তি ও যশ লাভ করতে পারে না। কিন্তু এটা সবাই চায়। অতএব তার লক্ষ্যে পেঁছুতে হলে সৎকর্ম, জনসেবা, পরার্থে আত্মোৎসর্জন এসব দ্বারা মানুষের মন জয় করা অত্যাবশ্যক।

জড়বাদী নন আবার কোন ধর্মেই আস্থাশীল নন এমন যদি কেউ থাকেন তবে আপনাকে বলতে চাই--আপনি অবশ্যই পৃথিবীতে সুখ চান। বাইরে তর্কের খাতিরে যাই বলুন না কেন সুখ চান না। এমন লোক কেউ নন। কিন্তু সুখ সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার, উপলব্ধি ব্যাপার--ধনের ব্যাপার নয়? বিশ্ববরেণ্য মহা মানবদের অভিজ্ঞতা---জ্ঞান গর্ভ বাণী-- ভোগে সুখ নয় ত্যাগেই সুখ। কবি বলেন---

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও;
তার মত সুখ কোথায় কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পুষ্প যেমনি আপনার জন্য ফোটে না তেমনি মানুষও পরের জন্য তার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করে অনাবিল সুখ লাভ করতে পারে, তার পার্থিব জীবন সার্থক হয় অর্থাৎ সে তার পরমাকাঙ্খিত লক্ষ্যস্থলে পেঁছে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল সৎকর্ম জনসেবা, পরার্থে আত্মোৎসর্জন এসব দ্বারা মানুষ সে যে ধর্মে অনুসারী বা জড়বাদী যাই হোক না কেন তার লক্ষ্যস্থলে পেঁছুতে পারে। যেহেতু সততা, পরার্থপরতা, জনসেবা ইত্যাদির দ্বারা জীবনের লক্ষ্যস্থলে পেঁছা সম্ভব কাজেই সৎ, জনসেবক, পরার্থপরায়ন ইত্যাদি হওয়ার মানেই হল জীবনের লক্ষ্যে পেঁছা!

আমরা জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলি--'ইঞ্জিনিয়ার হওয়া' 'ডাক্তার হওয়া' 'কৃষিবিদ হওয়া', 'অর্থনীতিবিদ হওয়া', 'সাহিত্যিক হওয়া' 'বৈজ্ঞানিক হওয়া' আরো কত কি? লক্ষ্য করেছেন কি যে এগুলোর কোনটাই জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের পরিপূর্ণ আভাস দেয় না। যেমন ধরুন একজন লোক কেবল টাকা রোজগার করার আশায় ডাক্তার হতে পারে আবার আর্ত, পীড়িত ও দুঃস্থের সেবা করার জন্যও ডাক্তার হতে পারে। যদি টাকা রোজগারই মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি রোগীর সাথে প্রবঞ্চনা করতেও কুণ্ঠিত হবে না। আর যদি আর্ত, পীড়িতের সেবা করার উদ্দেশ্যে মুখ্যতঃ ডাক্তার হয় তবে আশা করা যায় সে পরোপকার করবে অর্থাৎ জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যমুখী হবে। তাহলে 'ডাক্তার হওয়া' লক্ষ্যটা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হতে পারে না। তেমনিভাবে সাহিত্যিক পয়সা রোজগারের আশায় বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থোদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে, বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক অস্ত্র যেমন এটোমবোম, নিউক্লিয়ার বোমা এসব উদ্ভাবন ও তৈরী করতে গিয়ে, ইঞ্জিনিয়ার অসৎ

পদ্ধতিতে কোটিপতি হয়ে গিয়ে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে। অতএব উপরে উল্লেখিত তথাকথিত 'জীবনের লক্ষ্য' গুলো জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য নয়। আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত 'সততা অর্জন' যার দ্বারা পৃথিবীটা নির্ঝঞ্ঝাট হবে, 'জনসেবা' যার দ্বারা পৃথিবীবাসী উপকৃত হবে, 'পরার্থে আত্মোৎসর্জন' যার দ্বারা পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে ইত্যাদি। 'সততা অর্জন' করার লক্ষ্যে অগ্রসর হলে আপনি চাকুরী ক্ষেত্রে ঘুষ খাবেন না, কাজকর্মে ফাঁকি দেবেন না, সামাজিক জীবনে অন্যকে ফাঁকি দিয়ে তার জমি বা কোন সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করবেন না, বন্ধুবান্ধবের ও প্রতিবেশীর অনাস্থাভাজন হবেন না ইত্যাদি অর্থাৎ এতে করে আপনি স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন ও একই সাথে দশের সন্তুষ্টি অর্জন-করে আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হবেন। 'জনসেবা' বা পরার্থে 'আত্মোৎসর্জন' কারো জীবনের লক্ষ্য হলে ঐ ব্যক্তি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক যা-ই হউন না কেন উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন করলেই তিনি স্রষ্টার কাছ থেকে প্রাথিত স্বর্গ বা বেহেশতে প্রবেশধিকার পাবেন এবং পৃথিবীতে পরম আকাঙ্খিত সুখ অর্জন করতে পারবেন।

●

'মিথ্যা বলা, অঙ্গিকার ভঙ্গ করা, আমানতের খেয়ানত করা--মোনাফেকের নিদর্শন; যদিও নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, মুসলমান হওয়ার দাবী করে'।

--আল-হাদীস

মোরগ মারতে গিয়ে

কামাল আকবর, ২৮৫১
চতুর্থ শ্রেণী 'খ'

কুহু কুহু মোরগ ডায়া
ডাকছিল যেই গাছে,
শিয়াল ভায়া অমনি এসে
জুটলো গাছের কাছে।
শিয়াল বলে শুনেছ নাকি
মজার খবর কিছু,
আইন হয়েছে পশু-পাখীর
রইবে পিছু পিছু।
মোরগ বলে, "সংবাদ তোমার
অতি শুভ ভাই
নেচে নেচে ভুলু বুঝি
দৌড়ে আসছে তাই।
তাধিন তাধিন খেলতে হবে
তাকে সাথে করে,"
ভুলুর নামে শিয়াল মামার
প্রাণটা কেমন করে।
শিয়াল মামা পেল ভয়
ভুলুর কথা শুনে,
এক দৌড়ে শিয়াল পণ্ডিত
পালালো গিয়ে বনে।

মা

মীর নাহিদ অহ্‌সান, ২৮৫৭
দ্বিতীয় শ্রেণী

'মা' কথাটি ছোট্ট বটে,
কিন্তু জানো ভাই?
মায়ের মতো আপন কেহ
ধরার বুকে নাই।

মা বিহনে জীবন যেন
দুঃখের পশারী,
মায়ের ভাষা বলতে এলো
ঐ ফেব্রুয়ারী।

মামার বাড়ী

মোহাম্মদ সাইফুল বাশার, ২৮৬৭
চতুর্থ শ্রেণী 'খ'

চলো যাই তাড়াতাড়ি,
যাবো আজ মামা বাড়ী।
আম জাম লিচু খাবো,
মামী মা'র পিঠা খাবো,
মাছ মারবো খালে বিলে,
ফিরবো ঘরে সন্ধ্যা হলে।
আচ্ছা মজা হবে রে,
তাড়াতাড়ি চলো রে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান

রায়হান ইসহাক আহমদ, ২৪৩১
একাদশ শ্রেণী (মানবিক)

জ্ঞান আহরণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে ফরজ। ইসলাম জ্ঞানীর ভিন্নতর মর্যাদা দিয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "জ্ঞানী ও মুর্খ কি সমান হতে পারে?" অর্থাৎ উভয়ের মর্যাদা কি সমান হতে পারে। ইসলামে জ্ঞান সাধনার এই অনুপ্রেরণাই জ্ঞান আহরণে মুসলিম সমাজকে অগ্রণী করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম অগ্রযাত্রাকেই ইউরোপীয়নরা অনুসরণ করে। আরবী সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যের শিক্ষাগারগুলোতে পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত শুধু আরবদের বই পড়ানো হতো। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রে মুসলমানরা যে অমর অবদান রেখেছেন, তা অনস্বীকার্য।

এলমে কিমিয়া-Chemistry বা রসায়নবিদ্যা একমাত্র আরবদের আবিষ্কার। Mr. Humbal বলেন, "আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র মুসলমানদের আবিষ্কার।" শেখ আবু আলী সিনা, মোয়াল্লেমে সানী, আবু নসর ফারাবী এরা ছিলেন রসায়ন শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত। জাবির ইবনে হাইয়ানকে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জনক বলা হয়।

এলমে নাবাতায়াত Botany বা উদ্ভিদবিজ্ঞান আরবদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়। এই শাস্ত্রে ইবনে-বতহর, জিয়াউদ্দিন ইবনে বিতা প্রভৃতি পণ্ডিতের নাম সমুজ্জ্বল। ইবনে বতহর বিভিন্ন দেশ পর্যটন করে নতুন মতন উদ্ভিদ ও তাঁর গুণাবলী আবিষ্কার করেন। তিনি তৈষজ্য ও ঔষুধি সম্বন্ধে এক বিরাট গ্রন্থের প্রণেতা।

ফন্নেতিব Medicine বা চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানরা উৎকর্ষ সাধন করেছিল। আলী আত তাবারী খলিফা মুতাওয়াক্কিলের পৃষ্ঠপোষকতায় "ফিরদৌসুল হিকমা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আল্লামা রাযী মুসলিম জাহান তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসক। তিনি বিশ্ববিখ্যাত বাগদাদ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎক ছিলেন। তিনি প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেন, আর তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম "আল হাবী"। এই বই বিশখণ্ডে লিখিত। তিনি "আল আব্বাস আল কিতাবুল মালেকী" নামে চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর এক বিশ্বকোষ রচনা করেন। এই বিশ্বকোষ ল্যাটিন জগতে আজও Liber Regias নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হিসাবে ইবনে সীনার খ্যাতিও কম ছিল না। তাঁর রচিত "Qanun" গ্রন্থকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলা হয়।

এলমে নজুম Astrology বা জ্যোতিষশাস্ত্রে মুসলমান মনীষীগণ অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছিল। মুসলমান বিজ্ঞানিগণ সর্বপ্রথম ইউরোপে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় মানমন্দির স্থাপন করেন। আব্বাসীয় বংশের খলিফা মামুনের রাজত্বকালে ইবনে মলক মর ওরাজ "আন্তারলার"

বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। জ্যোতিষবিদ হিসাবে আল বাত্তানী, আল আব্বাস ফারগানী আর নাসিরউদ্দীনের নাম জ্যোতিষশাস্ত্রে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এলমে জবর ও মোকাবেলা বা বীজগণিত আরবরাই প্রথম প্রচলন করে। অংকশাস্ত্রেও তাঁদের অবদান অতুলনীয়। তাঁরাই সর্বপ্রথম শূন্যের সংকেত (Cipher) ব্যবহার আবিষ্কার করেন। মুহম্মদ-বিন মুসা আল খাওয়ারাজমি, আবুল কাশেম আহমদ প্রভৃতি অনেকেই এই শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি করেন।

এলমে জাগ্রাফিয়া বা ভূগোলশাস্ত্রেও মুসলমানদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। মুসলমান বিজ্ঞানিগণ গবষেণা করে ভৌগলিক সীমারেখা, আয়তন, চন্দ্রগ্রহণ, আহ্নিকগতি বার্ষিকগতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। ভূগোল শাস্ত্রে ইবনে খুরদাদবিহ আল ইয়াকুবী, আল-মাকসেদী ও আল বেরুনীর নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক সোডিলো (Sedilliot) ভৌগোলিক পণ্ডিত আবুল হাসান আলী মারকাশা সম্বন্ধে বলেন, "আবুল হাসানের ভূগোল আরবদের অসাধারণ প্রতিভার স্মৃতিচিত্তের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।"

দর্শনশাস্ত্রেও মুসলমানরা নেতৃত্ব দিয়েছিল। আল কোরআনের দার্শনিক তত্ত্বই মুসলিম জ্ঞানীদেরকে দিয়েছিল এক বিস্ময়কর প্রেরণা। তাই দর্শনশাস্ত্রবিদদের ইতিহাসে আল কিন্দি, আল ফারাবী, ইবনে সীনা আর ইমাম গাজ্জালীর নাম সমুজ্জল হয়ে রয়েছে।

এছাড়াও খনিজবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, জরিপবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, সংগীতশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্র আজও মুসলিম প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে। এককালে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। দুঃখের বিষয়, তাদেরই বংশধররা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার পথ ত্যাগ করে ভোগ-বিলাস আত্মকলহ ও বিভিন্নপথ অনুসরণ করছে আর তারই ফলশ্রুতিতে আজ তারা সবচেয়ে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত জাতি হিসেবে পরিচিত। আজ সময় এসেছে আত্ম-সচেতনার। তাই, অতীতের মুসলিম জ্ঞান সাধনার প্রেরণা আমাদেরকে নতুন চেতনার পথ প্রদর্শন করবে।

●

'মদ বহুরকম গুণাহের বাহক, নারী শয়তানের ফাঁদ, দুনিয়ার লালসা সমস্ত অনাচারের মূল'।

— আল-হাদীস

একুশে ফেব্রুয়ারী

কাজী খালেদ, ২৭১৬
পঞ্চম শ্রেণী 'খ'

সেই এক আশ্চর্যের লড়াই হয়েছিল
১৯৫২ এর একুশে ফেব্রুয়ারীতে
মাতৃভাষার প্রতি অসীম ভালবাসা
আর অকৃত্রিম দরদ একদিকে।
দোকানি সেদিন দোকান খুলেনি,
বাসের চাকা রাস্তায় ঘুরেনি,
বই হাতে বালক স্কুলে যায়নি,
তাদের হাত সেদিন শুধু বজ্রমুষ্টি।
সকলে সকলকে বলতে চাই,
এ যুদ্ধে আছি আমিও ভাই
এককালে দুনিয়ার সব হবে না ছাই
যদি সত্য ও ন্যায়ের জন্যে প্রাণ দিতে পার"।
সেই ফেব্রুয়ারীতে হয়েছিল শহীদ,
সালাম বরকত ও রফিক
দিয়েছিল প্রাণ রাখতে ভাষার মান
করেনি কখনও পরোয়া।
আজি তাই জমায়েত হই
একই সাথে এই প্রাঙ্গণে,
রেখে আসি ফুল শহীদ মিনারে
সালাম, বরকত ও শহীদদের স্মরণে।

'ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত'।

—আল-হাদীস

জানা অজানা

ফয়সল-বিন-আহমেদ, ৩১০৮
নবম শ্রেণী (বিজ্ঞান)

বিশ্বে দ্রুততম গাড়ী

বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী গাড়ীর নাম "দি ব্লু ফ্লেম" বা নীল অগ্নিশিখা। এটি দেখতে অনেকটা রকেটের মত। এর মোট চাকা চারটি। এটির গতিবেগ ঘন্টায় ৬৩২ মাইল। কখনও কখনও এর গতি ঘন্টায় ৬৫০ মাইলও হয়। এই দ্রুততম গাড়ীর চালকের নাম গ্রে গ্যাবেলিস্।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম বেহালা

পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বেহালা মাপ সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। অর্থাৎ, বেহালাটি হাতের তালুর চেয়েও ছোট। ঐ বেহালা তৈরি করেছেন লণ্ডনের টি বি পোলার্ড।

পৃথিবীর বৃহত্তম পাঠাগার

মার্কিন কংগ্রেসের পাঠাগার হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম পাঠাগার। প্রতি বছর এই ভবনটিতে দশ লক্ষ জ্ঞান-পিপাসুর আগমন হয়।

মঙ্গল গ্রহের পর্বত এভারেস্টের তিনগুণ উঁচু

মঙ্গলপৃষ্ঠে উপনীত দুটি ভাইকিং নভোযান কর্তৃক প্রেরিত আলোকচিত্রে মঙ্গলপৃষ্ঠে বিশালাকার পর্বত, অবিশ্বাস্য রকম বিরাট জ্বালামুখ, উল্কাপিণ্ডের আঘাতে সৃষ্ট বিরাট গর্ত এবং তাপ বৃদ্ধির মুহূর্তে জ্বালামুখের পানির বাষ্পীয়ভবনের দৃশ্য ধরা পড়েছে। মঙ্গলের আগ্নেয় পর্বত "অলিম্পাস মনস্" এভারেস্ট শৃঙ্গের চেয়েও দৈর্ঘ্যে তিনগুণ বড়।

কৃত্রিম রক্ত উদ্ভাবিত

সোভিয়েত ইউনিয়নের রক্তবিদ্যা ও রক্ত সঞ্চালন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনস্থ কৃত্রিম রক্ত গবেষণাগারের বিশেষজ্ঞরা "পারফ্লু ও বুটিলামিন" নামে এক ধরনের নতুন কৃত্রিম রক্ত উদ্ভাবন করেছেন। রক্তের বিকল্প হিসেবে তাঁরা বিভিন্ন ফ্লুওরিন জৈব মিশ্রণ ব্যবহার করেন। কেননা, ফ্লুওরিন কার্বনের রয়েছে চমৎকার কিছু বৈশিষ্ট্য ঃ এগুলি জীবতাত্ত্বিক দিক থেকে নিষ্ক্রিয় এবং সেজন্য ক্ষতিকর নয়। তাছাড়া অক্সিজেনসহ বিভিন্ন গ্যাসকে চমৎকারভাবে দ্রবীভূত করে।

দুধ থেকে মাংস

জাপানের একদল গবেষক দুধ থেকে মাংস তৈরির এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। কিয়োটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিভাগের অধ্যাপক মাসাও কাকামোয়ি জানান, তাঁর দল দুধের প্রধান প্রোটিন উপাদান 'কেদিন' থেকে 'দুগ্ধজাত মাংস' উপাদান তৈরিতে সফল হয়েছেন। সয়াবিন থেকে তৈরি কৃত্রিম মাংসের তুলনায় এটা অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়সাপেক্ষ। 'দুগ্ধজাত মাংস' সয়াবিন-মাংসের চেয়ে অধিকতর পুষ্টিকরও বটে।

নাবিক ছাড়া জাহাজ চলে

নাবিক ছাড়াই জাহাজ গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ভোদিয়ানিতস্কি একটি জাহাজের সঙ্গে অন্য জাহাজের ধাক্কা এড়াবার জন্য তার দিক ও গতি পরিবর্তন করাতে পেরেছেন। চীফ মেট আন্দ্রেই লিওলেনকো তাই এই প্রথমবারের মত জাহাজের নিয়ন্ত্রণভার জাহাজে রক্ষিত একটি কম্পিউটরের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। প্রফেসর ভোদিয়ানিতস্কি একটি স্বয়ংক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছেন। কম্পিউটর চালিত এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বহু ক্রুর দায়িত্ব একাই পালন করতে পারে। এই প্রক্রিয়া বর্তমান ব্রিজ নামক ব্যবস্থারই একটি উন্নত সংস্করণ।

যান্ত্রিক রন্ধনশালা

১৯৭৫ সালে পশ্চিম জার্মানিতে এক অভিনব যান্ত্রিক রন্ধনশালা তৈরি করা হয়েছে। কলোনে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ আন্তর্জাতিক আসবাবপত্রের মেলায় এটি হয়েছিল প্রধান আকর্ষণ। কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক বোতাম টিপলেই রন্ধনশালার যে কোন কাজ করা সম্ভব। এমনকি বাসনপত্র ধোয়ার স্থানটিও সহজে গৃহিণীর হাতের কাছে চলে আসে।

বৃহত্তম বেহালা

মানুষ তার প্রয়োজনে ও সখ অনুযায়ী ছোট-বড় নানা ধরনের বেহালা তৈরি করেছে। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত বেহালা তৈরি হয়েছে তার মধ্যে বৃহত্তম বেহালাটি তৈরি করেন শিকাগোর হারমোনি কোম্পানি। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে এটা তৈরি হয়। এই বেহালাটি ৮ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা এবং এর ওজন হলো এক মণ। এত বড় এবং উচ্চশব্দসম্পন্ন বেহালা পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত আর কেউ তৈরি করতে পারেননি।

পাখাহীন পাখি

পৃথিবীতে পাখাহীন পাখিও এক সময় ছিল। সে বহুকাল আগের কথা। এরকম একটি পাখির নাম হাতি পাখি বা রক পাখি। নিউজিল্যাণ্ডে এই পাখির নাম মোয়া পাখি। এর আদি নিবাস ভারত মহাসাগরের মাদাগাস্কার দ্বীপে। মোয়া পাখির উচ্চতা ৯ থেকে ১০ ফুট। ওজন প্রায় ১০০০ পাউণ্ড। এর ডিমও সেরকম বড়। এর নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ডিমটির পরিধি ৩৩½ ইঞ্চি। এর ভিতরে সাড়ে নয় সের পানি ধরে। উট পাখির ডিমের চেয়ে সাতগুণ বড় এ ডিম। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোয়া পাখির অস্তিত্ব ছিল। নিউজিল্যাণ্ডের মোয়া পাখিগুলির উচ্চতা ছিল ১৩ ফুট ও ওজন ৪৫০০ পাউণ্ড। বিশালতার দিক থেকে এই পাখিকে জিরাফের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

বন্ধু কমল

দাউদ আমান, ২৩৮০
পঞ্চম শ্রেণী 'ক'

কমল তুমি চলে গেলে
আমাদের ফেলে,
রেখে গেলে একরাশ
ভালবাসা ঢেলে।
বলে গেলে দেশকে
ভালভাবে গড়তে,
দেশের মান রক্ষায়
প্রস্তুত থাকতে।
শিখিয়ে দিলে তুমি
সেই সব কথা,
শহীদের রক্তবিন্দু
যায়নাকো বৃথা।
তোমার এই বাণী মোরা
যাবো না কো ভুলে,
দেশকে গড়বো মোরা
ছোট বড় ভুলে।
তুমি ছিলে এতদিন
সকলের মাঝে।
তোমাকে মনে পড়ে
সকাল সন্ধ্যা-সাঁঝে।
তোমাকে জানাই মোরা
মোদের ভালবাসা
শপথ নিলাম; সফল হবে,
তোমার সকল আশা।

সকাল বেলা

রাশেদুল আলম, ২৭৪৬
পঞ্চম শ্রেণী 'ক'

পাল তুলেছে মাঝি ভায়া,
জাল ফেলেছে জেলে।
ফুলের উপর প্রজাপতি
রঙীন পাখা মেলে।

দুলাভাই

শহিদুল ইসলাম, ২৮৭৯
চতুর্থ শ্রেণী 'ক'

আছে এক দুলাভাই,
লেপে তাঁর তুলা নাই।
আছে তাঁর সাইকেল,
নাই সিট নাই বেল।
যদিও সে বক্তা,
খাটে নাই তক্তা।
মুখে তাঁর দাড়ি যা,
দেখেশুনে বাড়ী যা।

অমর একুশে ঃ একটি সমীক্ষা

এস. বি. এম. রশিদুননবী, ২৯১২
দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বকীয়তা আছে, একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, একটা বিশিষ্টতা আছে। মাতৃভাষায় কথা বলার ইচ্ছা মানুষের এক সহজাত বৈশিষ্ট্য, একটা চিরাচরিত প্রবৃত্তি। বাঙলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের প্রাণপ্রিয় ভাষা। কিন্তু বছর ত্রিশেক আগেও আমরা এই সর্বৈব সত্য কথাটা মুখ ফুটে বলার অধিকার থেকেও ছিলাম বঞ্চিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকাসত্ত্বেও তদানীন্তন পাকিস্তানের বুর্জুয়া শাসকগোষ্ঠী আমাদেরকে সেই অধিকার থেকে করেছিল বঞ্চিত। আর শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রভাষারূপে তারা উর্দুকে দিতে চেয়েছিল স্থান। কিন্তু বাঙলার স্বাধীনচেতা মানুষগুলো তাদের সেই অপচেষ্টাকে বুকের রক্ত দিয়ে হলেও দমিয়ে দিয়েছিল; বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করাতে বাধ্য করেছিল। ভাষার ইতিহাসে দেখা যায় পৃথিবীর যতগুলো ভাষা আছে সেগুলোর মধ্যে শুধু বাঙলা ভাষার জন্যই রক্ত দিতে হয়েছে। আর সেই রক্তঝরার দিনটি ছিল মূলতঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী—অমর একুশে। অমর একুশে তাইতো এক তাৎপর্যময় মহাবিপ্লবঘন দিবস; শপথ-সমুজ্জ্বল এক দীপ্ত দিবস।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। দিনটি প্রত্যেকটা বাঙ্গালীর স্মৃতির রেখায় অমর হয়ে থাকারই একটা দিন। এটা সেই দিন যেদিন গোটা পাক-ভারত মূলঃ দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে দু'টি অংশ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—একটা ভারত ও অপরটা পাকিস্তান। দিনটি ভিন্নতর দৃষ্টির অভিক্ষেপেও ছিল তাৎপর্যঘন। কেননা এই দিনটিতেই নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান "মুসলিম লীগ" কর্মীদের একটা প্রগতিশীল অংশ "গণ আজাদী লীগ" সংগঠনের ম্যানিফেস্টোর মাধ্যমে একটি পরম ও চরম সত্য কথা উচ্চারণ করেছিলেন ঃ "সত্যিকারের পাকিস্তান অর্থে আমরা বুঝি—জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি; তাই আমাদের প্রথম কর্তব্য এই নবীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে গঠিত করা, এবং মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী আনয়ন করা।"

এতে বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের স্বাধীনতা দু'টি পৃথক ভাবধারায় সম্পৃক্ত। সত্যিকার অর্থে শোষণমুক্ত জীবন-ব্যবস্থা জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করাই যে এ কথার তাৎপর্য তা বোধ হয় সবারই বুঝার কথা। এই গণ আজাদী লীগই পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক চিন্তায় ১৯৪৭ সালেই উদ্যোগ নিয়েছিল ঃ "মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে।" "বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা, এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তার সঙ্গে কার্যকরও করতে হবে"

"বাঙলা হবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" কিন্তু এ চিন্তাকে তদানীন্তন পাকিস্তানের তথাকথিত শাসকগোষ্ঠী অনুর্বর মস্তিষ্কে অপচিন্তা বলে উড়িতে দিয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম রেনেসাঁ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজে লাগানই ছিল সেদিনের উঠতি পাকিস্তানের পুঁজিপতি গোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনা-ধ্যান-ধারণা। আর তাদেরই প্রভাবে প্রভান্বিত সেদিনের মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে বড় বেশী নিষ্ঠুর ধারণা করে বসেছিল।

প্রত্যেক দেশ ও জাতির জীবন চেতনাকে ধারণ করে দেশজ সংস্কৃতি। আবার সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে বহন করে ভাষা। জনপদে উচ্চারিত ভ্রংশ ও অপভ্রংশ লালিত্যপূর্ণ শব্দ-সম্ভারও অনেকাংশে সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অঙ্গ-বিশেষ। অতি-প্রাচীন থেকেই নদী-বিধৌত বাঙলাভূমিতে মানুষ একটা উদার জীবনবোধে ভাস্বর ছিল। সেই জীবন-বোধেরই বিকাশ ঘটেছিল বাঙলা ভাষাভাষী মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও কার্যক্রমে। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য-বাদের বিরুদ্ধে যখন বাঙলার গণমানস উচ্চকিত হয়েছিল তখন তাই আমরা বিস্মিত হইনি। বরং সত্যের প্রতি বাঙালীর সহজাত প্রবৃত্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। প্রাচীনতম বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের নমুনা "চর্যাপদে" চর্যাকারগণের যে মানসভঙ্গী বা জীবনবোধ উপস্থাপিত তাকে কোনক্রমেই স্ট্যাটিক ভাবা যায় না। কেননা সেখানে আদর্শ ও গণচেতনার সমন্বয়ের প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। কাজেই বাঙলা ভাষার ঐতিহ্য হলো গিয়ে বাঙলাভূমির মানুষের স্বাধীনতাস্পৃহা ও সত্যের প্রতি প্রবল অনুরক্তি। বাঙলার সমাজজীবনে এরই ছাপ অংকিত ছিল, অংকিত আছে এবং থাকবে। ভাষা তথা বাঙলা ভাষা এই ঐতিহ্যকে বহন করে এনেছে। মাতৃভাষা সেই জন্যই তো প্রিয়। একটি অখণ্ড জাতীয় ভাবনা, চিন্তা ও ঐশ্বর্য গতিময় করে তোলে। ভাষাহীন জাতি তাই নিম্নস্তরের জীব-মাত্র।

মানুষ স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয়। এ স্বাধীনতা বলতে শুধুমাত্র দেশের স্বাধীনতাকে বুঝায় না। এ স্বাধীনতা হবে তার ব্যক্তিগত, সামাজিক নির্বিশেষে জনগণের স্বাধীনতা, এ স্বাধীনতা হবে তার মানসিক, অর্থনৈতিক তথা সর্বস্তরের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা প্রিয়তার কারণই বাঙ্লার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের গোলামীকে দৃঢ়হস্তে রুখ্তে এগিয়ে এসেছিল।

পাকিস্তানের প্রথম অবস্থাতেই যে চক্রান্ত কুটিল হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা হলো পূর্ব পাকিস্তানকে দাবিয়ে রেখে তাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নাগপাশে বেঁধে নিজেদের স্বার্থকে কায়েম করা। তারা ঠিকই বুঝেছিল যে তাদের এ কদর্য অভিলাষকে চরিতার্থ করতে হলে প্রথমেই পূর্ব পাকিস্তানের অখণ্ড জাতীয়বোধকে এবং কৃষ্টিকে ও সংস্কৃতিকে অবলুপ্ত করতে হবে। কিন্তু একদিনে তা তো সম্ভব নয়। তাই তারা যুক্তির মাথা মাড়িয়ে ঠিক করলো যে ধীরে ধীরে একে এক অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিতে হবে। তাই ধর্মীয় ভাবধারায় জটিলতা ও কুটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনমনে এক বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় মেতে উঠলো পাকিস্তানী শাসক ও শোষকবর্গ এবং এপথে প্রথম আঘাত এলো ভাষার উপর। স্থির করা হলো উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে হবে যদিও পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙ্লাতেই কথা বলতো। আরবী হরফে বাঙলা প্রচলনের অভিলাষ ব্যক্ত করে পাকিস্তানী প্রভুরা ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির প্রয়াসী হলো। এটি ছিল যেন দেশ ও জাতির এক অগ্নি পরীক্ষা, এক যুগ সন্ধিক্ষণ। বাঙ্লার পণ্ডিতবর্গ এর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন, প্রগতিবাদী যুবসমাজ ও চিন্তাবিদগণ এরই মাঝে স্বাধীনতা হরনের অপচেষ্টার ঘৃণ্য চক্রান্তের সন্ধান

পেলেন, তাই গর্জে উঠলেন তারা। তাদের সংগ্রাম হলো শুরু। দেশ, জাতি, সমাজ ও বাঙলার চিরায়ত কৃষ্টি-কালচার রক্ষা করতে দীপ্ততেজে এগিয়ে এলেন বাঙলার, কবি, সাহিত্যিক, ছাত্র, যুবক, কৃষক ও শ্রমিক। সঙ্গে সঙ্গে কুচক্রী শাসকগোষ্ঠীও ছদ্ম-আবরণে কাজে নেমে এলেন, শুরু হলো টালবাহনা তথা স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রাম।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। ডঃ শহীদুল্লাহ এর প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন লেখক-সাহিত্যিকবৃন্দও। এই সময়েই করাচীতে শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান হতে সে সম্মেলনে যোগদান করেছিল তৎকালীন প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার এবং আবদুল হামিদ। কিন্তু বাঙলার ছাত্র সমাজ তো এত বড় অন্যায় চোখ বুঁজে সহ্য করতে পারে না। এলো '৪৭-এর ৬ই ডিসেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় "ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন" প্রাঙ্গণে করাচীর শিক্ষা সম্মেলনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে জোরালো এ প্রতিবাদ জানায় এবং শহরে মিছিলও বেরিয়ে পড়ে। সে মিছিলে পুলিশী হামলাও হয়েছিল।

এর কিছুদিন বাদে '৪৮ এর কার্জন হলের কনভোকেশন সভায় পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ উর্দুর পক্ষে জোরালো যুক্তি দিতে যেয়ে লাখো কণ্ঠের প্রতিবাদ ধ্বনিতে স্তব্ধ হয়ে ফিরে যান। সময়ের রথে চড়ে আরও কয়েকটা বছর উৎরে যায়। ক্যালেণ্ডারের পতায় '৫২ এর ২৬শে জানুয়ারী এসে হাজির হয়। সেদিনেও খাজা নাজিমুদ্দীন পল্টনের জনসভায় জিন্নাহ সাহেবের উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করে যান। এর প্রতিবাদে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি" বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বান করে। শুরু হলো ভাষার দাবীতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাবেশ ও মিছিল। ইতিমধ্যে শহরে ১৪৪ ধারা ঘোষণা করা হয়েছে। ২০শে ফেব্রুয়ারীতে নবাবপুরে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এলো সেই রক্তঝরা দিনটি। কারফিউ ভঙ্গ করে লাখো কণ্ঠের আওয়াজ ওঠে "রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই"। কিন্তু সহসা নুরুল আমিন সরকারের পুলিশ বাহিনীর নির্মম বুলেটের আঘাতে ধরাশায়ী হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার আরো নাম না জানা শত শত ফুলের মতো কাঁচা কচি প্রাণ। ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার রাজপথ রক্তের বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল। শুরু হলো সারা দেশব্যাপী ভাষা আন্দোলন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। অবশেষে কুচক্রী শাসকগোষ্ঠী ভাষার দাবী মেনে নিল বটে, তবে কার্যতঃ তার কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেয়া হলো না।

ভাষা আন্দোলনের দৃঢ়তা যুব সমাজের শক্তির পুনঃবিকাশ ছিল। এরই পথ ধরে শুরু হলো সত্যিকার অর্থে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও মুক্তির পথে উত্তরণ। বায়ান্নর রক্ত পথ বেয়ে কতগুলো সংগ্রামমুখর বছর কেটে গেল। অবশেষে বহু সংগ্রামের পর, বহু বিদ্রোহের পর, আরো অসংখ্য শহীদি রক্তের মধ্য দিয়ে '৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বরে এলো বাঙলার স্বাধীনতা, হলো বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠা। শত শত বছরের গোলামীর জিঞ্জির ছিড়ে রক্তের নদী বেয়ে বীর ও স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙলাদেশীর আত্মপ্রকাশ ঘটলো। ঘৃণ্য কুচক্রী পাক সরকার এদেশ থেকে মার খাওয়া কুকুরের মতই লেজ গুটিয়ে সরে গেল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকার একুশে ফেব্রুয়ারীকে জাতীয় শোক দিবসরূপে ঘোষণা করেছেন। এ দিনে এদেশবাসীর ঘরে ঘরে শোকের নিবিড়তর ছায়া নামে। শহীদ মিনারের বেদীতলে বাঙালীর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা সঞ্চিত হয়। লাখো শহীদ আত্মার মঙ্গলাশীষ অর্পিত হয়। নানাবিধ অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমে দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে থাকে।

কিন্তু এত রক্ত এত সংগ্রামের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত আমাদের বাঙলা ভাষা কি আজও শিক্ষার সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে? আজও কি শহীদের রক্তের প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছে? উত্তরটা নিশ্চয়ই নেতিবাচক হবে। কিন্তু এটাই কি ছিল অমর একুশের রক্তঝরা তাৎপর্য? একুশে ফেব্রুয়ারী প্রতি বছরই একবার আসে। সে দিনটিতে শহীদি রক্তে গড়া শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে কত শপথই না আমরা করি! এতে করে কি শহীদি আত্মার সত্যিকার মূল্য আমরা দিচ্ছি?—মোটেই না। আজ আর পশ্চিমা শোষক প্রভুরা নেই, নেই তাদের কুচক্রী ষড়যন্ত্র, কিন্তু তাদেরই ছদ্মবেশে জুলুমবাজ অন্যায়কারী, বিশ্বাস ঘাতকের দল বাঙলার স্বাধীনতা—সার্বভৌমত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে উন্মুখ। দেশ থেকে, জাতি থেকে, সমাজ থেকে এইসব অন্যায়কারীকে কঠোর হস্তে করতে হবে উৎখাত, আর গড়তে হবে সত্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা মন্দির। তবেই, হ্যাঁ কেবলমাত্র তবেই বায়ান্নর শহীদি আত্মারা শান্তি পাবে এবং তখনই আমরা তাঁদের এই আত্মত্যাগকে মর্যাদাদান করতে পারবো।

●

'স্ত্রীর পক্ষে ভাল ব্যক্তি প্রকৃত ভাল মানুষ'।

—আল-হাদীস

পেটুক মশাই

ইসতিয়াক রেজা, ২৮৬১
চতুর্থ শ্রেণী 'খ'

হাবু নাকি পেটুক মশাই
বলছে হাবুর নানী,
তাই তো হাবু খায় না আর
পোলাও বিরিয়ানী।

পান্তাভাত আর কাঁচা মরিচ
যখন যা পায় খায়
এক নিমিষে সবকিছু সে
শেষ করতে চায়।

স্বপ্ন

সাঈদউদ্দিন হেলাল, ২৯৬৬
প্রথম শ্রেণী

অনেক বড় হব আমি
লেখাপড়া শিখে,
তারপরেতে যাব আমি
নীহারিকার দিকে।
সেথায় গিয়ে করব আমি
হরেক রকম কাজ,
কাজের শেষে আসতে ফিরে,
থাকবে নাকো লাজ।

সেই ছেলেটা

জি, কে, এন, মোর্শেদ, ২৩৭১
পঞ্চম শ্রেণী 'খ'

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে হেঁটে
একটা ছোট ছেলে
পরনে তার ছেঁড়া কাপড়
হাতটা রাখা মেলে।
বাড়ীতে তার মায়ের অসুখ
সঙ্গে ছোট ভাই,
মায়ের জন্য ঔষধ চাই
হাত পেতেছে তাই।

অনেক ঘুরে সেই ছেলেটা
পেল কয়েক আনা,
তাই দিয়ে কিনলো কিছু
মায়ের জন্য খানা।
খাবার নিয়ে ফিরলো যখন
সারাটা দিন পরে,
দেখলো এসে কষ্ট পেয়ে
মা গিয়েছে মরে।

অবিস্মরণীয় যে স্মৃতি

এম. এ. সেলীম মিয়া, ২৭৭১
একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

বর্ষণ মুখর দিনে যখন ঝম্ ঝম্ বারিপাতের একটানা শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'রে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশকে আন্দোলিত করে অথবা নির্জন মধ্যাহ্নে যখন পাখ্-পাখালীর কুহুতান খুব একটা বেশী শোনা যায় না তখন আমার মানস পটে সিনেমার পর্দার ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে একটা স্মৃতি--তাঁবু বাসের স্মৃতি। ঐতিহ্যবাহী রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলের ছাত্র, যারা অন্ততঃ একবারও তাঁবু বাসে গিয়েছে তারা এ স্মৃতি সহজে ভোলে না। যখন কর্মমুখর দিনে পড়াশুনো নিয়ে আমরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি, যখন কঠিন ও রূঢ় বাস্তবতার সংস্পর্শে এসে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি তখন তাঁবু বাসের সুমধুর ও অবিস্মরণীয় স্মৃতি আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দান করে, আমাদেরকে শক্তি, সাহস ও বল জোগায়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ সাল। বিদ্যানিকেতনের একাদশতম তাঁবুবাস উদ্ যাপন উপলক্ষে সকাল ১১ টায় অতিরিক্ত দু'টি বাসসহ স্কুলের বাসে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের সাথে ছিলেন ভাইস্ প্রিন্সিপালসহ আরও বেশ কয়েকজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক।

প্রতিবারের মতো এবারও প্রতিটি ক্লাশ দু'টি গ্রুপে বিভক্ত ছিল। 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা।' বহু বৈচিত্রময়ী স্বাদ, গন্ধ ও রং সমাহারে সজ্জিত--সৌন্দর্যের রাণী, জীবননান্দ দাসের রূপসী বাংলা, কবি গুরুর সোনার বাংলা আমাদের এই বাংলাদেশ। আমাদের গ্রুপ সমূহের নামকরণ করা হয়েছিল বিভিন্ন ফুলের নামে; যেমন--ডালিয়া, জবা, শিউলী, গোলাপ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাওয়ালের শাপলায় পৌঁছার সাথে সাথেই হৈ-হুল্লোড় বেশী করে শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ বুঝাতেই পারছেন খাঁচার পাখি সহসা মুক্তি লাভ ক'রে যেমন ব্যোম-বাতাসকে মুখরিত করে, উল্লসিত করে প্রকৃতিকে, নদীর কুল কুল ধ্বনিকে স্তব্ধ করে দেয় তেমনি রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের চারি দেয়ালের অন্তরালে যে হৃদয় মুক্তির আশায় আকুলি-বিকুলি করে গুমরে কাঁদছিল, যাদের শব্দহীন মহা আর্তনাদে আরশকুরসী থর থর করে কেঁপে উঠছিল, কচি ও সবুজ সে হৃদয় সহসা একদা নিজেকে মুক্ত পরিবেশে পেয়ে মহানগরীর লক্ষ-লক্ষ মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বরকে ম্লান ক'রে দেয়, মোটর বাসের যান্ত্রিক ও দানবীয় শব্দকে অসম্ভবরকম নীচু স্বরে প্রবাহিত করে দেয়। স্কুলের সবুজ চত্বর অতিক্রম করে যখন বাস মীরপুর রোডে পড়ল তখন "গাওছেল আজম--হহা" ইয়েলের মাধ্যমে কচি-কাঁচা ও তরুণ-সবুজেরা স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাদের হৃদয়ের স্বতস্ফুর্ত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল।

কিছু স্বেচ্ছাসেবী ছাত্র পূর্বাহ্নেই তাঁবুগুলো বাসোপযোগী করেছিল, আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব নিম্নখাতে প্রবাহিত করতে করতে (যদিও তা বহুদূর থেকেই শোনা যাচ্ছিল) নির্দিষ্ট তাঁবুতে গিয়ে উঠলাম। দুপুর ২ টায় ডি.পি. জনাব শাহ মুহঃ জহরুল হক ১১তম তাঁবুবাসের শুভ উদ্বোধন করলেন। মুক্ত পরিবেশে কচি-কাঁচার কিচির-মিচিরে ডি. পি. সাহেবের অধিকাংশ উপদেশবাণীই কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে শূন্যে ইথার তরঙ্গ হয়ে ভাসতে ভাসতে চলে গেল।

পরের দিন ৫ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার। তাঁবুবাসের সময় স্কুলের কঠিন লৌহশিকল আমাদের পায়ে পরানো না থাকলেও আমাদেরকে শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। কাক ডাকা ভোরে উঠে আমাদেরকে ফিজিক্যাল ট্রেনিং করতে হয়। সত্যিই, সূর্য উঠবার আগে বনদেবতার যে সৌন্দর্যদর্শন করা যায় তার উপমা জগতে বিরল। বিরল বিভাসিত এই সৌন্দর্যে মন ও প্রাণ যখন আনন্দের উদ্বেল কলতানে উচ্ছ্বাসিত হয়ে তখনই পিককুলের শব্দে মুখর হয়ে, পূর্বাসা দ্বার রক্তে রঞ্জিত করে গাছ গাছালীর মধ্যদিয়ে উঁকি মারে রবি মামা।

জুলোজীর লেকচারার জনাব নুরুল ইসলামের সাথে আমরা অর্থাৎ ডালিয়া গ্রুপের ছেলেরা 'স্পেসিমেন কালেকশনে' বনবাঁদাড় ঘুরলাম। হাজারো রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণীকে একটা ব্যাগের ভেতর ভরে নিদাঘ মধ্যাহ্নে যখন তাঁবুতে ফিরলাম তখন অন্যান্য ছাত্র ও শিক্ষক মহোদয়গণ আমাদেরকে কিছু মুচকি হাসি উপহার দিলেন।

তাঁবুবাসের তৃতীয় দিবসে আমরা জনাব গোলাম মুর্তজার সাথে পিকনিকে বের হেলাম। কিছু সহপাঠীর সাথে আমি বহুক্ষণ যাবৎ নৌকা বাইচে অংশ গ্রহণ করে পিকনিকের জায়গায় উপস্থিত হতে ভয় পাচ্ছিলাম। একেত মুর্তজা স্যারকে আযরাইলের চেয়ে কোন অংশে কম ভয় করিনা, তার উপর খাদ্য তৈরী হয়েছে কিনা জানিনা ! স্যাররা যে আমাদের বন্ধু, ত্রাস সঞ্চার-কারী নন, তা তাঁবুবাসেই প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম। খিচুড়ি ভাল না খারাপ হয়েছিল সে চিন্তা করবার অনেক পূর্বেই তারা উদরে প্রবেশ করতঃ অগ্নাশয় ও অন্ত্রের কার্যাবলী অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হলো। চায়ের রংটা কেমন হয়েছিল তা আশা করি আপনারা জানতে চাইবেন না তবে পিপাসার্ত মৃত্তিকার পিপাসা মেটাতে যে সে সাহায্য করেছিল তা বলবার অপেক্ষা রাখেনা।

"Our life is a running train"। গতিশীল এই জীবনে আসে সহস্র বাঁধা বিপত্তি; আমাদের চলমান জীবনের ছন্দময় গতিকে স্তব্ধ করে দিতে প্রতিকূল পরিবেশও বিরুদ্ধবল কম চেষ্টা করে না। 'অবস্ট্রাকল রেসে' আমরা সংগ্রামমুখর এই বাস্তব জীবনের প্রতিবিম্ব দেখি। 'অবস্ট্রাকল রেস' ও 'বিগওয়াক' এই দু'টি বিশেষ প্রতিযোগিতা ছিল তাঁবুবাসের শেষ দিন।

তাঁবুবাসের অন্যতম আকর্ষণ প্রতিরাতের 'ক্যাম্প ফায়ার'। যদি কোন বনপরী নির্জন নিশীথে বন পরিদর্শনে বেরোতেন তবে তিনি অবশ্যই এই মনোমুগ্ধকর, আকর্ষণীয় ও ছন্দময় পরিবেশকে উপেক্ষা করতে পারতেন না। মুজিবরের 'একশন রিয়্যাকশনে'র গান, হেলাল স্যারের ইংলিশ গানের কলি এখনও আমার কানে বাজছে। 'ক্যাম্প ফায়ার' ইয়েল, গান, কৌতুক, নাটিকা প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বদাই জমজমাট থাকত। সবচেয়ে বড় কথা, স্যাররাও এতে স্বতস্ফুর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করে এর আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী, বিজয়ীদেরকে পুরস্কার প্রদান ক'রে ও আমাদের মিষ্টির আবদার পূরণ করে তৎকালীন প্রিন্সিপাল জনাব কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহম্মদ তাঁবুবাসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা

করলেন। সকাল ১০টার দিকেই ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের স্মৃতি-বিজড়িত শাপলাকে 'গুড বাই' জানালাম।

কিন্তু যাবার সময়ে যে কিচির-মিচির শব্দে বাসখানা মুখরিত ছিল এমনকি তাঁবুবাসলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছিল সেই শব্দকে কে স্তব্ধ করে দিল? কার মহাসাইরেনে সব কোলাহল, সব শব্দমুখর কথা, সব সুমধুর গান থেমে গেল, নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে গেল?

ও, হ্যাঁ, ভুলেই গ্যাছি; এখন তো আমার তাঁবুবাসের সুমধুর স্মৃতিকে নাড়াচাড়া করার কথা ছিল না বরং ইয়ং এর গুনাংক বা স্যার ওয়ালটার স্কট এর সুবিখ্যাত 'Patriotism' কবিতার ভেতর ডুবে যাওয়ারই কথা ছিল। বারিপাতের সেই ঝম্‌ঝম্ শব্দ হয়তবা বহু পূর্বেই থেমে গ্যাছে কিন্তু তাঁবুবাসের স্মৃতিকে হৃদয় থেকে, অনুভূতির জগৎ থেকে, স্মৃতির পট থেকে দূর করতে পারিনি এতক্ষণেও।

ঢং ঢং বেল পড়লো; এখনই গেম্‌স্ এ যেতে হবে!

●

ঐ ব্যক্তি মোমেন নহে যাহার রুচি ও প্রবৃত্তি আমার আদর্শের অনুরাগী অনুসারী নহে'।

—আল-হাদীস

বাঁশি

মীর শফিকুল ইসলাম, ৩০১৯
দশম শ্রেণী (বিজ্ঞান)

শিমুলপুর নামে ছোট্ট একটি গ্রামে মন্টু নামে একটি ছেলে থাকত। মন্টু বড্ড গরীব ছিল। তাদের খাওয়া একদিন হত আরেকদিন হত না। তাদের সংসারে শুধু দু'জন ছিল। মা ও সে। মা-ই কোনরকমে সংসারের চাকা টানছিলেন। মন্টু তার বাবাকে দেখেছে। কিন্তু মনে নেই। মন্টুর মা বলেছিলেন মন্টুর যখন আড়াই বৎসর তখন তার বাবা নাকি ঔষধের অভাবে মারা যান। তাই তার বড় সখ ডাক্তার হবার। কিন্তু পয়সার অভাবে সে পড়তে পারছে না। মনে তার ভীষণ কষ্ট হলেও মার কথা ভেবে তাকে হাসিমুখে চলতে হয়। তার বয়স দশ পেরোতে চলল কিন্তু তবু পড়ার কোন গতি করতে পারছে না। তবে বাঁশীতে ছিল তার অসম্ভব ঝোঁক। গানের সুর বাঁশীতে উঠানোর মত পারদর্শী তার মত ঐ গ্রামে কেউ ছিল না। তাতে বিশেষ করে উচুঁ শ্রেণীর লোকেরা তাকে হিংসা করত। তার বন্ধুরাও তার এই চমৎকার বাঁশী বাজানোর জন্য হিংসার চোখে দেখত। আজকাল মন্টু বাঁশী বাজিয়ে কিছু কিছু আয় করছে। বয়সের তুলনায় খাটুনি বেশী পড়েছে। হঠাৎ করে একদিন তার জ্বর হয়ে গেল।

সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে যাবে, কিন্তু দেখল গায়ে তার অসম্ভব জ্বর। মা তাকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে গেছেন। তার মা গ্রামের মোড়লের বাড়ীতে কাজ করে সংসার চালান। তাকে বিছানায় রেখে মা কাজে বেরিয়ে গেছেন। বার বার নিষেধ করে গেছেন যেন বিছানা ছেড়ে না উঠে। শুয়ে শুয়ে ভাবছিল সে বাঁশীর কথা। যে দিন সে বাঁশীটা কিনল। তারপর কিভাবে সে বাজান শিখল। ঐ দিনগুলির কথা আজও তার চোখে সদ্য ফোটা গোলাপের মত সজীব হয়ে ভেসে উঠে।

বেলা তখন দুটো হবে। মাকে আসতে না দেখে একমনে উঠোনের উপর হাঁটু গেড়ে গুটি খেলছিল। ঠিক কিছুক্ষণ পরে মার গলার আওয়াজ পেল সে।

ঃ মন্টু, মন্টু কই গেলি রে?

ঃ এই ত--এইহানে, কি হইছে মা?

ঃ ঘরে আয়।

মন্টু ঘরে ঢুকে দেখল মা মাদুর পেতে ভাতের দুটো আধভাঙ্গা সানকি বের করলেন। এবং বড় একটা থালা থেকে ভাত ও একটা ছোট পেয়ালা থেকে তরকারী বাড়ছিলেন। তার পাশের চেয়ারে ছোট্ট একটি লাল টকটকে জামা। জামাটার রং মন্টুর চোখে বিদায় বেলার

সূর্যের মত লাগছিল। এত সুন্দর জামা আর এত খাবার মন্টু এর আগে দেখেনি। বিস্ময়ে সে ভাবল মোড়লরা কত বড় লোক।

ঃ ও মা এত ভাত পাইলি কই? এই কোর্তা তোরে কে দিল।

ঃ মোড়লের বড় পোলায় মেট্রিক পাশ করছে। তাই হেগো বাইত আইজ বহুত মেজবান খাইছে। কাম শেষে বড় মোড়লের বড় বউ আমারেও দিছে, এইড্যা তোর জন্য আনছি বাজান কি সোন্দর কোর্তা দে আমি তরে পড়াইয়া দেই।

ঃ মোড়লের বড় বউ বড় বালা না মা।

ঃ হ বাজান, তুই খাইতে ব, আমি গোছল কইরা আই।

ঃ মন্টুর মা ঘরে টাঙ্গানো একটা দড়ি থেকে একটা ছেড়া শাড়ী নিয়ে সামনের পুকুর ঘাটে গোসল করতে গেলেন। নূতন জামাটা পেয়ে মন্টুর আনন্দ আর ধরে না, সে ভাত খেয়ে ঐ জামা পরেই বেড়ার ফাঁক থেকে দাওটি নিয়ে তাদের ঘরের পিছনে ছোট বেগুন ক্ষেতে পানি দিতে গেল। ইতিমধ্যে মন্টুর মা গোসল সেরে বাইরে এসে ভাত খেয়ে এটো বাসনগুলো মেজে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। বিকেলে আবার কাজের কথা চিন্তা করে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে চেষ্টা করলেন। এদিকে মন্টু পানি দেওয়া শেষ করে ফিরোজের কাছে তার প্রিয় জামাটির গল্প করে হাত মুখ ধুয়ে বাড়ি ফিরল। এমন সময় শুনতে পেল বাঁশীর সুর। বাঁশীর সুর থেমে থেমে বেজে উঠে যেন ওকে ইশারায় ডাকছে, "বাঁশী নিবে গো বাঁশী।" মন্টুর একটা বাঁশী কিনার খুব সখ ছিল। সে মাকে বলল।

ঃ মা আমারে একডা বাঁশী কিননা দিবা?

ঃ বাঁশী? মা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ হ মা, আমার বড় সখ, দিবা?

মা এবার বিগড়ে গেলেন।

ঃ দেখ মন্টু, এত আইজরা কথা আমার বালা লাগেনা খাইতে পাছ না, বাঁশী কিনবার কা অত সখ, যা রশি ঘরে অনেকগুলি বেগুন আছে। হেগুলি লইয়া বাজারে যা।

ঃ তুমি পয়সা না দিলে আমি এইহান তন কোথাও যামু না, পড়াইতে ত পার না তয় একটা সখের জিনিসও কিননা দিবা না। আজ যদি বাজান বাইচা থাকত তয়কি আর তোমারে কইতাম—বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পরতে লাগল, এবার মন্টুর মা বিছানা ছেড়ে উঠলেন। হয়ত ছেলের কান্না দেখে ব্যথা পেয়েছেন। মন্টুকে কাছে টেনে নিলেন। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন।

ঃ ছিঃ বাজান মারে অত কষ্ট দিতে আছে। তুই দেহস না আমি কত কষ্ট কইর‍্যা পয়সা কামাই, আমার কি স্বাদ অয় না তরে পড়াইতে কিন্তু আমার অবস্থাডা একবার ভাইব্‌বা দেখ। যা বাজান জিগাইয়া আয় কত দাম মন্টু খুশী হয়ে দ্রুত বাঁশীওয়ালার কাছ থেকে এসে বলল ঃ

ঃ দেড় টাহা, তুমি আমারে পাঁচ শিকা দিলেই হইব বাকী চাইর আনা আমার লগে আছে।

ঃ বাঁশীওয়ালা এহন কোন দিকে যাইবরে?

ঃ বাজার মুহী।

ঃ তয় টাহা লাগত না। তুইও বেগুন লইয়া বাজারে যা। হেইহ্যানে বেগুন বেইচ্যা টাহা লইয়া যা।

ঃ আচ্ছা তয় এহনি যাই।

প্রায় লাফাতে লাফাতে মন্টু বেরিয়ে গেল। মন্টুর মা শুধু মন্টুর গমনের পথে তাকিয়ে রইলেন। এই ভাবেই তার বাঁশী কিনা হয়েছিল। মন্টুদের বাড়ীর পাশে একটা লোক থাকত তার নাম মজিদ মিঞা। তিনি খুব ভাল বাঁশী বাজাতে পারতেন। মন্টু বাঁশী কিনার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে পড়ে থাকত। মজিদ মিঞা যখন বাঁশীতে সুর ধরে তখন মন্টু মুগ্ধ হয়ে সে সুর শুনে। তার সে সুরে দগ্ধ প্রকৃতি যেন ক্ষণকালের জন্য থেমে গিয়ে মন্টুর পদকহীন অবস্থার প্রতি সমবেদনা জানায়। মন্টুর বাঁশী বাজানোর সখ দেখে মজিদ মিঞা তাকে শিষ্য করে নেয়। দিনরাত সুর শিখিয়ে এতটুকু বয়সেই নিজের চেয়েও বড় বাঁশীবাদক করে গড়ে তোলে। এদিকে মন্টুরও আনন্দের সীমা নেই। পড়ালেখা না পারে, বাঁশী বাজাতে পারে। ওর মত করে আর কয়জনেই বা পারে! মন্টু তখন মজিদ মিঞার দারুণ ভক্ত। মার কাছে মজিদ মিঞার কথায় খই ফোটে। মাকে না দেখিয়ে সে মধ্যে মধ্যে আচার, ডাব, নারিকেল এমনকি নিজের বাড়া ভাতও দিয়ে আসত।

একদিনের কথা বলছি, মন্টুকে ভাত বেড়ে দিয়ে ওর মা গোসল করতে গেছে। মন্টুর মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি এল। সে ঐ ভাতের সাথে আরও কিছু যোগ করে বাসার বাইরে মজিদ মিঞার বাড়ীর পথে পা দিতেই মার গলার আওয়াজ পেল।

ঃ মন্টু কই যাছ, ক্ষেতে পানি দেওন লাগব। মার এই প্রশ্নে মন্টু অপ্রস্তুত হয়ে হাতটি পিছনে লুকিয়ে ফেলে বলে।

ঃ না- - - -মা এইত এইহানে।

ঃ এইহানে কোথায়, হাতে কি?

ঃ না কিছু না।

ঃ দেখ মন্টু মার কাছে মিছা কইতে না ক বাজান কি হইছে?

শেষে ভয়ে ভয়ে মার কাছে প্রকাশ করল তার কথা শুনে মা বললেন।

ঃ এদ্দিন কস নাই কেন? ছেলের কাজে মা খুশী বুঝলেন নিজের ছেলে তার চেয়ে কম চালাক না,

ঃ তু- - - - তুমি যদি মার।

ঃ এহন কি তুই ঠিকমত বাজাইতে পারস।

ঃ হ, মা ৬ মাস যাবত শিখতাছি। আর লাগত না। আইজ মজিদ মিঞা আমার সার্টিফিকেট দিব।

ঃ তয় তুই যা।

এই ভাবেই সে বাঁশী বাজান রপ্ত করেছিল। সে গ্রামের বাজারের সাথে একটা বট গাছের নীচে বসে বাঁশীতে উদাস সুরে গান ধরত, অনেকে ভীড় জমিয়ে বাঁশী শুনত আর পয়সা দিত, এভাবেই একদিন সে একটা যাত্রা পার্টির ম্যানেজারের সাথে পরিচিত হয়ে গেল। তারপর থেকে তাদের সঙ্গে সফর সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বাঁশী বাজাত। বিভিন্ন জায়গায় বাঁশী বাজিয়ে মাসিক পেত বার টাকা। বিভিন্ন গ্রামে ঘুরলেও তার টাকা সব সময় মার

কাছে পাঠাত। এবার সে নিজের গ্রামে এসেছে। বাড়ীতে মার সাথে দেখা করে পরদিন চলে যাবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু পরদিন উঠেই দেখল গায়ে তার অসম্ভব জ্বর। হঠাৎ মার ডাকে তার চিন্তা ভাঙল।

ঃ মন্টু মন্টু দেখ বাজান ডাক্তার সাহেবেরে লইয়া আইছি। এই যে ডাক্তার সাব দেহেন আমার বাজানের কি অইছে।

ডাক্তার সাহেব বেশ কিছুক্ষণ জিহবা, হাত, বুক নাড়াচাড়া করে পরীক্ষা করলেন। তারপর দুটো ঔষধ দিলেন ছোট শিশিতে করে।

ঃ ডাক্তার সাব আপনার ফিস কত ?

ঃ চার টাকা বার আনা। মন্টুর মা তুমি মন্টুর দিকে বেশী যত্ন রাইখ। রোজ একটা করে ডিম, দুধ, ছানা বেশী কইরা খাওয়াইবা। আর মন্টু তোমারে কই কমপক্ষে ৫ দিনের আগে বিছানা ছাইরা উঠবে না।

ঃ মা আমার পকেটে ৫ টাকা আছে, তুমি ঐ টাকাটা ডাক্তার সাহেবেরে দাও।

ঃ ডাক্তার সাব আমার বাজান কি বালা হইব না, ডাক্তার সাহেবকে টাকাটা দিয়ে বলে।

ঃ চিন্তার কিছু নাই। তোমারে যা কইলাম সেগুলি ঠিকমত কইর।

পরদিন মন্টু কিছুটা সুস্থ বোধ করতে থাকে। মন্টুর মা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজে গেল। এদিকে মন্টু আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠল। কাল ফিরোজ তার বাঁশীটা নিয়ে গেছে সেটা আনতে হবে, মন্টু ভাল পথ ছেড়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে চলল কারণ ভয় ছিল ওকে কেউ দেখে ফেলতে পারে। চলার পথে বন জঙ্গলগুলি কাটতে কাটতে গেছে। একসময় সে এসে পৌঁছল।

ঃ ফিরোজ ও ফিরোজ বাড়ী আছস।

ঃ কে... ? ফিরোজের ফুফু উঠে বেড়িয়ে এলেন কিরে ?

ঃ ফিরোজ কই ফুফু ?

ঃ ফিরোজ কাইল আমার বাঁশীডা আনছিলি ?

ঃ বাঁশী লইয়াই তো ঘাটে গেছে। ও... ঐডা তোর বাঁশী।

ঃ তয় আমি ঘাটে যাই ফুফু।

কথা না বাড়িয়ে মন্টু সোজা পুকুর ঘাটে চলে এল, ঐখানে ওর মত বয়সী আরও অনেকে ছিল। ওরা সবাই একসঙ্গে পানি ছিটাছিটি করছিল আর খিলখিল করে হাসছিল। মন্টুর এই দৃশ্য বড় ভাল লাগছিল। ওরও ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের সাথে গিয়ে খেলা করে। কিন্তু গায়ের জ্বরের কথা ভেবে ইতস্তত করছিল। ওকে দেখে ফিরোজ এগিয়ে আসে।

ঃ মন্টু কখন আইলি, যাবি কবে ?

ঃ গায়ে সামান্য জ্বর আছে, কয়েকদিন পরে যামু।

ঃ তোর বাঁশী নিতে আইছস ?

ঃ হ, কইরে বাঁশীটা ? কাইল একবারও মুখে দেই নাই।

ঃ বাঁশী পরে নিস। এখন আমাগো লগে খেলবি আয়।

মন্টু হাঁ বা না কোন উত্তর দিতে পারছিল না।

কিন্তু ফিরোজ আবার নিজ থেকেই বলে অত ভাবাভাবির দরকার নেই। চল না, চল, ফিরোজের পিড়াপীড়িতে মন্টু রাজী হয়ে যায়। এক লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে। বাঁশীটা পানির উপর ফিরোজের কাছ থেকে নিয়ে বাজাতে শুরু করল। তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলল পানির খেলা, মুক্ত বিহঙ্গের মত তারা নির্দ্বিধায় পানির ক্রীড়া কৌশলে মেতে উঠল। এর পরিণতি যে কি, তা সেই মুহূর্তে কারও মনে উদয় হইল না। বিকেলের আগে মা বাড়ী ফিরে বাইরে থেকে ডাকতে শুরু করল ঃ

ঃ মন্টু---ও মন্টু, কই গেলিরে?

বলতে বলতে ঘরে ঢুকে মন্টুকে না দেখতে পেয়ে তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। ছেলেটা গেল কই--দাওয়ার উপর বসে একমনে চিন্তা করতে লাগল। এমন সময় মন্টু কাশতে কাশতে ঘরে ঢুকল। তার চোখ মুখ লাল। গায়ে অসম্ভব জ্বর। সারাদিন পানিতে ভিজে জ্বর আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। তাকে দেখেই মা দৌড়ে এল।

ঃ কিরে বাজান কই গেছিলি। তরে না ডাক্তার কইছে পাঁচদিনের আগে বিছানার থাইকা উডতে না।

ঃ না মা গিছিলাম একটু উত্তরপাড়ায় ফিরোজের কাছে বাঁশী আনতে।

ঃ তোর গা তো খুব গরম। শো বাজান বলে আলমিরার সাথে ঠেকানো মাদুরটা লইয়া নীচে বিছিয়ে দিল। বালিশের উপর মাথা লাগাইয়া তাকে শোয়াইয়া তার গায়ের উপর একটা কাঁথা জড়াইয়া দিল।

ঃ মা ডাক্তর সাবরে আর একবার ডাক না। আমার জানি কেমন লাগতাছে।

ঃ যাই বাবা।—এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মন্টুরা একসাথে বাড়ী যাবার পথে বাঁশিটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে একবারে পায়ের তলায়। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রিয় বাঁশীটা দু-টুকরো হয়ে যায়। সেই ছবি তখন আবার মন্টুর চোখে ভেসে উঠে। মন্টু ফিরোজকে এইজন্য খুব বকছিল। ডাক্তার আসল। কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে চিন্তিত মুখে বলল।

ঃ রোগীর অবস্থা বড় খারাপ।

ঃ আমার কি হইছে ডাক্তার সাব?

ঃ তেমন কিছু না, তুমি চুপ হয়ে শুয়ে থাক।

ঃ ডাক্তার সাব আপনার ফিস?

ডাক্তার চলে গেল মন্টুর জ্বর রাত্রে আরও বাড়তে থাকে। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে শুরু করে।

ঃ আমার বাঁশী ..আমার .....কই।

ঃ চুপ কর বাজান।--পাশে বসে মা তার মাথায় হাত বুলাতে আর সহস্রবার আল্লাহ্‌র কাছে বলতে থাকে

ঃ আল্লাহ্ আমার পোলারে ভাল কইরা দাও।

ঃ মাগো তুমি কই...বাবা কই...।

বলতে বলতে আস্তে আস্তে সে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। সে ঘুম থেকে তাকে আর কেউ জাগাতে পারবে না।

চাঁদের আলো, নদীর স্রোতের কুলকুল ধ্বনি, বাতাসের শব্দ যেন একাকার হয়ে বাঁশীর সুরের মত তাকে সমবেদনা জানাচ্ছে। যেমন করে মন্টু যাত্রার নাটকের কারো মৃত্যুর সময় বাঁশীর সুর তুলত ঠিক তেমন করেই আজ প্রকৃতি সবকিছু গভীর শোক প্রকাশ করছে।

তরুণ দল

মাহ্‌বুবুর রহমান, ২৬৭৭
তৃতীয় শ্রেণী 'খ'

ওরে
তরুণ দল
মানিস নাকো
বাধা ভয়
সামনে পথ
দীপ্তিময়।

শোনরে
তরুণ দল।
বুকে নিয়ে
ঈমান বল
জোর কদমে
এগিয়ে চল॥

পলাশ ফুল

এ.কে.এম.
মেহেদী মাহাবুব হাসান, ২৮২৩
দ্বিতীয় শ্রেণী

উষর মরুর বালুর মাঝে
ফুটলো পলাশ ফুল,
বিশ্ববাসী উঠলো জেগে
ভাঙ্গলো তাদের ভুল।
নতুন আলোয় জীবন পেয়ে
গাইলো পাখি গান,
বিশ্ব জুড়ে এল অঢেল
নতুন আলোর বান।
ক্রীতদাসের শিকল ভাঙ্গার
শব্দ উঠে জোরে,
নতুন আলোয় নেয়ে তারা
জাগলো নতুন ভোরে।
নিখিল ধরায় মিথ্যাবাদীর
কাঁপলো সবল ভিত,
পলাশ ফুলের ঐ আলোতে
গাইলো সবাই গীত।

বেজীর হিংসা

গোলাম রাব্বানী, ২৫১৪
চতুর্থ শ্রেণী 'খ'

সিংহ হলো পশুর রাজা,
সবার চেয়ে তেজী।
সাপের রাজা আছে ভাই,
দুঃসাহসী বেজী।
ভর দুপুরে সিংহ বসে,
চিবায় যখন হাড়।
বেজী তখন চটে গিয়ে,
খাবার করে সাবাড়।

বাস্কেটবল টিম

ভলিবল টিম

হকি টিম

ক্রিকেট টিম

সুচিন্তিত মজার কথা

মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ৩০৯৯
অষ্টম শ্রেণী 'ক'

নীচের উদ্ধৃতিগুলি "বাণী চিরন্তনী" ঘরোয়া সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং অন্যান্য পত্র পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ঃ—

প্রত্যেক অতিথি একে অপরকে অপছন্দ করে, আর অতিথি সেবক সবাইকে অপছন্দ করে থাকে।

--আলবেনীয় প্রবাদ।

আত্মীয়রূপী পর হচ্ছে কুঁজো মানুষের কুঁজ, পিছনে লেগেই থাকে, কেটে ফেলাও যায় না। বহন করাও দুঃখ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হাঁ, না—কথা দু'টো সবচেয়ে পুরানো এবং সবচেয়ে ছোট অথচ এই কথা দুটো বলতেই অনেক ভাবতে হয়।

---পিথা গোরাস।

যে দেশে ক্রেতা বিক্রেতা সবাই চোর, যেখানে সরকারী কর্মচারীরা অধিকাংশই ঘুষ খোর, সেখানে নিয়ন্ত্রণ করা মানেই কালোবাজারের সৃষ্টি করা।

---বনফুল।

অধিকাংশ লোক এমনভাবে খায় যেন তারা নিজেদেরকে বাজারে বিক্রিত হবার মত চর্বিদার করার তালে আছে।

---ই ডাব্লু হাই।

যে তার গোপনীয় কথা ভৃত্যকে বলে, সে তার ভৃত্যকে প্রভুতে রূপান্তরিত করে।

---ডাইড্রেন।

মানুষকে ঘৃণা করাটা হল, ইঁদুর তাড়ানোর জন্য নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়ার মত।

---হ্যারি ইমারসন কোসডিক।

জিহ্বা যদিও আকারে মাত্র তিন ইঞ্চি লম্বা তবু ইহা ছয় ফুট লম্বা লোককে ধরাশায়ী করতে পারে।

---জাপানী প্রবাদ।

দুঃখে মাথার চুলছেঁড়া বোকামী, কেননা চুলহীন টেকো মাথার সাহায্যে দুঃখের লাঘব হয় না।

---সিসেরো।

একটা খুন করলে তাকে খুনি বলা হয় আর লক্ষ খুন করলে তাকে বীর বলা হয়।

---বি পি পোরটিয়াস।

সব মানুষের মধ্যে আদমই একমাত্র সবচেয়ে সুখী মানব ছিলেন কেননা তার কোন শ্বাশুড়ী ছিল না।

---পল পারপেইট।

কার ঘরে জন্মালে সেটা বড় কথা নয়, যার সঙ্গে উঠা বসা করছ সেটাই আসল কথা।

---ডনকুইকসোট।

পৃথিবীতে যেটা অপ্রিয় সেটার সম্ভাবনাই বেশী। ফুল গাছের চেয়ে আগাছাই বেশী সম্ভবপর।

---রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খালি পেটে কোন লোকই স্বদেশ প্রেমিক হতে পারে না।

---ডব্লিউ সিব্রান।

বোকাদের হৃদয় তাদের মুখের মধ্যে থাকে আর জ্ঞানীদের মুখ তাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকে।

---ফ্রাঙ্কলিন।

আমি আল্লাহকে সবচেয়ে ভয় পাই। তারপরেই ভয় পাই সেই ব্যক্তিকে যে আল্লাহকে মোটেই ভয় পায় না।

---শেখ সাদী।

যে তার ছেলেকে কোন সৎকাজে এবং বৃত্তিতে নিয়োগ করার জন্য উপযুক্ত না করে, পরন্তু তাকে সে চোর হতেই সাহায্য করে।

—ইহুদী প্রবাদ।

লুকানো প্রতিভা কোন সুনামই অর্জন করতে পারে না।

---ইরাসমাস।

টাকা ধার দিলে ক্ষতি হয়, টাকাটা হারান যায় নচেৎ একজন শত্রু লাভ হয়।

---আলবেনীয় প্রবাদ।

চোরকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয় না, যে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাকেই ফাঁসিতে যেতে হয়।

---চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রবাদ।

যে পাপ করে সে সাধারণ মানুষ, যে পাপ করার জন্য অনুতাপ ও দুঃখ করে সে সাধুব্যক্তি, যে পাপের বড়াই করে সে শয়তান।

--টমাস ফুলার।

প্রবলের ভয় আর দুর্বলের ভয়ে মস্ত একটা তফাৎ আছে। দুর্বল ভয় পায় সে ব্যথা পাবে, আর প্রবল ভয় পায় সে বাধা পাবে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

●

'আমানতদারী যাহার নাই তাঁহার ঈমান নাই, প্রতিরক্ষার অভ্যাস যাহার নাই তাঁহার ধর্ম নাই'।

—আল-হাদীস

বিমাতা

শেখ তৈমুর রেজা হাসান, ২৯২৫
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)

রঞ্জীবের কাছে আড়ম্বরপূর্ণ পৃথিবীটা ক্রমশঃ যেন অনাড়ম্বর হয়ে উঠেছে। এ পার্থিব জগতে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় তার। তাই সে লোকালয় থেকে সর্বক্ষণে গুটিয়ে রাখতে চায় নিজেকে।

রঞ্জীব যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন তার মা ক্যানসারে মারা যায়। তার পিতা সুরঞ্জীব চৌধুরী একজন নামীদামী ব্যবসায়ী। তাকে ব্যবসা নিয়ে সব সময়ের জন্য ব্যস্ত থাকতে হতো। তাই তার পরিবারের সাথে সম্পর্ক খুবই কম হয়ে উঠতো বললেই চলে। এ সুখী সংসারে রঞ্জীব ছিল তাদের কল্পরাজ্যের একমাত্র মধ্যমণি। কিন্তু সুরঞ্জীব সাহেবের স্ত্রীর এরূপ অভাবনীয় অকাল মৃত্যুতে সকলে অত্যন্ত মর্মাহত ও শোকাভিভূত হয়ে পড়লো। আর রঞ্জীবকে এ অতলস্পর্শী মাতৃত্বের দাবী থেকে এমন করে অসময়ে বঞ্চিত হতে হবে, তা সে কখনও চিন্তালোকে ভাবতেই পারেনি। যা'হোক মৃত্যুর অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সুরঞ্জীব সাহেবকে দুইমাসের জন্য একটা ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে জাপান যেতে হয়। যাবার প্রাক্কালে বাড়ীর বৃদ্ধ চাকর কালুর উপর রঞ্জীবের ভার রেখে গেলেন। কিন্তু ওদিকে সুরঞ্জীব সাহেব চলে যাবার পর রঞ্জীবের মধ্যে এক আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিল। সে সব সময়ে একা একা তার মায়ের কথা ভাবতো। স্কুলে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিলো। খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ঠিকমত করতো না। এমনি করে দুইমাস অতিবাহিত হবার পর সুরঞ্জীব বাড়ী ফিরলেন। ইতিমধ্যে রঞ্জীবের প্রাকনির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ লাভ করেছে। একদিন সুরঞ্জীব রঞ্জীবের কাছে ফলাফল জানতে চাইলেন। রঞ্জীব পরীক্ষার ফলটা দিয়ে তার পিতার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। পিতাপুত্রের এরূপ চোখাচোখিতে সুরঞ্জীবের কাছে রঞ্জীবের পলকহীন দৃষ্টির অন্তরালে অব্যক্ত ভাষাগুলো স্পষ্ট হয়ে পড়লো। রেজালটা দৃষ্টির সামনে রাখতেই তিনি একেবারে অচিন্তনীয়ভাবে হতবাক হয়ে পড়লেন-- এ কি! যে ছেলে ক্লাশে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় স্থান এ পর্যন্ত পায়নি সে কি করে পরীক্ষায় ফেল করে? এ জিজ্ঞাসার উত্তর অবশ্য তৎক্ষণাতই পেলেন না। দুই, তিনদিন বাসায় বসে সুরঞ্জীব রঞ্জীবের গতিবিধি লক্ষ্য করলেন। পরিশেষে তিনি রঞ্জীবের চিন্তায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন এবং রঞ্জীবের এরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা জানালেন। শেষে ডাক্তার তার ডাক্তারী মতানুসারে রঞ্জীবের ভবিষ্যত রক্ষার্থে সুরঞ্জীবকে অতিসত্বর বিবাহ করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সুরঞ্জীবের কাছে এরূপ পরামর্শ কল্পনাতীত ছিল, তবুও চরম বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে রঞ্জীবের স্বার্থে পুনরায় বিবাহে স্বীকার হতে হলো তাকে। তাই সে শাকীলা নাম্নী এক মেয়েকে বিবাহ

করলেন। কিন্তু ও দিকে পিতার এরূপ আচরণে রঞ্জীবের মন ঘৃণায় আর যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। এমতাবস্থায় সে ভাবতে লাগলো যে, সে এ পৃথিবীতে একদম একা, তার পাশে আপনজন বলতে আর কেউ নেই। এমন সময় সুরঞ্জীব সাহেব রঞ্জীবকে ডাকলেন। রঞ্জীব তার পিতার সামনে যেয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো। এমন সময় কালু বলল,--মাকে সালাম করো, রঞ্জীব। রঞ্জীব শুধু একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালুর দিকে এবং পিতার দিকে ঘৃণায় তাকালো এবং নীরবে তার ঘরে চলে গেল। কিন্তু সেদিন রাতে তার চরিত্রের এক অভাবনীয় আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিলো। খাবার টেবিলের সামনে এসে রঞ্জীব থমকে দাঁড়ালো,--এ কি! আজ এখনও টেবিলে খাবার আসেনি? তবে কি আজ নববধূ বরণে সকলে উৎসবে মত্ত? আমার খাবার কথা এ বাড়ীর কারও মনে নেই? রঞ্জীব রাগে ও ক্ষোভে টেবিলের সমস্ত প্লেট ও গ্লাশগুলো চারিদিকে ছুড়ে মারতে লাগলো। আর তারই ঝনঝনানি শব্দে সমস্ত বাড়ীতে হঠাৎ করে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। এমতাবস্থায়, সকলেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলো--একি করছো রঞ্জীব? পিতার কথা শেষ হতেই রঞ্জীব তীব্রভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতিউত্তরে জানালো--আমার খাবার এখনও টেবিলে আসেনি কেন? সবাই আনন্দ নিয়ে ব্যস্ত না? এই বলেই সে দৌড়ে তার ঘরে চলে আসলো। সুরঞ্জীব বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে কিছুক্ষণ ভাবলো। এরপর তিনি রঞ্জীবের কাছে যেতেই রঞ্জীব তার পিতাকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো এবং বলতে লাগলো--আমায় হোস্টেলে পাঠিয়ে দাও আব্বা। এর কিছুক্ষণ পরে পিতাপুত্র খাবার টেবিলে উপস্থিত হলো। রঞ্জীব বিসমিল্লাহ করতেই চেয়ে দেখে যে তারই পাশে তারই বিমাতা বসে আছে। অমনি সে খাবার ছেড়ে ঘরে চলে আসে। এতদিন পর হঠাৎ আজ হোস্টেলে যাবার কথা রঞ্জীবের মুখ থেকে বের হতে শুনে সুরঞ্জীব বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে শাকীলা বুঝতে পারলো যে, তার সান্নিধ্য রঞ্জীবের কাছে একেবারেই অসহনীয়। সে তাকে সবসময়ের জন্য যেন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং সে যে তার মায়ের স্থানে, এই প্রতিহিংসায় রঞ্জীব অনবরত জ্বলছে, যার ফলে আজ পর্যন্ত মা বলে ডাকাতো দূরের কথা, ভুলেও যে তার ছায়াটুকু মাড়ায়নি রঞ্জীব কখনো। সে মনে প্রাণে চায় সমস্ত কাজ থেকে তার বিমাতার হতে দূরে থাকতে। এদিকে পরিবারের গতিবিধি লক্ষ্য করে সুরঞ্জীবের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হতে লাগলো—আমিতো কেবলমাত্র রঞ্জীবের ভালোর জন্যেই শাকীলাকে বিয়ে করেছি, তবে এমন হচ্ছে কেন? তবে কি রঞ্জীব শাকীলার মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? নাতো, ওতো ওর বিমাতাকে প্রথম থেকেই সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু শাকীলাতো জেনে শুনে বিশেষতঃ রঞ্জীবের জন্যেই স্বেচ্ছায় আমার সংসারে এসেছে। কিন্তু রঞ্জীবও তো চায় মাতৃত্বের ক্ষুধা নিবারণ করতে--কারণ ওরতো মাতৃত্বের পিপাসা আছে। না, রঞ্জীবতো প্রথম থেকেই তার বিমাতাকে মায়ের মর্যাদা হ'তে বঞ্চিত করেছে। তবে এমনটা হচ্ছে কেন? এদিকে স্ত্রীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর পুত্রের প্রতি বিপুল স্নেহ তাকে কোন প্রতিকূল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করছে না। পরিশেষে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে রঞ্জীবকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিবেন কারণ রঞ্জীবও আগে হতেই রাজী আছে।

বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হলো। এর মধ্যে একদিন সামান্য দুধকে কেন্দ্র করে একটা চরম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলো। সেদিন সকালে কালুকে জরুরী কাজের জন্য বাইরে

যেতে হয়। এমন সময় রঞ্জীবের স্কুলে যাবার সময় হয়। শাকীলা এমতাবস্থায় কোন উপায়ন্ত না দেখে নিজে দুধ বানিয়ে রঞ্জীবের ঘরে নিয়ে আসে। রঞ্জীব দুধের গ্লাশটা হাতে নিয়ে ওমনি ছুড়ে মারে। শাকীলা এমন অশোভনীয় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তার গালে একটা চর বসিয়ে বললেন--তোমার বাবার শাসনহীন স্নেহের সুযোগে তুমি দিনদিন অসভ্যতার চরম শীর্ষে পৌঁছিয়েছ, লেখা-পড়া শিখে একটা আস্ত জানোয়ার ছাড়া আর কি হবে। এই বলে সে কাঁদতে কাঁদতে উপরে চলে গেল। রঞ্জীব তৎক্ষণাৎ তার আব্বার কাছে যেয়ে বললো--আমায় কালকেই হোস্টেলে পাঠিয়ে দিন, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। আর তা না দিলে- - - - - - বলেই সে বাইরে চলে গেল। সুরঞ্জীব কালুকে ডেকে রঞ্জীবের হোস্টেলে যাবার সমস্ত যোগাড় করে দিতে বললেন। রাতে সুরঞ্জীব একা একা বসে ভাবছেন, এমন সময় শাকীলা এসে তার পাশে বসলো এবং খুবই মৃদু স্বরে বললো--তুমি কি সত্যিসত্যিই কাল রঞ্জীবকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিচ্ছ? ওর সাথে তোমারও কি মাথা খারাপ হলো নাকি? যে ছেলের এক গ্লাশ পানিটুকু ভরে খাবার অভ্যাস নেই, সে কি করে হোস্টেলে থাকবে? সুরঞ্জীব এতক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—না, ওর হোস্টেলেই একমাত্র উপযোগ্য স্থান। শেষ পর্যন্ত তুমিও আমায় ভুল বুঝলে, এই বলেই শাকীলা চলে গেল। গভীর রাতে সুরঞ্জীব হঠাৎ শাকীলাকে পাশে দেখতে না পেয়ে উঠে বসলেন এবং রঞ্জীবের ঘরের দিকে আসতেই তিনি দেখতে পেলেন যে, ঘুমন্ত রঞ্জীবের মাথার কাছে বসে শাকীলা নীরবে কাঁদছে। পরদিন সকাল হলো। রঞ্জীবের যাবার সময় হলো। শাকীলা দোতালার বারান্দায় যেয়ে দাঁড়ালেন এবং পর মুহূর্তে রঞ্জীবের গাড়ী ছেড়ে দিলো। শাকীলা নির্বাকের মত পলকহীন দৃষ্টিতে যতদূর দৃষ্টি গেল ততদূর চেয়ে থাকলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেদিন শাকীলার চোখের কোণায় একবিন্দু অশ্রুকণাও দেখা গেল না।

রঞ্জীব চলে যাবা পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। সংসারে যে স্বাভাবিক গতি ছিল, তাতে অস্বাভাবিক রকমের পরিবর্তন দেখা দিল। যা সুরঞ্জীবের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো। শুধু তাই নয়, শাকীলাও নিজের প্রতি দিনদিন উদাসীন হয়ে পড়লো। সংসারী হতে যেয়ে সে আজ সংসার বিরাগী হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় সুরঞ্জীব সাহেব তাকে বাপের বাড়ীতে পাঠাতে রাজী হলে শাকীলা তাতে আপত্তি জানায় না এবং সেও বাপের বাড়ীতে চলে যায়। এ শুন্য বাড়ীতে একা সুরঞ্জীব একদম হাঁপিয়ে উঠেছেন। কোথায় যে কি গোলমাল হয়ে গেল তা তিনি ভাবছেন, এমন সময়ে কালু এসে বললো—খোকা বাবু চলে গেল, মাও চলে গেলেন, এ পড়ো বাড়ীতে আমার একদম মন টিকছে না বড় বাবু। খোকা বাবু বড্ড একরোখা, মাকে কখনও সে সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু মা খোকা বাবুকে খুবই ভাল বাসতেন। প্রত্যহ খোকা বাবুর পছন্দ করা নাস্তা বানিয়ে আমায় বলতেন, "কালু তুই খবরদার বলিসনে যে এসমস্ত আমি বানিয়েছি, তুই বলবি যে ওগুলো তুই বানিয়েছিস, নইলে কিছু খাবে না কিন্তু।" মা এমনকি খোকার কোন কাজই আমায় করতে দিতেন না। খোকা বাবু স্কুল থেকে না আসা পর্যন্ত মা ভাত খেতেন না। নিজ হাতে প্রত্যহ বাগান থেকে ফুলতুলে মালা গেঁথে বড় মায়ের ফটোতে পরায়ে বলতো, "রঞ্জীবকে তুমি আশীবাদ করো ও যেন অনেক বড় হতে পারে।" বড় মাও বেঁচে থাকলে হয়তো বা খোকা বাবুকে এত ভাল বাসতে পারতেন না। মা আমায় বলতেন "কালু দেখিস, রঞ্জীব একদিন বড় হলে আমায় ঠিকই ভাল বাসবে, ঠিকই বুঝবে।" সুরঞ্জীব

কালুর সমস্ত কথা নির্বাক হয়ে শুনে গেল আর মনে মনে ভাবলেন—স্ত্রী হিসেবে শাকীলাকে যতখানি জানা উচিত ছিল তা চিনতে আমি অক্ষম হয়েছি। জীবনে প্রচুর অর্থ রোজগার করলাম কিন্তু সংসারে এতটুকু অর্থতো কখনও লাভ করতে পারেনি। এমন সময় একটা চিঠি আসলো। তিনি চিঠিটা খুলে দেখলেন যে সেটা তারই স্ত্রীর চিঠি। চিঠিটা নিম্নরূপ—

সুরঞ্জীব,

যতদিন পর্যন্ত রঞ্জীব ঘরে না ফিরবে, ততদিন পর্যন্ত আমিও ঘরে ফিরবো না। আমায় ক্ষমা করো সুরঞ্জীব। ইতি—শাকীলা।

চিঠিটা পড়া শেষ করে সুরঞ্জীব চৌধুরী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মাত্র।

●

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত জিনিসের উপর শক্তিশালী'।

— আল-কুরআন

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী সমাজ

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (এম, এম)
সহকারী শিক্ষক

আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে সমগ্র পৃথিবী অত্যাচার, অনাচার, এবং কুসংস্কারের অন্ধ বিশ্বাসে ডুবে গিয়েছিল। সেকালের নারীরা ছিল অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরাই ছিল নির্যাতিত নিষ্পেসিত। এ নিপীড়িত নারী সমাজকে অত্যাচার ও ব্যভিচারের নাগপাশ ছিন্ন করে মহান আদর্শিক মুক্তি দিয়েছে "আল-ইসলাম।"

প্রাক-ইসলামী যুগে নারীর কোন মর্যাদা বা অধিকার ছিল না। তুয়া আত্ম-সম্মান বোধের জন্য। সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া হত। সে সমাজের পুরুষ তাদের ভোগ লালসা চরিতার্থ করার জন্য নারীদেরকে পশুর ন্যায় ব্যবহার করত। নারী ছিল পুরুষের ভোগের সামগ্রী স্বামী কিংবা পিতার সম্পত্তিতে তাঁদের কোন অধিকার ছিল না। বিয়ের ব্যাপারে নারীর কোন মতামতের অধিকার ছিল না। কোথাও কোথাও ধর্মের দোহাই দিয়ে বিধবাকে মৃত স্বামীর সাথে জীবিত কবর দেয়া হত। নারী জাতির এই সীমাহীন দুর্দিনে খোদারী বিধানের আশীর্বাদ নিয়ে আগমন করেন বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ)। যুগ যুগ ধরে অবহেলিত নারী জাতির প্রাণে তিনি জাগালেন স্পন্দন, তাঁদের শুনালেন মুক্তির বাণী, ফিরিয়ে দিলেন শাশ্বত অধিকার। প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁদেরকে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে। তিনি কুরআনের বাণী শুনালেন যে "নারী পুরুষের জন্যে পোশাক স্বরূপ, যেমন পুরুষ নারীর জন্য পোশাক স্বরূপ" মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ও মহানবী (সঃ)-এর ঘোষণার মধ্যে নারী জাতির সত্যিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহানবী (সঃ) বলেছেন; "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহশ্‌ত।" এখানে নারীকে যথেষ্ট সম্মানের অধিকারীণী করা হয়েছে। নারীকে প্রমাণ করেছে, ইসলাম আদর্শ শক্তি রূপে। নারী সমাজের অবিচ্ছিন্ন অংশ; নারীকে বাদ দিয়ে কোন সমাজের উন্নত সম্ভবপর নয় 'ইসলাম' নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে-উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তি লাভের অধিকার দিয়েছে। ইসলামী সমাজে বিবাহকে একটা পারস্পরিক চুক্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমান মর্যাদা সম্পন্ন, বিবাহের ব্যাপারে 'ইসলাম' নারীকে নিজের ইচ্ছার উপর যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছে। পুরুষের ভোগ লালসার সামগ্রী-রূপে নারীকে গণ্য করার বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে 'ইসলাম' বিবাহকে একটা পবিত্র অনুষ্ঠান এবং নবীর সুন্নত হিসেবে ঘোষণা করেছে। ইসলামে নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্ত্বা স্বীকৃত। যেমন জ্ঞান অন্বেষণের ব্যাপারে মহানবী (সঃ) নারী পুরুষকে সমান তাগিদ দিয়ে বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ।"

'ইসলামে' মর্যাদার আসনে অভিসিক্তা নারী, সকল গ্লানি ও মলিনতা হতে আদর্শিক মুক্তি পেয়েছে নারী। ইসলাম নারীকে বাস্তবিকই একটা স্বাধীনতা দিয়েছে, মুক্তি দিয়েছে।

কিন্তু তাই বলে ইসলাম বিকৃত নারী প্রগতিকে সমর্থন করেনি। স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃংখলতার ছাড়পত্র নয়, বরং নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা এবং শালীনতা বজায় রাখার জন্য ইসলামে ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন পর্দা প্রথা। ইসলাম পর্দা প্রথার দ্বারা নারীকে অবরুদ্ধ করেনি, বরং নারীকে আমানতদারী এবং দায়িত্বশীলা প্রমাণ করেছে। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে "যে নিজেকে পর্দায় রাখে অর্থাৎ নিজেকে হিফাজতে রাখে, সে-ই প্রকৃত মুমিন।" ইসলামে স্বামীকে ন্যায়ভাবে সন্তুষ্ট রাখার নির্দেশ রয়েছে। প্রয়োজন ব্যতিরেকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য পুরুষের সংগে অবাধে মেলা-মেশা অথবা ঘরের বাইরে গিয়ে নাচগান এবং সাজ-সজ্জায় নিমগ্ন হতে নিষেধ করা হয়েছে। মূলতঃ এ সব বিধান নারীর কল্যাণার্থে দেয়া হয়েছে—যাতে নারী পুরুষের খেলার উপাদান বা ভোগ্যপণ্যে পরিণত না হয়।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ব্যক্তি স্বার্থের রঙ্গীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমাদের বর্তমান হ-য-ব-র-ল সমাজের মুসলিম নারীরা নিজেদের জীবনে এনেছে নৈতিক অধঃপতন ও ব্যভিচারের প্রসার, যে সমাজের সাথে পবিত্র ইসলাম সমাজ ব্যবস্থার নেই কোন মিল, নেই কোন তুলনা। আজ নারী সমাজ খোদার বিধানকে অনুসরণ না করে তারা বরং নফসের দাসত্ব আর দুনিয়ার গোলামীর মধ্যে নিমজ্জিত। দুনিয়ার গতিধারার সাথে তাল মিলিয়ে খড়কুটো আর আবর্জনার মত ভেসে চলেছে নদীর স্রোতে। উচ্ছৃংখল দুনিয়ার গতিধারাকে ঘুরিয়ে দিয়ে তারা পারছে না ইসলামী নির্ভুল জীবন ব্যবস্থাকে আকড়ে ধরতে।

●

'সুস্থতা ও অবসর উভয়টি আল্লাহর নেয়ামত; অনেকেই ইহার অপচয় করিয়া থাকে'।

—আল-হাদীস

এক নম্বর হাউস

হাউস মাষ্টার ঃ মিসেস দিল রওশন ইসলাম
হাউস টিউটর ঃ মিসেস দিলারা বেগম
হাউস এল্ডার ঃ মাষ্টার সাঈদ হাসান
হাউস প্রিফেক্ট ঃ মাষ্টার রকীব সাখাওয়াৎ।

প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যের বিচারে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের এক নম্বর ছাত্রাবাসের ভূমিকা শুধু যে ঐতিহাসিক তাই নয়, নানাকারণেই তা গৌরবদীপ্ত। যে আদর্শ ও লক্ষ্য সামনে রেখে এই অনন্য বিদ্যাপীঠের সূচনা, সেই লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্র হিসেবে সাথে সাথেই দরকার হয়েছিল বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের বসবাসের উপযোগী কয়েটি আবাসিক ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা।

আমাদের এই এক নম্বর হাউস দিয়েই শুরু হয়েছিল সেইদিনের সেই শুভ জয়যাত্রা।

সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে সে দিনের সেই নবীনতম ছাত্রাবাস আজ শুধু আকার আয়তনেই বিশালতম নয়, ছাত্র সংখ্যার দিক দিয়েও গরিষ্ঠতম। বর্তমানে এ ছাত্রাবাসের উপর ও নীচ মিলে সর্বমোট ৭টি সেকশন ও ৫টি স্পেশাল রুম। আসন সংখ্যা ১৮৪। বলাবাহুল্য কোন আসনই আজ শুন্য পড়ে নেই। তাই একথা সহজেই অনুমেয়, স্কুলের অন্যসব ছাত্রবাসের তুলনায় এখানকার কর্মকাণ্ড বিপুল, অতএব সমস্যাও তার ব্যাপক। কিন্তু সুখের বিষয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সহযোগিতা, সুবিবেচনা ও তাৎক্ষনিক কর্মতৎপরতার গুণে এবং হাউস স্টাফের প্রত্যেকের কর্তব্য নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা ও স্নেহকোমল সাহচর্যে এখানকার ছোট বড় সব সমস্যাই আমরা এখন ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছি।

প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররাই এ হাউসের অধিবাসী—ছয় থেকে এগার বছরের মধ্যে এদের বয়সের গণ্ডি। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় নয়' এদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীর যথাযথ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে এ হাউসের প্রত্যেকরেই একটা সুনির্ধারিত কর্মসূচীর মধ্যে এগিয়ে যেতে হয়। এই ধরাবাঁধা জীবনে ওদের জন্যে কিছু আনন্দ ও বৈচিত্র্যের উপকরণ নিয়ে আসে শনিবারের T. V. প্রোগ্রাম, রবিবারের কোন একদিন হঠাৎ শিক্ষা মূলক সফর অথবা আন্তঃহাউস কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এদের এখানকার জীবন তাই কোন অর্থেই শৃংখলিত নয়—বরং সুশৃংখল, সুনিয়ন্ত্রিত ও আনন্দময়।

হাউস মাষ্টার, হাউস টিউটর ও হাউস মেট্রনের তত্ত্বাবধানে এখানকার দৈনিন্দন জীবনের কর্মসূচী শুরু হলেও প্রায় প্রতিটি কাজের দায়দায়িত্বে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত থাকে এ হাউসের প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ডের ছোট্ট, কিন্তু সুযোগ্য সদস্যবৃন্দ। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ফজরের আজান

থেকে শুরু করে মর্নিং পিটি, ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ, বিশ্রাম, বৈকালিক চা, খেলাধুলা, দুধপান, মাগরিবের নামাজ, নৈশকালীন পাঠ প্রস্তুতির আয়োজন, ডিনার ইত্যাদি সবকিছু সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করার দায়িত্ব এদেরকেই গ্রহণ করতে হয়। ছেলেদের সহযোগিতার কারণেই ওয়ার্ড বয়, টেবিল বয়, দ্বারোয়ান এদের প্রত্যেকের কাজ সহজসাধ্য হয়। এছাড়া নিজের বিছানাপত্র ও লকার গোছানো, সেকশন ও হাউসের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা বাগানের পরিচর্যা-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ সব কাজেই তারা ওতপ্রোতভাবে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখে। হাউসের সর্বাপেক্ষা কর্মব্যস্ত দিন অবশ্যই বৃহস্পতিবার। সেদিন থাকে আন্তঃহাউস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দিবস। এ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার জন্য এ হাউসের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য থেকে শুরু করে অন্যান্যরা যে ভাবে কঠোর পরিশ্রমে আত্মনিয়োগ করে তা শুধু গভীর বিস্ময়ে লক্ষ্য করার মতো। নিজের অলস, অকেজো ছেলেটিকে হাউসে পাঠিয়ে যে সব অভিভাবকরা থাকেন দুর্ভাবনায় নিত্য কাতর, সেদিন ঝাড়ন বা ঝাড়ু হাতে তাদের সেই অলস ছেলের কর্মতৎপরতা তারা কিভাবে লক্ষ্য করতেন, সেটা একটা দেখবার বিষয় হত বলে অনুমান করা যায়। এই ভাবেই তো হাউসের এই সম্মিলিত জীবন ধারায় বারবার এসে যুক্ত হয় নতুন প্রাণের বন্যা, স্ফুরিত হয় কর্মের আবেগ, সঞ্চারিত হয় উদ্দীপনা এবং সবকিছু মিলে সেখানে ক্রমশ উন্মোচিত হয় হৃদয়, বিকশিত হয় নেতৃত্বের গুণাবলী এবং গড়ে উঠে ব্যক্তিত্ব।

এবার আমাদের এ হাউসে খেলাধুলায় চ্যাম্পিয়নশীপ লাভের গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু সেদিন হয়ত সুদূর নয়, যেদিন শুধু খেলাধুলায় নয় সকলক্ষেত্রেই এ হাউস চ্যাম্পিয়নশীপ লাভের কৃতিত্ব অর্জন করবে। সেদিন আর আক্ষরিক অর্থে নয়, প্রকৃত অর্থেই এ হাউস সকল বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় হাউস হিসেবে গণ্য হবে। আশাকরি এ স্কুলের মহান ঐতিহ্য, গৌরব, ও সুনাম বজায় রাখার ব্যাপারে এ হাউসের প্রতিটি ছাত্রই আজীবন তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। পরম করুণাময় আল্লাহ্ এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করুন এবং তাদের সকল সৎ প্রয়াসকে জয়যুক্ত করুন।

●

'দুনিয়ায় খোদাভীতি অবলম্বন কর, তা'হলে আল্লাহর প্রিয় হ'বে'।
—আল-হাদীস

দুই নম্বর হাউস

হাউস মাষ্টার : জনাব সুজা-উদ্-দৌলা
হাউস টিউটর : মিসেস রহমান শাহীন
হাউস এলডার : মাষ্টার রফিকুস সালেহীন
হাউস প্রিফেক্ট : মাষ্টার সামসুল আহাদ।

২ নং হাউস রেসিডেন্সিরাল মডেল স্কুল ও কলেজের একটি ঐতিহ্যবাহী আবাসিক ভবন। ১৯৬১ সনের ১লা মে এই ছাত্রাবাসটির জন্ম। সেই জন্মলগ্ন থেকে সুদীর্ঘ দিন ধরে বহু গৌরব ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে মাথা উঁচু করে আজও এই ছাত্রাবাসটি তার সাফল্য বহন করে চলেছে। ১ম শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিশু ও কিশোরদের নিয়ে এই ছোট্ট, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ছাত্রাবাসটি দাঁড়িয়ে আছে।

রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম কার্যে, কায়িক শ্রমে ও খেলাধূলার প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে প্রতিটি শিশু ও কিশোর ভবিষ্যতের নেতৃত্বদানের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে। স্ব-নির্ভর, আত্ম-প্রত্যয়শীল ব্যক্তি হিসাবে এরা গড়ে উঠছে। জয় এদের সুনিশ্চিত, পরাজয় এরা বরণ করতে জানে না।

১ম শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত এই ছোট ছোট আবাসিক ছাত্রদের প্রতি দিনের রুটিন মাফিক লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে কর্মঠ, সাবলম্বী এবং সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে হয়। ধর্ম যেহেতু জীবনের একটি অঙ্গ তাই নিয়মিত ধর্ম ক্লাশ, আযান, কিরাত, মিলাদ ও নামাজ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সকল ছাত্রই অংশ গ্রহণ করে।

২ নং হাউসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হ'ল এর প্রতিটি কর্মচারী ও ছাত্রদের মধ্যে প্রাণের টান। এই ছোট্ট শিশুদের দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত সকলেই তাদের কর্তব্য নিষ্ঠা, স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসা দিয়ে এদেরকে লালন করে যাচ্ছেন।

এই হাউসের পরীক্ষার ফল সব সময়েই ভাল হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণীর ছাত্র সাইদউদ্দিন হেলাল, তানভীর আহমেদ, ২য় শ্রেণীর ছাত্র মীর নাহিদ আহসান, ৩য় শ্রেণীর মনিরুজ্জামান, ৪র্থ শ্রেণীর মাহবুবুর রহমান ও শাকিল আহমেদ, ৫ম শ্রেণীর সাদাওয়াৎ হোসেন মোল্লা ও নোমান শাহীন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর মোশাররফ হোসেন ও শেখ তৌফিক এর মত ছাত্ররা ভবিষ্যতে এই হাউসের তথা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজের মুখ উজ্জল করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

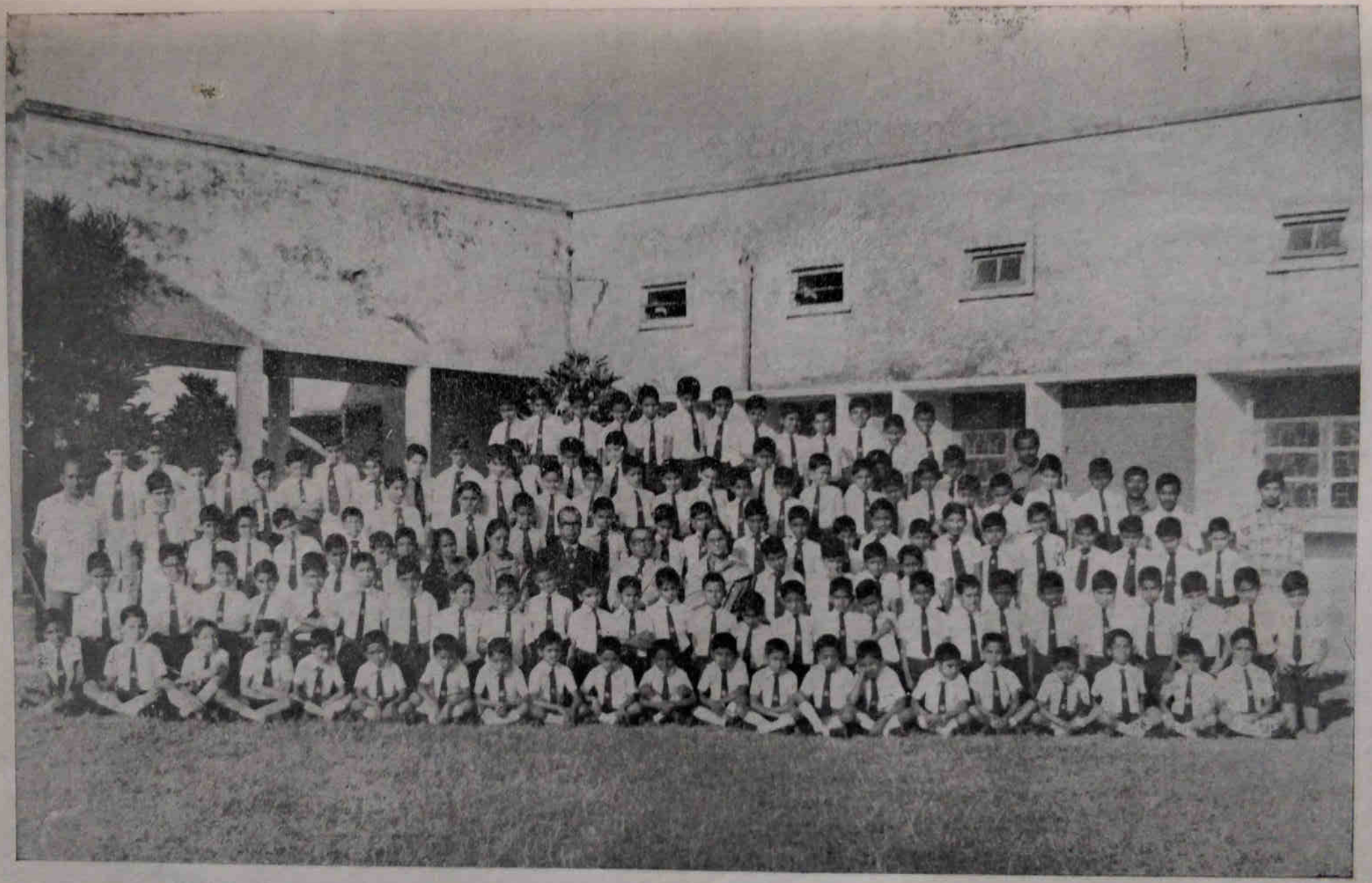

১ নং ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ

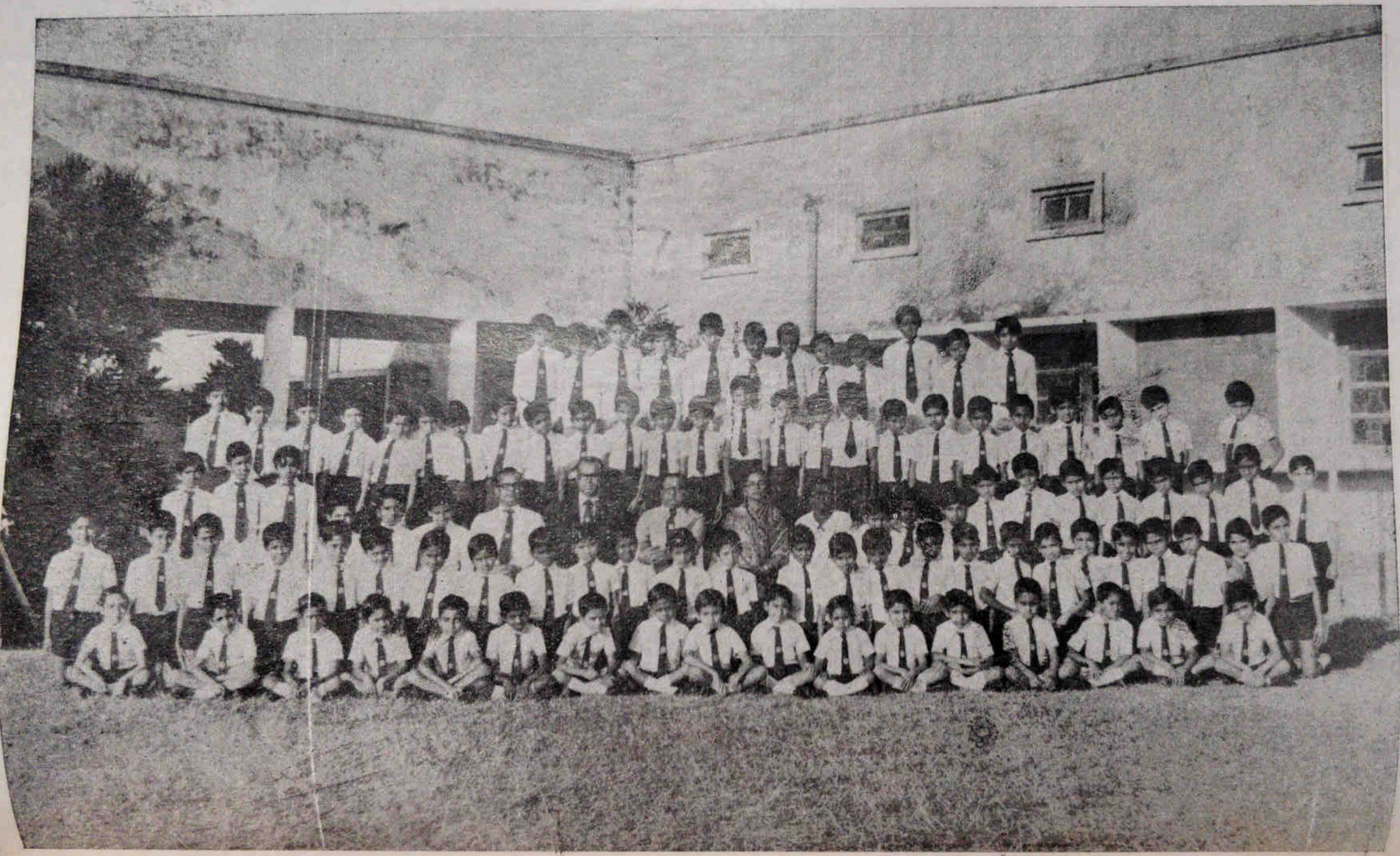

২ নং ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ

খেলাধূলায় ও অন্যান্য কার্যাবলীতে ও এই হাউস পেছিয়ে নেই। ১৯৭৮, '৭৯ ও '৮০ সালে এই হাউস জুনিয়র শাখায় চ্যাম্পিয়ন দিয়ে হ্যাট্রিক করবার গৌরব অর্জন করে। শৃঙ্খলা বোধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, মার্চ পাষ্ট প্রভৃতি বিষয়গুলিতে ২ নং হাউস চলতি বছর ও বিগত বছর গুলিতে পূর্ণ পয়েন্ট পেয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

গান, কবিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই হাউসের ছাত্রদের সুনাম লক্ষ্যণীয়। গান, আবৃত্তি, কৌতুকে মীর নাহিদ আহসান, তানভীর আহমেদ, মীর মোজাম্মেল হায়াৎ, মামুনুর রহমান রন, সেখ তৌফিক সকলের কাছে পরিচিত।

২নং হাউসের বিভিন্ন সমস্যাও রয়েছে। ছাত্রাবাসটির দ্বিতল ভবনের একটা অংশ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্তমানের ছাত্র সংখ্যা পূর্বের ছাত্র সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশী হওয়ায় এই ছাত্রাবাসটিকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

২নং ছাত্রাবাসের যা গৌরব তা কারও একক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি নয়। সামগ্রিকভাবে আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্র, সকল শ্রেণীর কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা ও সহযোগিতা এই হাউসের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করেছে।

'সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও বিদ্যার্জ্জন কর'।

— আল-হাদীস

তিন নম্বর হাউস

হাউস মাস্টার ঃ জনাব মোঃ আব্দুর রউফ
হাউস টিউটর ঃ জনাব এ. বি. এম. শহীদুল ইসলাম
হাউস এল্ডার ঃ মাস্টার জামিল আব্দাল
হাউস প্রিফেকট ঃ মাস্টার ইদ্রিস খান।

৩নং হাউস ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল একটি আবাসিক ভবন। ঐতিহ্যবাহী এই স্কুল ও কলেজের সবচেয়ে নবীন সংযোজন "তিন নম্বর হাউস।" কিন্তু, প্রতিশ্রুতিশীল এই হাউস এবং তার বাসিন্দার ঐতিহ্যের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ সাধন করে মডেল স্কুলের 'মডেল'-এ পরিণত হয়েছে।

এই হাউসে ঢুকতেই চোখে পড়ে "শত ফুল ফুটতে দাও।" এই শ্বাশত বাণীর সুস্থিত সাফল্য ৩নং হাউসকে সুশোভিত কাননে পরিণত করেছে। বিকশিত প্রতিভার সৌন্দর্যে এই হাউস বারবার শোভিত হয়েছে।

১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (বিজ্ঞান বিভাগ) ৩নং হাউসের খালেদুল ইসলাম, শতকত বারী এবং শাহাদাত হোসেন যথাক্রমে ৪র্থ, ১১শ, ১৬তম এবং মানবিক বিভাগের শিহাব খান ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে অতুলনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

শুধু লেখা-পড়াতেই নয়, ৩নং হাউস খেলা-ধুলাতেও যথেষ্ট নেতৃত্বশালী। ১৯৮১ সালের আন্তঃহাউস ফুটবল, দাবা এবং টেবিল টেনিসে ৩নং হাউস চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। বছরের ব্যক্তিত্বেদের মধ্যে নূর মোহাম্মদ' ফেরদৌস খান ও বেনজীরের নাম হকি ও ফুটবল প্রেমিকদের মনে স্থান করে নিয়েছে। নূর মোহাম্মদ একধারে ফুটবলার, এথলেট, স্কাউট এবং হকি খেলোয়াড়। রায়হান ইসহাকের নাম আজান-কিরাতের জন্য অতি সুপরিচিত। এছাড়া বর্তমান দ্বাদশ শ্রেণীর জাহাঙ্গীর হোসেন স্কুল ও কলেজের শ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমাদের স্কুল ও কলেজের পক্ষ থেকে নুসরাতে জামিল (দলনেতা), জাহাঙ্গীর হোসেন ও ইকবাল হাবিব প্রতিনিধিত্ব করে। এরা তিন-জন-ই ৩নং হাউসের ছাত্র এছাড়া ফরিদ আহাম্মদ। একাডেমিকসে ৩নং হাউসের পতাকা সমুন্নত রেখেছে।

স্কুল ও কলেজ ফুটবল দলের ৭জন খেলোয়াড় নূর মোহাম্মদ, সালাহউদ্দিন, সদরুল আমিন, ইদ্রিস খান, বেনজীর আহমেদ, সাইফউদ্দিন আহমেদ ও ফেরদৌস খান—এরা সকলেই ৩নং হাউসের ছাত্র। এছাড়া স্কুল ও কলেজ হকি দলের ৪জন খেলোয়াড় নূর মোহাম্মদ, সালাহউদ্দিন, ফেরসৌস খান এফ সদরুল আমিন আমাদের হাউসের-ই ছাত্র।

শ্রদ্ধেয় হাউসমাস্টার জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এবং হাউস টিউটর জনাব শহীদুল ইসলামের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমাদের হাউসের ছেলেরা উত্তরোত্তর উন্নত করুক—এই আমাদের কাম্য।

নজরুল ইসলাম ছাত্রাবাস

হাউস মাষ্টার ঃ জনাব মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ
হাউস টিউটর ঃ জনাব মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান
হাউস এল্ডার ঃ মাষ্টার খান সাইদ হাসান
হাউস প্রিফেকট ঃ মাষ্টার মুজিবর রহমান।

"মোরা আকাশের মত বাধাহীন
মোরা মরুচঞ্চল বেদুইন"

চির নবীন চির তরুণ অমর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামানুসারে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজের এ ছাত্রাবাসটির নামকরণ করা হয় "নজরুল ইসলাম হাউস"। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য্যের অধিকারী এই মহান কবির জীবনাদর্শে এ হাউসের কিশোর তরুণ ছাত্রদের উদ্দীপিত করাই এই নামকরণের উদ্দেশ্য। প্রতিভাধর এই কবির আদর্শে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে এ হাউসের ছাত্ররা স্কুলের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ-গ্রহণের মাধ্যমে বয়ে নিয়ে আসছে সফলতার সমুন্নত পতাকা। কবির জীবনাদর্শ, তাঁর অগ্নিক্ষরা বাণী এ হাউসের প্রতিটি ছাত্রকে দিয়েছে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাবোধ আর কর্মের প্রতি সুগভীর মর্যাদাবোধ।

পারিবারিক পরিবেশে আশ্রিত এ হাউসের আবাসিক ছাত্রদের মোট আসন সংখ্যা আশি। এ ছাড়াও কিছু অনাবাসিক ছাত্র এ হাউসের সঙ্গে যুক্ত আছে। আবাসিক অনাবাসিক নির্বিশেষে এ হাউসের ছাত্ররা স্কুলের পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রমভুক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে সাফল্যের এক সুমহান ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে।

এ হাউসের ছাত্ররা প্রতিবছর বিভিন্ন খেলধুলায় বিশেষ অবদান রেখে আসছে। ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস ভলিবল ও আন্তঃহাউস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়। ঐ বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নজরুল হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ হাউসের কৃতিছাত্র খাজা রহমত উল্লাহ এ বিদ্যায়তনের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হবার গৌরব অর্জন করে।

শুধু মাত্র স্কুলেই নয়, জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এ হাউসের ছাত্ররা সাফল্য বয়ে নিয়ে আসছে। ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় যুব হকি টুর্নামেন্টে এ হাউসের ছাত্র খাজা রহমত উল্লাহ্ অংশগ্রহণ করে। এ হাউসের কৃতি খেলোয়াড় আমিনুল

ইসলাম ও খাজা রহমত উল্লাহ্ নিয়মিত ভাবে ১ম বিভাগ হকি লীগে খেলে আসছে। এ বছর জাতীয় হকি দল গঠনের জন্য খাজা রহমত উল্লাহ আমন্ত্রণ পায়। আমরা তার উত্তরোত্তর গৌরবময় সাফল্য কামনা করি।

ঐ বছর রেডক্রস সোসাইটি আয়োজিত "রেডক্রস সর্বত্র সবার জন্য" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় এ হাউসের ছাত্র বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ প্রথম স্থান অধিকার করে।

১৯৮১ সালে জাতীয় টেলিভিশন শিশুশিল্পী প্রতিযোগিতায় এ হাউসের ছাত্র মোস্তাফা আনোয়ার কাজমী উপস্থিত বক্তৃতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের উৎসাহব্যঞ্জক উপদেশবাণী এবং হাউসের অভ্যন্তরে ও বাইরে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের মূল্যবান পরামর্শ ও অনুপ্রেরণায় এ হাউসের ছাত্ররা সাফল্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁদের মূল্যবান উপদেশ শিরোধার্য করে এ হাউসের ছাত্ররা উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে এ আশা দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।

পরিশেষে পরম করুণাময়ের নিকট আমাদের আবেদন, কবির জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন যশ ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয় এ হাউসের প্রতিটি ছাত্র যারা এখানকার ছাত্র জীবন সমাপ্তির পর এ হাউসের স্নিগ্ধ মায়াময় পরিবেশ ছেড়ে জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হয়।

●

'নিজের হাতের কামাই সর্বাপেক্ষা উত্তম রিজিক'।

— আল-হাদীস

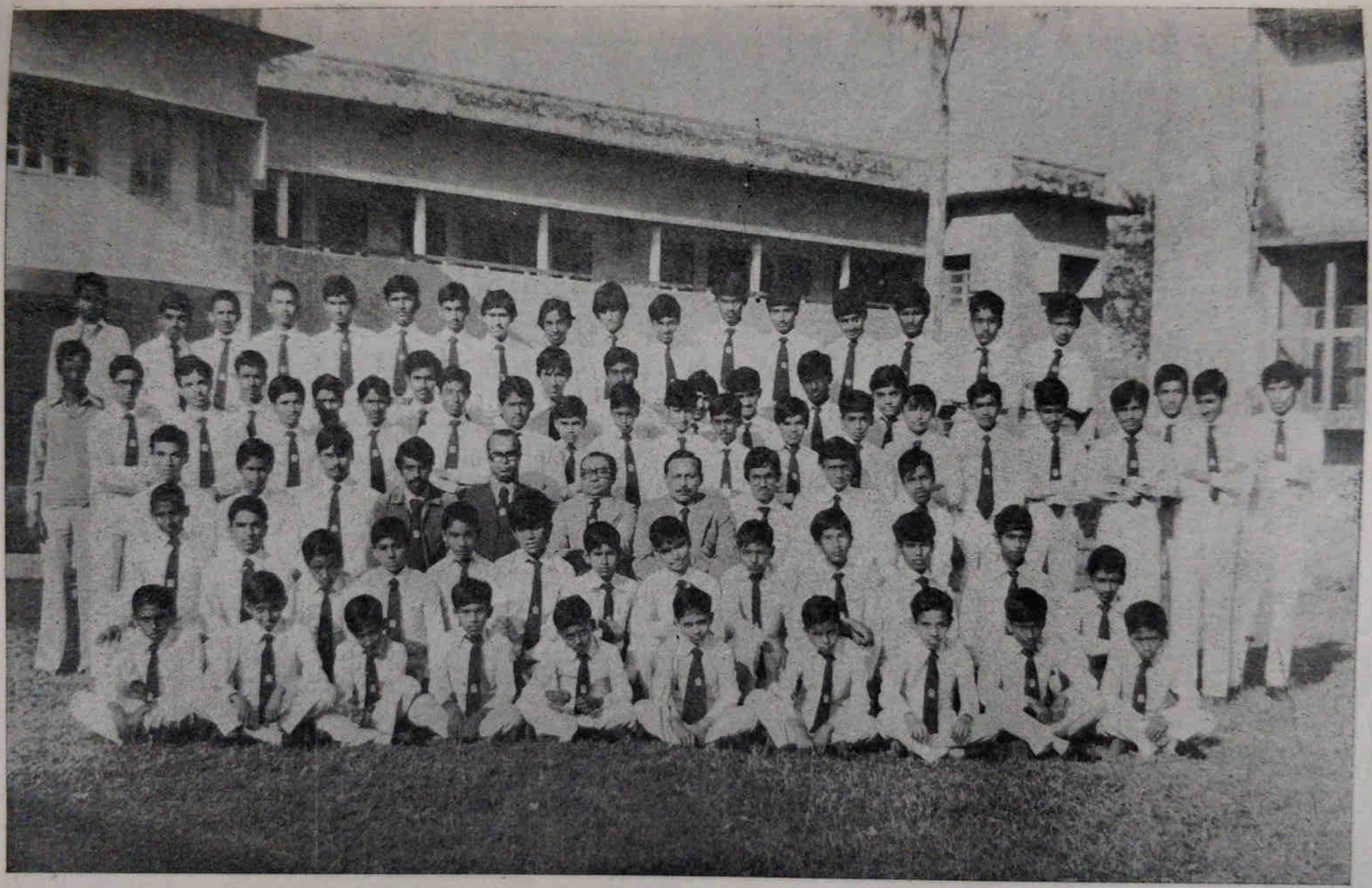

৩ নং ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ

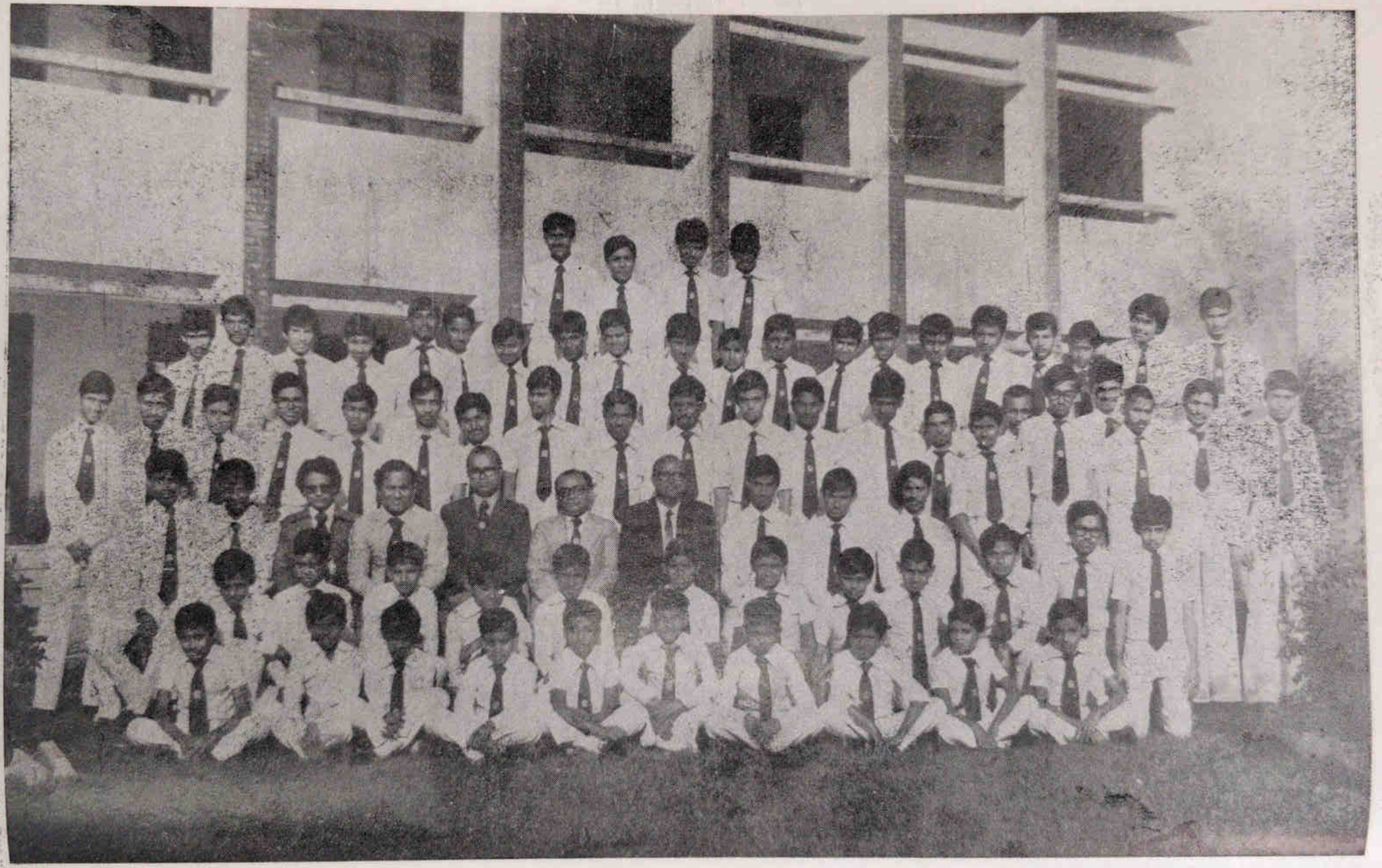

কাজী নজরুল ইসলাম ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ

ফজলুল হক ছাত্রাবাস

হাউস মাষ্টার ঃ জনাব এ. বি. এম. আবদুল মান্নান
হাউস টিউটর ঃ জনাব কাজী আতিকুর রহমান,
জনাব এ. টি. এম. জালাল উদ্দীন
হাউস এল্ডার ঃ মাষ্টার আবুল বাশার
হাউস প্রিফেক্ট ঃ মাষ্টার মহিম হাসান।

এক সূর্যোদয়ের পর থেকে আরেক সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রতিক্ষণে যেথায় আছে সহচরীর স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা আর হৃদ্যতা ও সমঝোতা সেটাই আমাদের গৃহ, আপন গৃহ। এখানে অভাব নেই আমাদের কোন কিছুরই। বাবার স্নেহ, মায়ের আদর হ'তে দূরে বৎসরের সিংহ-ভাগ সময় আমরা এখানে অতিবাহিত করছি। তাই তো হাউস মাষ্টার-স্যার এবং হাউস টিউটর-স্যার পিতার অভাব পূরণ করে স্নেহ ভালবাসায় আমাদের দিনে দিনে সযত্নে গড়ে তুলেছেন। তাঁরা শুধু আমাদের শিক্ষকই নন, তাঁরা মানুষ গড়ার শিল্পী।

তাঁদের এই শিল্পসাধনায় আমাদের পূর্বসূরীগণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, অতীতের পানে তাকালেই তা দেখতে পাই। '৭৫-এ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শামীমুল হক, '৭৭-এ মাধ্যমিকে কামরুল ইসলাম, '৭৮-এ উচ্চমাধ্যমিকে আবুল কালাম আজাদ, শহীদুল আরেফিন, '৭৯ ও '৮১-তে মাধ্যমিক পরীক্ষায় যথাক্রমে খালেদুল ইসলাম ও এ. কে. এম. ছালেক সম্মিলিত মেধা তালিকায় গৌরবোজ্জ্বল স্থান করে নিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে যতবার আমাদের এ শিক্ষা নিকেতনের ছাত্ররা মেধা তালিকায় স্থান অধিকার করেছে, ততবারই ফজলুল হক ছাত্রাবাসের ছেলেরা ছিল শীর্ষে। শুধু অতীত গৌরবেই সমৃদ্ধ নয় আমাদের ইতিহাস। আগামী বছরগুলোতেও দেশের মুখ উজ্জল করার প্রতিশ্রুতিতে প্রস্তুত হচ্ছে আমাদের ছাত্রাবাসের আরও অনেক ছাত্র। খন্দকার হাবীব, মনিরুল ইসলাম, কাজী নজরুল হক, মাহমুদ হাসান, এমনি আরও অনেক মুখ ভবিষ্যতে বিকশিত হবে।

শুধু পুথিগত বিদ্যায়ই আমাদের জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই সহপাঠ্য কার্যক্রমে ও আমাদের ছাত্রাবাসের অনেক ছাত্র গৌরবান্বিত হয়েছে। চারুকলা, কারুকলা, খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়ে বিজয় মুকুট ছিনিতে নিয়ে এসেছে এ ছাত্রাবাসের রত্নগুলো। '৮১ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় "পল্লব" বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণীর নাসরুল হামিদ এবং অষ্টম শ্রেণীর আসাদুল আসগার চারুকলায় শ্রেষ্ঠ শিল্পী নির্বাচিত হন। আসাদুল আসগার কারুকলাতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাছাড়া বড়দের শাখায় 'ইনডোর গেমসে" শেখ হাসান তওফিক শ্রেষ্ঠ টেবিল টেনিস খেলোয়াড় হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। শুধু স্কুল গণ্ডিতেই নয়, জাতীয় পর্যায়েও আমাদের ছাত্রাবাসের ছেলেদের কৃতিত্ব স্বীকৃত। এই স্কুল থেকে ফজলুল হক ছাত্রাবাসের দু'জন ছাত্র, নাসরুল হামিদ এবং সারোয়ার হোসেন '৮০ যুব হকি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। তারা ঢাকার প্রথম বিভাগ হকিতে প্রথম শ্রেণীর একটি দলেও নিয়মিত খেলে থাকেন।

প্রতিযোগিতায়ও আমাদের ছেলেরা যথেষ্ট সম্মান অর্জন করেছে। গত বৎসর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার গ্রুপে মোঃ আবু হোসেন চৌধুরী (ডন) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এক, '৮০ ও '৮১ তে সর্বাধিক পুরস্কারের অধিকারী এবং ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপে ফখরুল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। বিভিন্ন খেলাধূলাতেও আমাদের ছাত্রাবাসের নাসরুল হামিদ, সারোয়ার হোসেন, মেহেবুব হোসেন, জুলফিকার আলী রাজ, মেহেদী আবু হাসান, আজিজ, মহিম হাসান এবং আরো অনেকে স্কুল টিমে নিয়মিত খেলেন। স্কুল টিমের ফুটবলে ছয়জন, হকিতে নয় জন, ক্রিকেটে আটজন, বাস্কেট বলে সাতজন এবং ভলিবলের ছয়জন খেলোয়াড় আমাদের ছাত্রাবাসের ছাত্র। এ ছাড়া আমাদেরই এক ভাই দশম শ্রেণীর বায়জিদ খুরশিদ রিয়াজ এবং একাদশ শ্রেণীর এ. কে. এম ছালেক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ব্যক্তিগত পর্যায়েই আমাদের গৌরব সীমাবদ্ধ নয়। সমষ্টিগতভাবে আন্তঃছাত্রাবাস প্রতিযোগিতায় '৭৯ এবং '৮১-তে আমাদের হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। '৮০-এর ফলাফল ছিল অঘোষিত। '৮১-এর প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

১।	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৩
২।	ক্বিরাত	৩
৩।	আজান	১
৪।	এ্যাকাডেমিক্স	৩
৫।	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	১
		১১

অনেক ঘাতপ্রতিঘাত অতিক্রম করে '৮০ ও '৮১ সাল পেরিয়ে এসেছি। এ দুটি বছরে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি, অনেক কিছু পেয়েছি। একদল ছাত্র উচ্চমাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে বৃহত্তর জীবনের লক্ষ্যে আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তেমনি জুনিয়ার শাখা থেকে আসা অনেক ছোট ভাইদের পেয়েছি আমরা। কিন্তু এতো পাওয়া-না-পাওয়ার মাঝেও আজ আমরা অনুভব করছি দু'জন বিদায়ী স্যারের কথা। '৮১-র দ্বিতীয় পর্বে আমাদের প্রিয় জনাব ওমর আলী স্যার এবং '৮২-র প্রথম পর্বে জনাব জালাল উদ্দীন স্যার তাঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। হৃদয়বিদারক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে প্রিয় হাউস-মাষ্টার জনাব ওমর আলী স্যার বিদায় নিলেন এবং আন্তরিকতার মধ্যদিয়ে জনাব এ. বি. এম. আবদুল মান্নান স্যার আমাদের মাঝে এলেন। হাউস টিউটর জনাব জালালউদ্দীন স্যারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জনার কাজী আতিকুর রহমান স্যার। কিন্তু আজও এ দুটি বিয়োগ ব্যথা আমাদের মনে বারবার বেজে ওঠে।

বর্তমানে আমরা ৯২ জন ছাত্র এই ছাত্রাবাসে আছি। বছরান্তে একদল নতুন কুঁড়ি আসছে, আর একদল তাদের জায়গা করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই নিয়মেই আমরা চলছি। আর আমাদের এই চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবেন বাংলার বাঘ, জনদরদী নিবেদিত প্রাণ শেরে বাংলা এ. কে. এম. ফজলুল হক। তাঁর জীবনাদর্শই হবে আমাদের আদর্শ, যার মাধ্যমে আমাদের জীবন হবে অর্থবহ, সুন্দর এবং সার্থক।

সংস্কৃতি সপ্তাহ ১৯৮১

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলে সহপাঠ্যক্রম হিসেবে সংস্কৃতি সপ্তাহের সংযোজন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ১৯৮১-র ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বটবৃক্ষের মনোরম বেদীমূলে দীর্ঘ ছয়দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ প্রসঙ্গে বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে, শুধু সংস্কৃতি সপ্তাহের সূচনাতে নয়, আজন্ম উপেক্ষিত এই বটগাছের ছায়াসুনিবিড় আশ্রয়কে এমন সুচারুভাবে কাজে লাগাবার কৃতিত্ব ও প্রশংসা যাঁর সর্বাগ্রে প্রাপ্য তিনি আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ জনাব লুৎফুল হায়দার চৌধুরী।

বস্তুত, ১৯৮০ সনের শেষের দিকে তিনি যখন এ স্কুলের কর্ণধার হয়ে এলেন, তখন নানা অবধারিত কারণেই এখানকার সামগ্রিক পরিমণ্ডলে এক নৈরাজ্যকর ভয়াভয় শূন্যতা বিরাজ করছিল। বিগত বছরের কিছু দুঃসহ স্মৃতির পীড়নে তখন অহরহ ক্লান্ত হচ্ছিল স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক ও ছাত্রের বছরের পরিচ্ছন্ন রুচি এবং সুতীক্ষ্ণ বিবেকবোধ। হতাশা ও সংশয়ের এই দোদুল্যমান সন্ধিক্ষণে তিনি যেন এলেন হঠাৎ আলোর মশাল হাতে নিয়ে। বললেন, এখানে আলো নেই। আলো দাও।

আমাদের সংস্কৃতি সপ্তাহটি ছিল যেন সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সহসা উচ্চকিত এক ঝাঁক সোনালী ডানার চিল। শিশুমনের সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষ ঘটাতে কিশোর মনের স্ফূর্তিকে কথায় ও গানে ধরে রাখতে, তরুণ মনের আবেগ ও অস্থিরতাকে সুন্দরের সাধনায় নিয়োজিত রাখতে, এই সংস্কৃতি সপ্তাহের অবদান ও তাৎপর্য ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলতে গেলে সংস্কৃতি সপ্তাহের উৎসবমুখর ও আনন্দঘন অমলিন পরিবেশে অলক্ষ্যে মুছে গেছে অতীতের গ্লানি এবং সেখানে সঙ্গোপনে অঙ্কুরিত আজ ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সফল সোনালী বৃক্ষের বীজ। আমাদের এই মহতী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন এদেশের প্রখ্যাত কবি বেগম সুফিয়া কামাল এবং সভাপতিত্ব করেন মাননীয় অধ্যক্ষ লুৎফুল হায়দার চৌধুরী। প্রধান অতিথি তাঁর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং পরে তিনি ঘুরে ঘুরে চারু ও কারুকলার প্রদর্শনী দেখেন। এ স্কুলের ছেলেদের হাতে তৈরী নানারকম শিল্পকলা ও চিত্রের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে এ স্কুলের ছেলেদেরকে লেখাপড়ার সাথে সাথে সহপাঠ্যক্রমের অন্যান্য বিষয়ে অংশগ্রহণ করে নিজেদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের ব্যাপারে সচেষ্ট ও উদ্যোগী হবার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে আগমন করেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় জনশিক্ষা পরিচালক ডঃ হাফেজ আহমেদ। তিনি বিজয়ী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। তিনি তাঁর ভাষণে এ স্কুলের ছাত্রদেরকে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আদর্শ

স্থাপনের নজীর সৃষ্টি করতে বলেন। আমাদের অধ্যক্ষ সাহেবও অনুরূপ বক্তব্য রাখেন। সংস্কৃতি সপ্তাহ উপলক্ষে এ স্কুলের তরুণ শিশু সকল ছাত্রের মধ্যে যে অভূতপূর্ব প্রাণ-সঞ্চার ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে--তা তিনি গভীর আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করেন এবং ভবিষ্যতেও তা বজায় থাকবে, এ আশা পোষণ করেন। পরিশেষে এই অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের জন্য তিনি সংস্কৃতি সপ্তাহ কমিটির সকল সদস্য, অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ এবং ছাত্রদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নীচে সংস্কৃতি সপ্তাহের কর্মসূচীর একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হোল। এ স্কুলের প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রকে মোট তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। যেমন ঃ

অঙ্কুর— ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী
কিশলয়---৫ম থেকে ৮ম শ্রেণী
পল্লব— ৯ম থেকে ১২শ শ্রেণী

অঙ্কুর গ্রুপে প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল নাত ও হামদ, দেশাত্মবোধক গান' ছড়াগান, আবৃত্তি, নির্ধারিত বক্তৃতা এবং গল্প বলা। এই গ্রুপে গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান।

কিশলয় ও পল্লব গ্রুপে প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো ছিল দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, পল্লীগীতি বাংলা ও ইংরেজী আবৃত্তি, বাংলা ও ইংরেজী নির্ধারিত বক্তৃতা, বিতর্ক, স্বরচিত গল্প, ও প্রবন্ধ, অবিরাম গল্প বলা, উপস্থিত বক্তৃতা এবং অভিনয় ও কৌতুক ইত্যাদি; বিশলয় গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব লাভ করে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ আশফাক চৌধুরী এবং পল্লব গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র নুসরাত জামিল আজহার।

সংস্কৃতি সপ্তাহের একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল চারু ও কারুকলার প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে চারুকলা শিক্ষক জনাব আমিনুল ইসলাম ও কারুকলার শিক্ষক জনাব কে. কে. সরকার। উল্লিখিত তিন গ্রুপের ছেলেদের চিত্র ও কারুশিল্পে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রদর্শনীর বিভিন্ন কক্ষ। এই প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হয় একাদশ শ্রেণীর ছাত্র নাসরুল হামিদ এবং শ্রেষ্ঠ কারু শিল্পী হিসেবে পুরস্কার লাভ করে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র আসাদুল আসগার ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র আমিনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিল দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র জাহাঙ্গীর হুসেন ও নুসরত জামিল আজহার।

বিচারকমন্ডলীর আসন পর্যায়ক্রমে অলংকৃত করেন এখানকার শিক্ষকমণ্ডলী।

স্কোরশীট তৈরী এবং প্রাইজ প্যাকিংয়ের গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্বে ছিলেন জনাব আতাউল হক, জনাব সাব্বির চৌধুরী, জনাব আব্দুল জব্বার ও জনাব শীলব্রত চৌধুরী। নিমন্ত্রিত অতিথিদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও ঠিকমত বসাবার দায়িত্বে ছিলেন বিভিন্ন হাউসের হাউস মাষ্টার্স, হাউস টিউটর্স, শ্রেণীশিক্ষক, শরীর চর্চা বিভাগের শিক্ষকগণ এবং বিভিন্ন হাউসের প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ।

সংস্কৃতি সপ্তাহের যাবতীয় প্রোগ্রাম অক্লান্তভাবে টাইপ করেছেন এবং ষ্টেনসিল কেটেছেন সদাপ্রসন্ন আব্দুল বাতেন ও নূর মুহাম্মদ।

সংস্কৃতি সপ্তাহের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সুপরিকল্পিত ভাবে পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মিসেস দিলরওশন ইসলাম। এ ব্যাপারে তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন কমিটির সদস্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক, জনাব প্রলয়কুমার গুহ নিয়োগী, জনাব শীলব্রত চৌধুরী, মিসেস শামিম রহমান, জনাব আমিনুল ইসলাম, জনাব কে. কে. সরকার ও জনাব শহীদুল ইসলাম।

মডেল স্কুলের ইতিহাসে সংস্কৃতি সপ্তাহের সূচনা এই প্রথম হলেও তা কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং এ স্কুলের সকল শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতায় উপস্থিত সকলের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়। ভবিষ্যতেও প্রতি বৎসর এই সংস্কৃতি সপ্তাহের শুভ জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং ক্রমশঃ তা আরও তাৎপর্যবাহী এবং হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস আজ আমাদের সকলেরই।

ভিক্ষা না করে যে নিজের গতর খাটিয়ে জীবিকা উপার্জন করে, আল্লাহ্ তার প্রতি সদয় হন।

—আল-হাদিস

শোক সংবাদ

২৭শে মার্চ। সকাল সাড়ে ন'টা। সূর্যকরোজ্জ্বল ছায়া সুনিবিড় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ অগণিত শিশু-কিশোরদের কলকাকলিতে মুখরিত। রোজকার মতো শিক্ষক-শিক্ষিকা সেদিনও পাঠদানে রত, ছাত্ররা অধ্যয়নে নিমগ্ন, কর্মচারীরা কর্মব্যস্ত 'কোথাও নেই ছন্দ পতন।' মুহূর্তে সুশৃংখল বিদ্যালয় জীবনে এমন আকস্মিকভাবে ছন্দ পতন ঘটবে কেউ ভাবেনি, ভাবতে পারেনি। খেলার মাঠে পি, টি শিক্ষক ধীরে ধীরে ঢলে পড়লেন মাটিতে। শিক্ষার্থীরা ভাবল এটাও একটা নতুন শারিরীক কসরত। ভুল ভাঙ্গল, জড় হল অগণিত ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী। নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করলেন সবার প্রিয় সালাম ভাই (ইন্নালিল্লাহে ------ রাজেউন)। দাবানলের মত দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা স্কুলে। স্কুলের প্রাচীর পেরিয়ে সমস্ত রাজধানীতে; সালাম ভাই নেই--নেই আমাদের সবার প্রিয় সালাম ভাই। মর্মান্তিক শোকের কালো ছায়া অকালে নেমে এল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। শোকে পাথর সালাম পরিবার, স্বজন-পরিজন, সহকর্মী, অগণিত বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ।

ক্রীড়া শিক্ষক মরহুম আবদুস সালাম

মরহুম আবদুস সালামের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী শোক পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে কুলখানি, মিলাদ মহফিল, শোকসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, ছাত্রাবাস অঙ্গনে।

মরহুম আবদুস সালাম ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী ১৯৮০ সালে ২৭শে মার্চের বাসন্তী সন্ধ্যায় বংশালে পারিবারিক গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন। পশ্চাতে রেখে যান ৪৫ বছরের স্বল্পপরিসর জীবনের বিরাট কর্মকাণ্ডের সুপরিসর রেকর্ড। তিনি ঢাকা কলেজ ও সিন্ধু মুসলিম কলেজে পড়াশুনা করেন। ছাত্রজীবনে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট খেলায় অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টিমের নেতৃত্ব দেন। বিদ্যালয়ের জন্ম লগ্ন থেকে প্রায় ২০ বছর কাল এই বিদ্যালয়ে ক্রীড়া শিক্ষকের দায়িত্ব নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে পালন করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সেনা-বাহিনী ও অন্যান্য জাতীয় হকি ও ক্রিকেট টিমের কোচের দায়িত্ব প্রশংসার সাথে পালন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব স্পোর্টস, পাতিয়ালা, ইণ্ডিয়া থেকে হকি কোচিং ডিপ্লোমা লাভ করেন। তারপর বাংলাদেশ জাতীয় হকি কোচরূপে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সর্বশেষ সৃষ্টি হল প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা হকি টিম গঠন। তাঁর নিরলস শ্রম ও নৈপুণ্যে অতি অল্প সময়ে উক্ত টিম স্বার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মরহুম সালাম ভাই ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি কর্তৃক হকির সেরা সংগঠক হিসেবে পুরস্কৃত হন।

মরহুম আবদুস সালামের সম্মানার্থে তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রবৃন্দ প্রথমে প্রবর্তন করে 'সালাম স্মৃতি ক্রিকেট কাপ।' পরবর্তীতে ফুটবল ও হকিতেও 'সালাম স্মৃতি কাপ' প্রবর্তিত হয়। খেলাধূলার প্রতি যার ছিল দুর্বার আকর্ষণ, খেলাধূলার কলা-কৌশল শেখানো যার ছিল শখ, সেই মহান ক্রীড়া শিক্ষক মরহুম সালাম ভাইয়ের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

●

হযরত (সঃ) বলেছেন শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকোবার আগেই তার মজুরী শোধ করে দাও।

—আল-হাদিস

শোক সংবাদ

সালাম ভাইকে হারানোর ব্যাথা ভুলতে না ভুলতে আবার শোকের ছায়া নেমে এল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। সেদিন ছুটির শেষে ছাত্রাবাসে ফিরে এসে শুনলাম ২২শে ডিসেম্বর (১৯৮১) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক জনাব আমিনুল ইসলাম (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন)। হাউজে ফেরার সকল উল্লাস মুহূর্তে নিভে গেল। আমরা শোকাভিভূত হয়ে পড়লাম। নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম সবাই—স্যারকে শেষবারের মত আমরা কেউ দেখারও সুযোগ পেলাম না। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে যেন এই নিরহঙ্কার, নিরলস, আত্মভোলা, স্বল্পবাক মানুষটি অসীমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

চারু ও কারু শিক্ষক মরহুম আমিনুল ইসলাম

মরহুম আমিনুল ইসলাম ছিলেন আমাদের বিদ্যালয়ের আর্টের লেকচারার। ১৯২৯ সালে তিনি বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি S. M. I. Academy থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। পরে তিনি গভঃ কলেজ অব আর্ট এণ্ড ক্র্যাফ্‌ট, কলকাতা থেকে Fine Arts--এ ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের ড্রয়িং মাষ্টার ছিলেন এবং জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ, রংপুরে ড্রইং মাষ্টার হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি সেন্ট্রাল রেসিডেনসিয়েল মডেল স্কুলের সহকারী শিক্ষক (কলা) হিসেবে যোগদান করেন। জীবনের অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত তিনি আমাদের স্কুলের সাথে

ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং আপনজনের মতো পাশে থেকে আমাদের অঙ্কন ও চিত্রকলায় শিক্ষাদান করেছেন। তাঁরই আন্তরিক অনুপ্রেরণায় এ স্কুলের ছাত্রেরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর বেশে ফিরেছে। তাঁর সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ 'আমিনুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাঁর স্মৃতিকে চির অম্লান রাখার জন্য।

আমরা আজ ভক্তি অবনত চিত্তে সর্বান্তঃকরণে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শোক সংবাদে ইতি টানছি।

●

ষাট বছরের এবাদতের চেয়েও যে চুপ করে থাকে তার পদমর্যদা উচ্চতর।

—আল-হাদিস

বিদ্যালয় সংবাদ

১৯৮০ সালে ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় যারা সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে বিদ্যালয়ের মুখোজ্জ্বল করেছেঃ

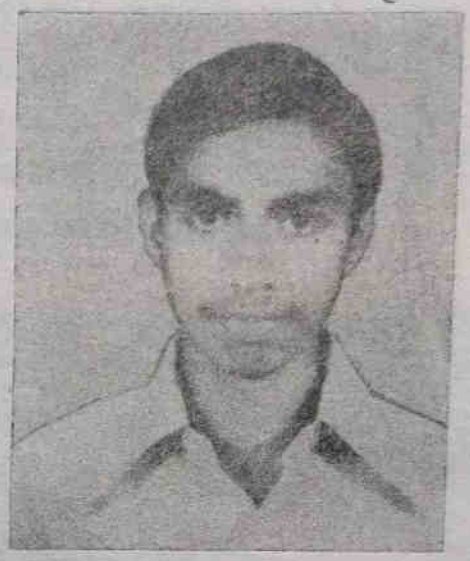

সুলতান আহমদ, ২৬২৯
প্রথম স্থান অধিকারী

মশিউর রহমান, ২২৬৯
পঞ্চম স্থান

প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা, ২৬১৫
সপ্তম স্থান

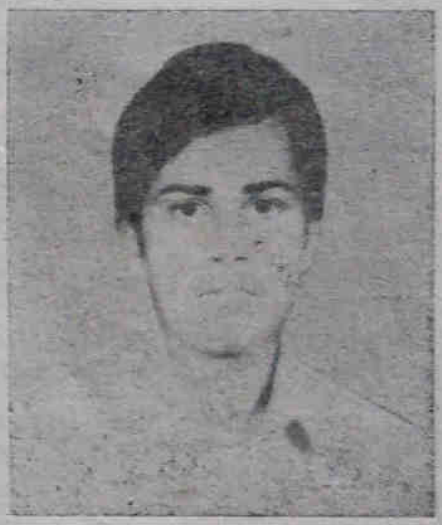

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র আচার্য, ২৬০৮
সপ্তদশ স্থান

বিরুপাক্ষ পাল, ২৬০৯
অষ্টম স্থান (মানবিক বিভাগ)

১৯৮১ সালে যারা ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে আমাদের বিদ্যালয়ের সুমহান ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখেছে ঃ

মুহম্মদ খালেদুল ইসলাম, ২৪৪৪
চতুর্থ স্থান

মোঃ শওকত বারী, ২৪৪৯
একাদশ স্থান

আ.কা.ম. শাহাদৎ হোসাইন, ২৭৮৬
ষোড়শ স্থান

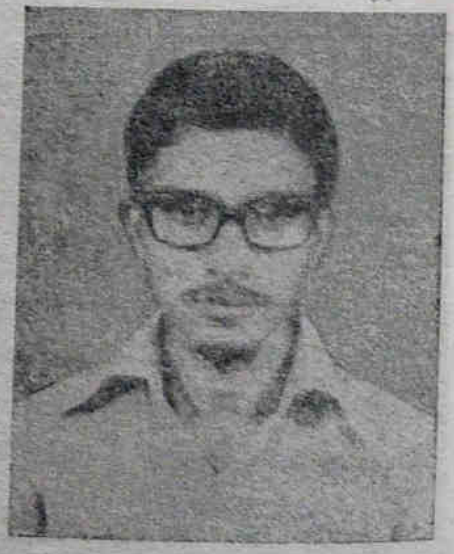

মোঃ শিহাব খান, ২৭৭৬
ষষ্ঠ স্থান (মানবিক বিভাগ)

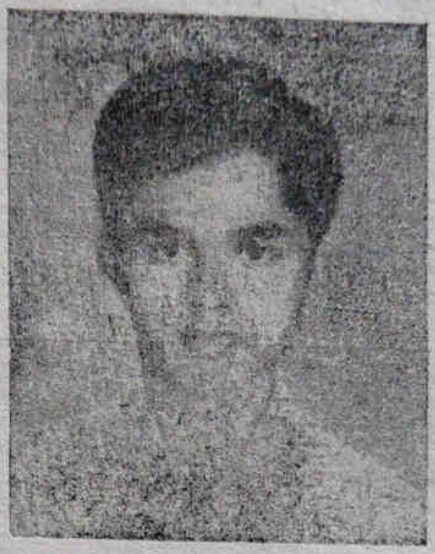

আবুল কাসেম মোঃ সালেক, ২৩০৬
পঞ্চম স্থান

১৯৮১ সালে ঢাকা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে বিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

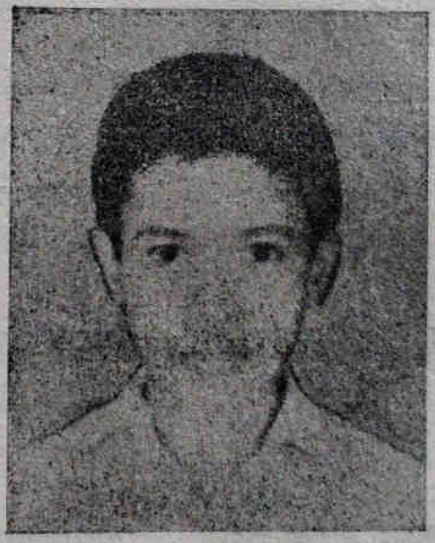

কাজী মাহমুদুল হাসান, ২৪৪৪

১৯৮১ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে নবম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

শুধু বোর্ডের পরীক্ষাতেই নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতাতেও আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। দশম শ্রেণীর (বিজ্ঞান) ছাত্র স্কুল নং ১৬৪৬ বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ রচনা প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। নীচের তালিকা বায়জীদ খুরশীদের প্রতিভার নিদর্শন ঃ

ক্রমিক নং	সাল	রচনা প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাদের নাম	রচনার বিষয়	বায়জীদ খুরশীদের স্থান
১।	১৯৭৮	বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমী	'সঞ্চয়ীরাই স্বনির্ভর'	প্রথম
২।	১৯৭৯	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	'আমার দেশের দর্শনীয় স্থান'	দ্বিতীয়
৩।	১৯৮০	বাংলাদেশ পাখি সংরক্ষণ সমিতি	'বাংলাদেশের সুন্দর পাখি'	প্রথম
৪।	১৯৮০	বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স সমিতি	'ছাত্র জীবন ও সঞ্চয়'	প্রথম
৫।	১৯৮১	বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি	'রেডক্রস সবার জন্য, সবার সাথে'	প্রথম
৬।	১৯৮১	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	'স্বনির্ভরতাই জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি'	তৃতীয়
৭।	১৯৮১	রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল ঢাকা	'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা'	প্রথম

একাদশ শ্রেণীর (বিজ্ঞান বিভাগ) কৃতিছাত্র স্কুল নং ২৩০৬ এ. কে. এম. সালেক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখেছে। নীচে এ. কে. এম. সালেকের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়া হ'ল ঃ

ক্রমিক নং	সাল	রচনা প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাদের নাম	রচনার বিষয়	এ. কে. এম. সালেকের স্থান
১।	১৯৮১	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	স্বনির্ভরতাই জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি	প্রথম
২।	১৯৮১	কারিতাস বাংলাদেশ	পঙ্গুলোকদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব	প্রথম
৩।	১৯৮২	হাইকোর্ট মাজার কমিটি	সমাজ সংস্কারক হযরত মোহাম্মদ (সঃ)	প্রথম
৪।	১৯৮২	রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা	ইসলামী আত্মনির্ভর-শীলতা	দ্বিতীয়
৫।	১৯৮২	রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা	বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে একুশে ফেব্রুয়ারীর ভূমিকা	প্রথম

অধ্যক্ষের ভাষণ

ঊনবিংশ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পঠিত

মাননীয় প্রধান অতিথি,
সম্মানিত অভিভাবক-অভিভাবিকাবৃন্দ
ও সমবেত সুধীমণ্ডলী,

আস্‌সালামো আলায়কুম,

ফাল্গুনের এই পড়ন্ত বেলায় মনোরম অপরাহ্নে ঢাকা রেসিয়েন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজের ঊনবিংশতিতম অভিভাবক দিবস ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কষ্ট স্বীকার করে উপস্থিত হয়ে আমাদের উৎসাহিত করার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আমাদের আজকের প্রধান অতিথি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব কামালউদ্দিন হোসেনকে যিনি তাঁর মূল্যবান সময়ের একটি অংশ ব্যয় করে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে আমাদের সকলকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কিছু সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর এসব বক্তব্য ও অভিমত আমাদের বর্তমান দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমস্যা সংকুল পরিবেশে একটি স্বস্তির ভাব সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে এবং আমাদের চিন্তার রাজ্যে বিভ্রান্তির নিরসন কল্পে পথ নির্দেশকরূপে আমাদেরকে উপকৃত করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সুধীমণ্ডলী, আমি আমার বক্তব্য পেশ করার পূর্বে দুঃখ ভারাক্রান্তচিত্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের সহকর্মী প্রবীণ শিক্ষক মরহুম আমিনুল ইসলামকে স্মরণ করছি। তিনি এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে শিল্পকলা বিষয়ে অধ্যাপনা ও নানাবিধ কার্যক্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমবৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। জনাব আমিনুল ইসলাম ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৮১, তারিখে আমাদের ছেড়ে চলে যান।

সুধীমণ্ডলী, দেশে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কার্যকরভাবে অংশ গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জনগণকে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ জন্যে প্রাথমিক ও

গণশিক্ষা পরিদপ্তর নামে একটি পৃথক পরিদপ্তর খোলা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মানোন্নয়নের জন্যে স্থাপিত হয়েছে শিক্ষা পরিদর্শন পরিদপ্তর। একটা স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপযোগী পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম প্রণয়নের উদ্দেশ্যে খোলা হয়েছে পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম কেন্দ্র। কিন্তু এ সব কার্যক্রমের সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়ন কেবল সরকারের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে শিক্ষকদের কর্মনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এ কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের জন্যে।

সুধীবৃন্দ, এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ অপরিহার্য বলে মনে করি। আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, নানা প্রকার অশুভ বহিঃপ্রভাবের ফলে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আজ ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে। এতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। আমাদের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত সম্পর্কে এ কারণে আমরা স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। এ বিষয়ে আমরা কোন ক্রমেই উদাসীন ও নির্বিকার থাকতে পারি না। দেশের বুদ্ধিজীবি, শিক্ষাবিদ সকলকে এ সংকটাপন্ন পরিস্থিতির কথা ভাবতে হবে এবং আমরা এ পরিস্থিতি থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি সে সম্পর্কে সঠিক পথ নির্দেশ দিতে হবে।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী অনন্য আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমাদের বিদ্যালয়টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর অনুষঙ্গী বিষয়াদির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে এখানকার শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ মানুষরূপে এবং সুনাগরিক করে গড়ে তোলা, যাতে অনাগত দিনগুলোতে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা উপযুক্ত নেতৃত্ব দান করতে পারে। এখানে শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যপুস্তক-লব্ধ জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, অভিনয়, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সখ, প্রভৃতি পাঠ্যক্রম অনুষঙ্গী বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভা ও সুকুমার বৃত্তিগুলোর সুষ্ঠু বিকাশের ব্যবস্থা রয়েছে।

আমাদের ছাত্রদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা উজ্জীবিত করার জন্যে বিদ্যালয়ের বার্ষিক নিয়মিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচী আওতায় এ বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্কুল গৃহে চারু ও কারুকলা প্রদর্শনী এবং বিদ্যালয় চত্বরে বটবৃক্ষের মনোরম পাদমূলে বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জিত চিত্তাকর্ষক পরিবেশে দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত ১২টি শ্রেণীর প্রতিযোগী ছাত্ররা--অংকুর, কিশলয় ও পল্লব--এ তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে হামদ ও নাত, কিরাত, বক্তৃতা, বিতর্ক, সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয়, গানশুনে ছবি আঁকা কৌতুক, ছড়াগান, প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও আপন বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার প্রয়াস পায়। প্রতিযোগিতার শেষ দিনে সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সম্মানপত্র বিতরণ করা হয়।

এখানে আবাসিক ছাত্রদের প্রাতঃকালীন শরীর চর্চা ও বৈকালিক খেলাধুলা বাধ্যতামূলক। এ বছর ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী স্কুলের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়ায় বর্ণাঢ্য, মনোরম ও চিত্তাকর্ষক সাজসজ্জাপূর্ণ পরিবেশে বিদ্যালয়ের দ্বাবিংশতিতম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্ররা বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতায় ব্যাপকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত

অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের নিয়মিত শরীর চর্চা ও ক্রীড়ানুশীলনের স্বাক্ষর রাখে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী ছাত্রদের মাঝে পুরস্কার ও সম্মানপত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এ বছর আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমাদের বিদ্যালয় জোনাল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং ঢাকা মহানগরী পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

আমাদের এ আবাসিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত এবং পারিবারিক অন্তরঙ্গতাপূর্ণ মায়াময় একটি পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'হাউস' নামে অভিহিত পাঁচটি ছাত্রবাসে পাঁচ শতাধিক ছাত্র বসবাস করে। লেখাপড়া, ক্রীড়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বহিরাঙ্গণ ও অন্তরাঙ্গণ খেলাধুলা আজান ও কিরাত, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা প্রভৃতি বিষয়ে সারা বছর নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতাসমূহে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে হাউসগুলোতে ছাত্ররা অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ও আনন্দমুখর থাকে।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতি শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক ছাত্রশিক্ষক সমাবেশে এখানকার একটি বিশেষ আকর্ষণ। সমাবেশে ছাত্রদের জ্ঞাতব্য বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংক্ষিপ্ত সংবাদ, ক্রীড়া জগতের খবর, বিদ্যালয়ের স্থানীয় সংবাদ এবং সাপ্তাহিক আন্তঃশ্রেণী ও আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতাসমূহের ফলাফল পরিবেশিত হয়। কলেজ ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ব্যাণ্ডের তালে তালে ছাত্রদের আকর্ষণীয় কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে অধ্যক্ষের পক্ষ থেকে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী ও উপদেশ প্রদান করা হয়।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত সুযোগ্য শিক্ষকদের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে এখানে রয়েছে একটি সুসজ্জিত আকর্ষণীয় স্কুল ব্যাণ্ড ও একটি জুনিয়র রেডক্রস দল। এ ছাড়া আরও রয়েছে বাংলাদেশ বয়স্কাউট সমিতির অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ স্কাউটস্ ঢাকা-২ লোকাল স্কাউটস-এর অন্তর্ভুক্ত সুসজ্জিত দুটি কাব প্যাক ও দুটি স্কাউট দল। একটা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী এরা সকলে নিয়মিত প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে।

বার্ষিক তাঁবুবাস এ বিদ্যালয়ের সহপাঠ্যক্রম কর্মসূচীর অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে বসবাস করে শহুরে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হলেও অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি গ্রাম বাংলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পল্লী-বাসীর প্রাত্যহিক আকৃত্রিম জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ এবং কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে কঠিন বাস্তব জীবনের খানিকটা স্বাদ গ্রহণে ছাত্রদের সহায়তা দান এ বার্ষিক তাঁবুবাসের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। খোলা আকাশের নীচে তাঁবুর মধ্যে বাস করা, নিজহাতে বাসনপত্র মাজা-ধোয়া, রান্নাবান্না করা, তাঁবুর চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্বনির্ভরতার সপ্তাহব্যাপী অনুশীলন তাঁবুবাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁবুবাসী ছাত্রদের দেহ মনের সুস্থতা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে তাঁবু এলাকায় প্রাতঃকালীন শরীর চর্চা ও বৈকালিক খেলাধুলা এবং সন্ধ্যার পর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে চক্রাকারে বসে আনন্দমুখর তাঁবুজলসার আয়োজন সত্যই এক অনির্বচনীয় আকর্ষণ। এইবারের তাঁবুবাস ঢাকার অদূরে মৌচাকে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে সপ্তম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চারশত ছাত্র এবং পঞ্চাশজন শিক্ষক ও কর্মচারী যোগদান করেন। এবারের তাঁবুবাস সর্বতভাবে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ছাত্রদের মাঝে দেশাত্মবোধ, ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি ও সামাজিক সাংস্কৃতিক চেতনা উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি নিয়মিতভাবে উদ্‌যাপিত হয়। এবারও আমরা বাৎসরিক মিলাদ সহ তিনবার মিলাদের আয়োজন করি

প্রতি বছর ছাত্রদের মধ্য থেকে স্কুলে একটি কেন্দ্রীয় প্রিফেকটোরিয়াল বোর্ড এবং প্রতিটি হাউসে একটি করে হাউস প্রিফেকটোরিয়াল বোর্ড গঠনের মাধ্যমে এখানে ছাত্রদের স্বায়ত্বশাসন ও নেতৃত্ব বিকাশের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে। ছাত্রদের একান্তভাবে নিজেস্ব সমস্যাদির সমাধান এবং বিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনে প্রিফেক-টোরিয়াল বোর্ডগুলো প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিদ্যালয়ে আগমনের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রেও আমাদের ছেলেরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও কৃতিত্ব অর্জন করে আসছে।

ঢাকা বোর্ডের গত দশ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট ('ক' ও 'খ') এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গত বছর উক্ত বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় অংশগ্রহণকারী মোট ৪৯ জন ছাত্রের মধ্যে প্রথম বিভাগে ৪০ জনসহ ৪৯ জন ছাত্রই উত্তীর্ণ হয়। সাফল্যের হার শতকরা ১০০। বিভিন্ন বিষয়ে তারা মোট ৩৯টি লেটার অর্জন করে। ১৩ জন ছাত্র তারকা লাভ করে। বিজ্ঞান শাখার খালেদুল ইসলাম সম্মিলিত মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে। অপর দু'জন ছাত্র শওকত বারী ও এ, কে, এম, শাহাদত হোসেন যথাক্রমে একাদশ ও ষোড়শ স্থান অধিকার করে। আর একজন ছাত্র শিহাব খান মানবিক শাখায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

একই বছর এস, এস, সি, পরীক্ষায় বিজ্ঞান মানবিক শাখায় এ বিদ্যালয় থেকে মোট ৬০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৭ জনসহ ৫০ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। সাফল্যের হার শতকরা ৮৩'৩৩। বিভিন্ন বিষয়ে অর্জিত লেটারের সংখ্যা ৫১। ৫ জন ছাত্র তারকা লাভ করে। বিজ্ঞান শাখার এ. কে. এম. সালেক সম্মিলিত মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে। অপর একজন ছাত্র কাজী মাহমুদুল হাসান মানবিক শাখায় নবম স্থান অধিকার করে।

১৯৬০ সালে স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বিগত ২২ বছরে এ বিদ্যালয়টির ছাত্রসংখ্যা ৩৪০ থেকে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৯৫০ জনে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু সে অনুপাতে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা, তাঁদের বাসস্থান ও ছাত্রাবাস বৃদ্ধি পায়নি। বাসস্থান অভাবে কিছু শিক্ষক ও কর্মচারীকে স্কুল প্রাঙ্গণের বাইরে বসবাস করতে হচ্ছে এবং ছাত্রদের একটি উল্লেখ-যোগ্য অংশ আজও অনাবাসিক থাকায় এ আবাসিক বিদ্যালয়টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাস্তবায়নের পথে সুসমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়াস নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

দেশের এ বিশিষ্ট আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের সুলভে এমন কি বিনাবেতনে অধ্যয়নের সুযোগ থাকায় প্রতি বছর বিভিন্ন শ্রেণীতে ছেলে ভর্তির জন্যে অভিভাবকদের অপরিসীম আগ্রহ ও অস্বাভাবিক ভীড় থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে এ বিদ্যালয়টির উপর

সমাজের চাপ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। কিন্তু একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে দুঃখজনক সীমাবদ্ধতার কারণে দেশ ও সমাজের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি, এ বিদ্যালয়টির প্রতি দেশবাসীর এ আগ্রহ ও প্রত্যাশা খুবই সঙ্গত।

এ দুঃখজনক সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে এ আবাসিক বিদ্যালয়টির সম্প্রসারণ। এ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে জুনিয়র স্কুল ভবনের উপর দ্বিতল নির্মাণ, ২ নং হাউসের দ্বিতলের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করা প্রায় একযুগ ধরে নির্মীয়মাণ মিলনায়তনের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করা, শিক্ষক-কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণ, একটি জামে মসজিদ নির্মাণ এবং ছাত্রদের খেলধুলার জন্য স্কুল প্রাঙ্গণে খেলার মাঠের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

উপরোক্ত সম্প্রসারণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অতীতে বিত্তবান জনহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ জনশিক্ষার সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। আমাদের দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিহাসে তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। অনুরূপ জনহিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সমাজের বিত্তবান বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ দেশের এ মহতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচীর বাস্তবায়নে উদার চিত্তে এগিয়ে এলে সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব হতে পারে এবং দেশবাসীর একটি ন্যায়সঙ্গত চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণ হয়।

আমাদের সদাশয় সরকার দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্নখাতে প্রয়োজনীয় অর্থও বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের এ অনন্য আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৫ সালে সরকার থেকে যে বার্ষিক পৌনঃপুনিক বরাদ্দ লাভ করে, ১৯৮২ সালে এসে এর পরিচালন ব্যয় বিভিন্ন খাতে বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও (পরিশিষ্ট 'গ') সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ একই রয়ে গেছে। ফলে, এ প্রতিষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এ পরিপ্রেক্ষিত বিভিন্নখাতে পরিচালন ব্যয়ের তুলনামূলক বৃদ্ধি অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানটির জন্য আনুপাতিক হারে পৌনঃপুনিক বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে সরকারের প্রতি বিশেষ আবেদন জানাই।

আবাসিক আদর্শ বিদ্যালয়টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্যে এখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে বিশেষ ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয় সে তুলনায় তাদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নিতান্তই অপ্রতুল ; এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের অন্যান্য সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষাও কম। ফলে, উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন তরুণ শিক্ষকদের অনেকেই উল্লেখিত সুযোগ-সুবিধার আকর্ষণে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। কাজেই, এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষকাবৃন্দের চাকুরীর শর্তাবলী ও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা যাতে আরও আকর্ষণীয় করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে আমি কর্তৃপক্ষের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

আজকের এ অনুষ্ঠানটি আয়োজনের পেছনে এ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও কর্মচারী যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণতা এবং নিরঙ্কুশ সহযোগিতা এ বিদ্যালয়টির উত্তরত্তর সাফল্যের পথে অব্যাহত অগ্রযাত্রা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

সমবেত সুধীবৃন্দ আপনাদের মূল্যবান সময়ের একটি অংশ ব্যয় করে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে আজকের এ অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্যে আপনাদের সকলকে আবার জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমার বিশ্বাস, আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করবেন।

মাননীয় প্রধান অতিথি, আপনার শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতিতে আমরা সকলে অত্যন্ত উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করছি। আপনার মূল্যবান উপদেশবাণী আমাদের ছাত্রদের চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়ক হবে এবং আমাদেরও কর্মের পথে প্রেরণা যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস। পরিশেষে আমি আপনাকে এবং উপস্থিত অভ্যাগতবৃন্দকে আর একবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

লুৎফুল হায়দার চৌধুরী
অধ্যক্ষ
রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ
ঢাকা-৭

৭ই মার্চ
১৯৮২

পরিশিষ্ট "ক"

রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা

ঢাকা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষাসমূহের ফলাফল

সন	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণের সংখ্যা			উত্তীর্ণের শতকরা হার	লেটারের সংখ্যা	মেধা তালিকায় প্রাপ্ত স্থান
		প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ			
১৯৭২	২৫	২০	৫	—	১০০	৩৯	একাদশ (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)
১৯৭৩	৩৮	২৪	১২	—	৯৫	৪৬	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম
১৯৭৪	৫১	১২	১৫	১৫	৮২	৩৪	দশম ও পঞ্চম (বিজ্ঞান) অষ্টম (মানবিক শাখায়)
১৯৭৫	৪৪	১৬	১৫	৮	৮৮·৬০	৩২	—
১৯৭৬	৪৫	১০	২১	২০	৯২·৭২	৩৫	—
১৯৭৭	৪৮	১৬	২৫	৪	৯৩·৭৫	৪৯	প্রথম (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)
১৯৭৮	৪৭	২৬	১৪	৭	১০০	৫৭	—
১৯৭৯	৫৩	২৪	২৩	৪	৯৬·২৩	৭১	ত্রয়োদশ (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)
১৯৮০	৪৯	২৪	২৩	২	১০০	৭১	—
১৯৮১	৬০	২৭	১৫	৮	৮৩·৩৩	৫১	পঞ্চম (সম্মিলিত মেধা তালিকায়) নবম মানবিক শাখায়

পরিশিষ্ট "খ"

রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা
ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষাসমূহের ফলাফল

সন	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণের সংখ্যা			উত্তীর্ণের শতকরা হার	লেটারের সংখ্যা	মেধা তালিকায় প্রাপ্ত স্থান
		প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ			
১৯৭২	৪০	২৭	১৩	—	১০০	১৬	—
১৯৭৩	৬২	২২	৩৮	১	৯৮·৩৮	৩	—
১৯৭৪	৪৯	১৬	১৭	১৪	৯৬	৬	প্রথম ও নবম (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)
১৯৭৫	৫৭	৬	২০	১৬	৭৩·৬৮	৬	তৃতীয় (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)
১৯৭৬	৪৭	১০	১৮	৬	৭২·৩৪	২	—
১৯৭৭	৩৭	২৭	৯	১	১০০	১৮	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ষষ্ঠ, সপ্তম, ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ স্থান এবং মানবিক শাখায় ষষ্ঠ স্থান।
১৯৭৮	৩৭	৩০	৪	২	৯৭		সম্মিলিত মেধা তালিকায় চতুর্থ ও নবম।
১৯৭৯	৪৮	৩৯	৯	—	১০০	৪২	সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ, দ্বাদশ ও দ্বাদশ এবং মানবিক শাখায় তৃতীয়।
১৯৮০	৫৯	৪৪	১৪	১	১০০	৬০	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম, ৫ম, ৭ম, ও ১৭শ। মানবিক শাখায় ৮ম।
১৯৮১	৪৯	৪০	৮	১	১০০	৩৯	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৪র্থ, ১১শ ও ১৬শ মানবিক শাখায় ষষ্ঠ।

গরিশিষ্ট 'গ'

রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা
(দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি খাতে ব্যয়ের বিবরণ)

ব্যয়ের খাত	১৯৭৫-৭৬	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
বিদ্যুৎ ও বাল্ব	৭৯,৫৩৯	৭৩,৭৮৩	৮৪,৮৬৭	১,০৪,১০৯	২,২৫,০০০	২,২২,০৫০
টেলিফোন	৮,১৮৭	৮,৬৯০	১২,০৭৭	১০,৪০১	১২,২৯৯	১০,৩৭৬
বাস রক্ষণাবেক্ষণ ও পেট্রোল	৬৪,০৩৯	৭২,৬৮০	১,১৫,২৭০	৯১,৩৪০	১,২৫,০০০	২,০৬,৯২৩
পৌর কর	৪,৯৮৯	৫,৬০৫	৪,৮৪৯	৪,৮৪৯	৭৩,৩৫৬	৭৩,৩৫৬
খাদ্য সামগ্রী	৮,৫০,৬২২	৯,০৩,৩৯০	১১,১২,১৩০	১৩,৩৫,৪৫৬	১৫,৭৭,৬০৮	১৯,৪৮,১৪৬
কর্মচারীর বেতন-ভাতা	৮,২৩,৭৪৯	৯,৬১,১৮২	১১,৯১,৩৮৯	১৫,৪৭,২৯৬	১৫,৫৫,২৯৬	১৫,৪৪,৭৯২
মোট	১৮,৩১,১২৫	২০,২৫,৩৩০	২৫,৩০,৫৮২	৩০,৯৩,৪৫১	৩৫,৬৮,৫৫৯	৪০,০৫,৬৪৩

সালতামামি

০ প্রতি সপ্তাহে শনিবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষকের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্কুল ব্যাণ্ডের বাজনার সঙ্গে জাতীয় পতাকার প্রতি অভিবাদন জানানোর পর ছাত্ররা ব্যাণ্ডের তালে তালে অত্যন্ত সুশৃংখল ও মনোজ্ঞ কুচ-কাওয়াজ প্রদর্শন করে। অতঃপর সাপ্তাহিক সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ, ক্রীড়া জগতের সংবাদ ও বিদ্যালয়ের সংবাদ পরিবেশন শেষে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ কিছু মূল্যবান উপদেশ বাণী প্রদান করেন।

০ ১৯৮১-৮২ সালে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনটি মিলাদ মহফিলের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে একটি ছিল এস, এস, সি, ও এইচ, এস, সি, পরীক্ষার্থীদের সাফল্য কামনা করে বিশেষ মুনাজাত।

০ ২৭-১-৮২ থেকে ১-২-৮২ পর্যন্ত ঢাকা থেকে ২৭ মাইল দূরে মৌচাকে অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্যাম্প। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ শিক্ষা পরিচালক জনাব এস, এ, সিদ্দিকী ক্যাম্প উদ্বোধন করেন।

০ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হিট অনুষ্ঠিত হয় ১৮-১-৮২ থেকে ২৫-১-৮২ পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৩-২-৮২ ও ১৪-২-৮২ তারিখে। উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিব ও বিদ্যালয়ের বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান জনাব কাজী ফজলুর রহমান এবং সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্য জনাব গাওসুল হোসেন।

০ ২১শে ফেব্রুয়ারী মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি তর্পণের উদ্দেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারী শেষ হয় বিদ্যালয়ের চারু ও কারুকলা প্রদর্শনী ও বার্ষিক সংস্কৃতি মেলা; উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসান এবং সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা সচিব ডক্টর আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন।

০ এ বছর ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয় অভিভাবক দিবস ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব কামাল উদ্দীন আহমেদ।

০ তিনজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ২৬ জন ছাত্র ৮-৩-৮২ থেকে ১৫-৩-৮২ পর্যন্ত চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই কক্সবাজার ও টেকনাফ অঞ্চলে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করে। অনুরূপভাবে ১৯৮২ সালের এস, এস, সি, পরীক্ষার্থীদের একটি দল

একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে উল্লেখিত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষা সফরে যায় ১১-৪-৮২ থেকে ১৯-৪-৮২ পর্যন্ত।

o এ বছর ৪ঠা এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় এস, এস, সি, ও এইচ, এস, সি, পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিব জনাব হেদায়েত আহমেদ।

o ১৯৮১-৮২ সালে নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী বিদ্যালয়ের আন্তঃহাউস বহিরাঙ্গন খেলাধূলা—ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল ও ক্রিকেট, এবং অন্তরাঙ্গন খেলাধূলা—দাবা, ক্যারম ও টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

o এ বছর মার্চে বিদ্যালয়ের পরলোকগত জনপ্রিয় শিক্ষক মরহুম আবদুস সালামের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত দ্বিতীয় সালাম স্মৃতি ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট '৮২ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের মোট ৬টি দল অংশ গ্রহণ করে। চ্যাম্পিয়ন হয় ৯ম শ্রেণী এবং রানার্স আপ ১০ম শ্রেণী। চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের শরীর শিক্ষা পরিচালক জনাব এম, বি, খান মজলিস। প্রথম সালাম স্মৃতি হকি টুর্ণামেন্ট-'৮২ অনুষ্ঠিত হয়, এ বছর এপ্রিলে। এতে দ্বাদশ শ্রেণী চ্যাম্পিয়ন এবং অষ্টম শ্রেণী রানার্স-আপ হয়। চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব জনাব হেদায়েতুল হক।

o ঢাকা বোর্ডের আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ১৯৮২ ঃ মোহাম্মদপুর জোনে অত্র বিদ্যালয় দলগত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং ঢাকা মহানগরী পর্যায়ে কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে।

o নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ফুটবল একাদশের সঙ্গে দুটি প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়— প্রথমটি ডকইয়ার্ড মাঠে এবং দ্বিতীয়টি আমাদের বিদ্যালয় মাঠে।
প্রথমটিতে আমাদের ছেলেরা হেরে গেলেও দ্বিতীয়টিতে ২—১ গোলে জয়লাভ করে।

o বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৯৮১ সালে জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে এবং বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

o আমাদের বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ সদস্য সম্বলিত সুসংগঠিত জুনিয়র রেডক্রস দল গত ২৭শে অক্টোবর (১৯৮১) লটারীর মাধ্যমে রেডক্রস তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি আয়োজিত রুট মার্চে অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে অংশ গ্রহণ করে। মনোরম পোশাকে সজ্জিত আমাদের স্কুল ব্যাণ্ডও তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করে অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।

o বিদ্যালয়ে দুটি করে সুসংগঠিত, সুসজ্জিত ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্কাউট ও কাবদল আছে। দ্বিতীয় বাংলাদেশ বয়স্কাউট জাম্বুরী উপলক্ষে আগত বেশ কিছু সংখ্যক স্কাউট ও স্কাউটারস ৬-১-৮১ থেকে ৮-১-৮১ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসে অবস্থান করে।

o বিগত ২৫শে ও ২৬শে মার্চ (১৯৮১) বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি আয়োজিত রুট মার্চে

অংশ গ্রহণের জন্যে এই বিদ্যালয়ে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ৮০০ জুনিয়র রেডক্রস সদস্য অংশ গ্রহণ করে। দিবাভাগে প্রায় ১৫০০ শত জুনিয়র রেডক্রস ছাত্র-ছাত্রী কুচকাওয়াজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

- আগাখান গোল্ড কাপ টুর্ণামেন্ট '৮১ উপলক্ষে আগত পাকিস্তান ইন্টার ন্যাশনাল এয়ার-লাইন্সের ফুটবল দল প্রত্যহ সকাল বেলা বিদ্যালয়ের প্রশস্ত ময়দানে অনুশীলনে অংশ গ্রহণ করে।
- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থার ঢাকা জোনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ২৮শে ও ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ এবং সংস্থার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ই ও ১৪ই মার্চ, ১৯৮২ আমদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্টসমূহ

- বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে পাঁচটি ছাত্রবাস অবস্থিত। এগুলো 'হাউস' নামে অভিহিত। পাঁচটি হাউসে প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' ছাত্র অবস্থান করে।
- এখানে ছাত্রদের জন্যে আউট ডোর ও ইনডোর চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বলিত ছোট্ট অথচ সুসজ্জিত হাসপাতাল আছে। উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ একজন ডাক্তারের অধীনে দুইজন ফার্মাসিস্ট ও একজন নার্সিং অর্ডারলী এই হাসপাতালে সর্বক্ষণ কর্মরত থাকে।
- এখানে বিদ্যালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বৈকালিক খেলাধুলায় আবাসিক ছাত্রদের অংশগ্রহণ বাধ্যতা-মূলক। ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেট, হকি প্রভৃতি বহিরাঙ্গন ও দাবা-ক্যারম, টেবিল-টেনিস, ইত্যাদি অন্তরাঙ্গন খেলাধুলার পর্যাপ্ত সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা রয়েছে।
- প্রত্যহ ভোর ছটায় প্রাতঃকালীন শরীরচর্চায় আবাসিক ছাত্রদের অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীরণে এক ঝাঁক ছাত্রের সুশৃংখল শরীরচর্চা অনুশীলন এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।
- শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পাঁচটি হাউসে আবাসিক ছাত্রদের প্রায় তিনঘন্টা ব্যাপী নৈশকালীন পাঠ্যাভাসের নিয়মিত কর্মসূচী রয়েছে। এ সময়ে ছাত্ররা পরবর্তী দিবসের জন্যে শ্রেণী কক্ষের পাঠ প্রস্তুত করে থাকে।
- বিদ্যালয়ে দুটি সুসংগঠিত, সুসজ্জিত ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাদকদল রয়েছে। প্রতিটি দলের সদস্য সংখ্যা ২৪। এরা বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক সমাবেশে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে বিশেষ আমন্ত্রণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সুশৃংখল ও চমকপ্রদ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে থাকে।

ENGLISH SECTION

THE UFO

Mahbub Hasan, 3111
Class XI Science

UFO abbreviates the term 'Unidentified Flying Objects' which is really a great surprise and an impenetrable mysetry to us. The flying saucershaped objects with various rotating colours, which are found incidentally in various parts of the earth in the sky with swift movements are called UFO. More than 60,000 reports by individual witness have been collected and computerized by University of Colorado psyclogist David Saunders.

Unidentified Flying Objects first soared into the news in tne United States on June 24, 1947, when Kenneth Arnold a businessman flying his private plane near Mount Rainier in Washington, saw nine disclike objects skimming along at high speed. The term 'flying saucer' was coined by a reporter who interviewed Arnold and within a mouth UFOs has been reported in every state of U.S.A.

Since then an amazing number of UFO reports have been accmulated. Reports say that these unknown air crafts or saucers appear on radars and in the photographs. They have influence on television and radio reception. Not only that, they cause car engines to stall, animals to panic, produce strange physiological effects on close contact witness. Also a chemical change in solid is observed after their landing on earth.

October 3, 1973, a deputy sheriff and four park rangers watched amazingly a saucer shaped object 'the size of a two bedroomed house', with red, green and yellow rotating colours, manouvred over Tupelo, Mississipi.

Two weeks later, 8 kms, south of Cleveland, a US army helicopter narrowly missed a mid-air collision with domed, metallic, cigar-shaped craft. The pilot captain Zawrence Coyne, said that he was force to take the helicopter into a rapid descent and then was swept 600 metres straight up towards the unknown saucer. Really it is quite unbelievable !

Now, appropriately we have an ardent question about UFO's presence in our planet. In Russia, Felix Ziegel of the Moscow Institute

of aviation declared in 1967 at a conference on space civilization, "we have well documented sightings from every corner of the U.S.S.R. It's hard to believe that all are optical illusions. Illusion does not register clearly on photographic plates and radars." According to the Gallup poll, 15 million American now claim to have seen a UFO, and 51 per cent of the adault population believe that UFO's are real. J. Allen Hynek, Chairman of Northwestern University's Department of Astronomy and director of the Zindoeimer Astronomical Research Centre, has already collected 1474 authentic UFO reports in the United States alone. Most of the reporfs has come from the people who are absolutely not interested about UFO. Major General John Samford, a former director of intelligence of the Pentagon said, "Reports have come in from credible observers of relatively incredible things."

Therefore, though unbelivable we have a number of causes to belive the existence of UFO. According to the most of our scientists our sun is middle-aged compared with some second and third generation stars. For this, there can be beings in many planets in the glaxy whose science and Technology is far nore advanced than ours. Then it would not be improper to consider these mystry saucers as the signs of existing other beings in the vast and black space.

●

And coustancy lives is realsm above;
And life is tuorny; and youth is vain:
And to be worth with one we love
Doth work lik modness in the brain.

—Samuel Toylor Coleridge

COME TO ME AGAIN

Mustafizur Rahman, 2921
Class XIII (Science)

O my childhood, won't you come once more in my life
To reduce my in ward bustle and strife ?
There is a dry winter in my sphere
The boring pains my nerves cannot bear.

Shall not I see my playmates as before
With whom I have passed your stage, any more ?
Where are the singing birds in my garden
From my cares to relieve, to unburden ?

O my childhood, won't, won't you smile
In my world for a while ?
Won't you present one more that merry face ?
Your caring, loving and solicition embrace ?

Dear boyhood, come to send me back to me
Lovely childhood, help me to see, which I did once see

EINSTEIN'S THEORY OF RELATIVITY, IN BRIEF

A. K. M. Salek, 2306
Class XI (Science)

"Science is not just a collection of laws, a catalogue of unrelated facts; it is a creation of the human mind, with its freely invented ideas and concepts The reality created by modern physics is indeed, far removed from the reality of the early days."

—Einstein

Introduction :

Albert Einstein, the greatest scientist of the twentieth century, was born in Ulm City in Germany, on the 14th of March, 1897. 'The special theory of relativity' was published in 1905 when he was only twenty six. It has had an enormous impact on physics, since it is simpller than the general theory. Einstein developed the special theory of relativity from two postulates.

The first postulate :

The laws of physics may be expressed in the same set equations for all frames of reference moving at constant velocity with respect to one another.

The second postulate :

The speed of light in free space has the same value for all observers, regardless of their state of motion.

Law of relativity in case of Length :

According to Einstein, if the length of a rocket is Lo, when it moves with the speed of v, its Length ∠ will be— given by the equation :

$$L = Lo\sqrt{1-\frac{V^2}{C^2}}$$

The relativistic length contraction is negligible for ordinary speeds, but it has an important effect at speeds close to the speed of Light. As for example the length of a substance that is running with a speed

of 1000mi/sec, shortenes to 0·999985 mile but the length of a matter which is going with the ninetenths the speed of light shortenes to 43·6% of its length at rest which is a significant change. But if a body could aquire the speed of light its length would be zero!

In case of time :

A clock moving with respect to an observer appears to tick less rapidly than it does when it is at rest with respect to him. It is expressed thus—

$$T = \frac{to}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{C^2}}}$$

T = Interval measured by a clock at the velocity v.
to = Interval measured by a clock of rest.
V = Velocity of body.
C = Velocity of Light.

Therefore, when velocity increases, time dicreases i.e. clock becomes slow. Einstein said that if man could acquire the velocity of light, he could enjoy ever-youthful life.'

Then man would be immortal!

Let us suppose one of two twin—astronauts stays on the earth and the other one travels in the space with the velocity of Light. After prolonged journey, when he returns to the earth he will find his companion very old but he himself will still be young.

The Relavity of Mass :

If the restmass of an object (that is, it's mass as measured by somebody stationary with respect to it) is mo, and the mass m that will be measured by somebody moving with respect to it is—

$$m = \frac{mo}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{C^2}}}$$

Relative mass and energy :

The most famous result Einstein obtained from the postulate of special theory is the fact that mass is a form of energy—mass can be converted to energy and energy to mass. He related mass with energy by the fomula—

$$E = mc^2 \cdots \cdots (A)$$

Now if mo be the mass of a body at rest (relative to the observer) then the enery,

$$Eo = moc^2 \cdots \cdots (B)$$

If the E of eq (A) is the total Energy of a moving body and the Eo of eq (B) is it's rest energy; Einstein said that its kinetic energy is—

$$KE = E - Eo = mc^2 - moc^2$$

$$= \frac{moc^2}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{C^2}}}$$

So where $V = C$ there $KE = \infty$

No object can achieve the velocity of Light:

Every motion is relative but the velocity of light is constant and no body can acquire the velocity of light.

If a body moves with the velocity of light then place becomes zero, time and mass becomes infinity. To shake a body of infinite mass, infinite-energy is needed. So no matter can achieve it. But as light has no mass it can achieve the velocity of 'Light'! It means that in the world of photon (Light-partical) place is zero and time is infinite.

Conclusion :

Einstein died on 18th April, 1955. But his deeds are imperishable. His mortal existence has been destoyed, but his memory and achievements will remain ever-memorable in the hearts of the people.

●

The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable on persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progess depends on the unreasonable man. —Bernard Shaw

MY LOST STAMP

Q. G. M. Faruque (Bizu), 1718
Class XI (Science)

Here is my stamp
Whom I lost a few years ago,
Here is my stamp
Whom I searched afew years ago,
Here is my stamp
Whom I loved afew years ago,
Here is my stamp
Whom I got afew years ago,
Here is my stamp
Whom I forgot afew years ago,
Here is my stamp
Whom I found afew year later.

LET THERE BE LIGHT

Nusrat Jamil, 2901
Class XII (Science)

—Sister, Sister,

Please, put out the light, and open the window, sister.

—For heavens sake, please forget what the doctor said ; for once, only once, please do as I say.

—A-h. What a relief. Thank you sister. Let me breathe the pleasant air to my heart content. Let me enjoy the exquisite night for the last time in my life.

Would you sit by me sister ? For a while ? Just once ? Please, don't say 'No' sister. I wouldn't request you again, I promise.

Thank you sister, thank you very much. Have you seen how beautiful the night is. The full moon is on her throne like a resplendent queen. Her effulgence, her brilliance, her bright lustre has engulfed the world with ever-refulgent glory—creating high tide in the hearts of millions. Don't you feel that ineffable passion sister ? But why am I not feelIng that turbulence ? That emotion ? How did I become so stolid, so stoical ? Perhaps my heart has become defunct—my subtle feelings have deceased. But how does the mind die before the body perishes, sister ?

The soothing zephyr is trying to soothe the burns of my heart, to put out the unextinguishable flames of agony. Many thanks for the try ; but I have been married to endless sufferings from my very first day in this earth. —Only death will, perhaps, part us.

Do you hear that sister ? The soft breeze is whispering to my ear. Don't you understand it sister ? It's offering me the last kiss ; bading me good-bye, adieu.

Are you getting impatient sister ? You know, now a days nobody asks me how I am, how I feel, what I want. No one has a single moment to spare for me ; everybody is so busy. Will you listen to me, sister ? No please don't think I am out of my mind. I am not

yet insane, sister. Would you listen to the saga of a verdant life that was snddenly baried under the desert of fiasco ?

The story of an innocent heart that was cruelly cheated by Nemesis? The take of a young man whose destiny did not dare to challenge him from the front, but possessed the cowardice, the pusillanimity to stab from the back?

Oh, don't try to console me sister. I know, my days are severly counted. I may be a patient at this moment, but don't forget, I am a doctor,

Leukemia is a disease that still lies beyond all medication. Please, please sister, don't play bide and seek games with me. I will feel better if we get it straight and accept the grim reality.

But why did it happen to me? What wrong did I do? What sins have I commitfed? I have hardly commenced the journey of my life, Life had so many promises so many prospects, so many contingencies, sister! I expected so much from it—and this is my reward.

You know, sister, when I graduated from the Medical College exactly one year back, my eyes were shining with sweet dreams, great expectations. I wanted to be a very good doctor, and devote my life to the medical research—discover the secrets of life and death, and invent remedies for diseases that are still hunting thousands of hapless souls. But what a cruel game of destiny! It has tramped me under its feet before I had a chance to riseup.

You know Sister, I still remember vividly the tearful eyes of my father in his death bed. I was only fourteen at that time. But still whenever I close my eyes. I can see the desperation, the frustration, the silent wailing in his tears. He couldn't speak any more. The paralysis has robbed him of his speech. But his eyes were telling me the words which no language could speak. He put my hans on my younger sisters, as if to say, "I am going. But you will have to survive me. I am putting your mother, your small sister—the greatest treasures of my life, in your hands. I am sure you will be able to take good care of them."

—Please give me a glass of water sister. Tears are chocking my voice ; thousand monsters are tearing my heart. What could I do for them? What answer shall I give to my father?

I was the only person left to support them, to protect them, to sheild them from the truculent onslaughts of life. Now, with me lost

forever how will those two simple, artless ladies encounter the trecherous, deceitful and cheating curve of the meandering world? With not a single person to succor them in this inimical world, how will they traverse the perilous path of life trapped with chasms of certain annihilation at every step? How will they survive? Their fates are doomed sister—I couldn't I save them, Icouldn't keep my father's request, couldn't preserve his invaluable wealth. The venom of failure is macerating my heart—there is no consolation for me Sister, no consolation at all.

You have seen many deaths Sister, but did you see a man dying so slowly? So consciously? So painfully?

Do you realise the pangs of the heart that knows for certain his days are coming to an end? My works are still unfinished, my duties are unfulfilled. There is no light in my way; only comulated darkness,—my path is totally dark, Sister.

"Save me doctor, I don't want to die. Help me, please"—these words still ring in my ears Sister. But I couldn't save him, I was only an internee at that time. Perhaps no doctor on earth could save him. The young boy was beyond all cures that medical science could offer. He knew that very well, hut he was not prepared to accept that ineluctable fate. The intent longing for life was bursting through his eyes—life suddenly became very colourful, very beautitul, in his eyes. Death had revealed to him its monstorous dimension, its horrible complexion. He became listless, convulsive, impatient. I had nothing to do but to watch the poor boy die slowly. Painfully, cognizantly.

I tore my hair in frustration—not being able to do anything but to be a silent spectator at the dreadful show of the cruel annihilation of an innocent, fresh, rosy life. But desting has reversed my role today, sister. No I am waiting for my death bell to ring, and you are trying to fill your hearts with pity.

Would you bring me thar picture sister. Yes, it is she. I met her two years ago at the sandy beaches of Cox's Bazar. It was, perhaps the most beautiful evening of my life. The brilliant sun was going down with a bright red lustre. She was standing at the beachfront—in the surging surf. The tiny warelets were breaking apart at her feet tinkling cheerfully all around her. The soft beams of the descending sun reflected in her innocent face, engulfing her with a heavenly halo. The soething evening breeze undulated her fresh hair jn a sprightly dance.

The glorious vista shall remain enshrined in the temple of my heart, forever. I saw her as an immaculate flower of the paradise, bloomed of the embrace of the boundless sea. I heard the voice of her soul in its enternal billowing. To tell the truth, the resplendent sublimity of the daughter of the sea overwhelmed me at the first sight. I will never forget that beautiful scenery. Cancer may wither my body—but it will never, never, be able to tarnish the enternal memory of my beloved.

She was the best treasure of my life, sister. It was her simplicity, her integrity, her sanctity, that impressed me. I not only loved her, but respected her—my greatest adorations were dedicated to her, It may sound ludicrous perhaps but it is fact, a sheer truth that her victimity, her soft touch, her ringing words unveiled a beautiful new horizon of my life—replemishing my buttered heart with new strength, vigor, vitality suddenly discovered in myself a new entity—an existence that was worth enough to be loved, revered desired by someone else. In another glorious evening of my life, facing the endless sea which once united us in its caring lap, I pledged her that we will love each other only if we can love truely, honestly and nobly. Holding her hands in mine, I promised her I would never offend the sacred love of her innocent heart, that my deeds would never stain the heavenly brilliance of her undefiled soul.

She told me that she would prepare death to our parting. And Now? How could my fate be so cruel? So ruthless? So blind and indefferent to our feelings? If I could slit my heart Sister, you would see how profusely, how deeply, how violently it is bleeding. That blood is gushing out through my face, my eyes, my whole body. Look, how red how pure it is. Will it satisfy the insatiable thirst of Nemesis ? I wish I could rise up for the last time out violently and crush the invincibility of the Fate under my feet. I wish I could get my Lord, to ask him Why? Why? Why? For whose sin? For whose sake? It is only because you cherish a denilish pleasure, a brutal enjoyment at the heart—rending wailing of the innocent millions? Is it because you execute bestial games at the pangs of the human hearts? I wish I had that power Sister, that voice, that strength. There is noting I can do but to surrender myself at the cold grip of death—silently, unprotestingly.

Oh! Sister what an intolerable pain! What an unbearable agony! What a horrible torment! I have nothing to do but to embrance the gruelling figure of my inevitable desting. I am so helpless, so weak

so subservient. Oh, No, Don't try to stop me Sister. Let me speak out for the last time. Let me vent out my caged emotions to at least one person in this earth. Please, Sister, please try to understand. This is the vehement outburst of a wretched traveller who has been forced to take a perilous journey down the dark road of certain destruction.

The nectar of my heart has turned into venom. The burning anguish of my distressed heart is scorching me incessantly. Oh! What a Pain! What an unendurable suffering! Can you inject me poison Sister? Can you choke me to death? Oh, please do something; I can't stand it any more!

What did I get from life? My history of each and every day in this world is written with my tears—my life-bloods that flowed from the fetal injuries of the heart, in my incessant struggles, untiring endeavours to surmount the thorny obstackles of life. Crossing an ocean of distress, suffering and intolerable afflic ions, I almost reached the golden island of success. But I never imagined that at the threshold of success stood the hidden assassins, agaping the pointed jaws of death. Those cowards did not have the courage to face me, to fight like a valiant hero; those mean dastards hit me at the back Sister. I feel on the ground, charred and bloodstained— just a feet away from the crown of success. I am sinking into the abysmal abyss of darkness, Sister. Isn't there anybody who can hold my chands? Who can rescue me from the black-hole of annihilation? Who can shed the flickering lights of hope in my dark eyes?

The night has ended Sister—the nature is singing the hymns of the coming down. The eastern sky is becoming bright and fair—ringing the matuitinal tunes. The melodious notes of the Muazzin's call to prayer is reverberating throughout the univers.

"God is noble"
... ...
"There is no Lord but God"
... ...
"Come (to the glorious path of God)
for your own bliss"
... ...

—Ah! The tranuma of my burning heart has been assuaged greatly, Sister, those eternal messages have extinguished the blazing

flame of unbearable throes. The intolerable agonies have been mitigated—my heart is being exalted with serenity, tranquillity, beautitude and above all perfect peace. Why shall I worry? What are my trepidations? I have placed my future in the caring hands of the Omnipotent one. I might have abandoned him throughout my life, but I am sure, He will never shun me. Because, He is the spring of infinite mercy, the origin of limitless compassion, the fountain of greatest sympathy and the source of boundless grace.

His solicitous eyes care for even his infinitesimal creations, he can never be apathetic to the plights of his most beloved—the Man.

I am ready to accept my fate, Sister. Whatever happens to me, I will not be worried, I will not be tormented, I will not be troubled. The song of enternity is ringing in my ears, I am totally safe in His hand, Sister.

Sleep is burdening my eyes, Sister. After so many sleepless nights I will sleep today. Peacefully. Perhaps millennimums will pass by before I wake up—pray for me, Sister.

●

Who steals my purse steals trash. 'tis something nothing.
..But he that filches from me my good name
Robs me of that which not enriches him,
And makes me poor indeed. —Shakespear

THE LAND OF ETERNAL GLORY

A. W. M. Rezaul Arif, 2917
Class XII

Introduction :

Nepal is an ancient kingdom. It is a small but sovereign nation, locked between two vast countries, India and China. The Royal Kingdom is blessed with a spectecular arry of placid lakes, green hills, woodland parks, turbulent riverd and rugged mountains. The country spreads along the southern slopes of mighty Himalayas in an approximately East-West orientation for about 550 miles. Roughly rectangular in shape. It lies between 80.15 and 88.15 degrees East longitude and 26.30–30.10 degrees North longitude. The total area of the small fairy country is 54,350 square miles, a few 100 miles less than Bangladesh.

The Nepalease are a nation of more than twelve and a half million people of different culture and traditions, the Sherpas, the the Newaris, Gurkhas and the Tibetan refugees.

In Nepal, the cow is traditionally known as Laxmi—the goddes of health and prosperity. The cows are protected by law and considered sacred by the tradition—loving Nepalease. The bull is also protected by constitution as it is the Mahadeva's steed. As a motion of revere to the sacred animals, all the temples are dedicated to Mahadeva, are carved with the images of bulls. The Newari farmers believe that the use of bulls for drawing ploughs will incur the wrath of Mohadeva. So they employ manual labour for the purpose and tiered Pagodas are made of exquisite wood-carving in every corner of the country. They are replicas of demons, Gods and erotic figures, which are historical feats of temple—architecture in the 9th and 14th centuries. The visitors are bewitched by enthralling beauty of the temples.

Kathmandu Vally :

Kathmandu Vally is the heart of the Royal Kingdom. It consists of the three cities of vast heroic, artistic and cultural interest. These are : Kathmandu, Patan or Lalitpur and Bhadgaon or Bhaktapur.

The valley is situated on altitude of 4200 feet above the sea-level. The vally in criscrossed by the holy rive 'Bagmat' and its tributory 'Bishmemati'—wending their way to south. The vally is indeed very beautiful ; the cloud-kissing mountains with snow covered peak proved its even enjoying beauty.

Kathmandu :

Kathmandu is the Capital of Nepal as well as the largest city of the Royal Kingdom. It is also known as Kantipur. In the reign of king Gunakama Deva, it was extended upto its present shape in 723 A.D. Its spectacular wood-curvings are believed to have been built from the timber of only a single tree. The word 'Kathmandu' was derived from 'Kasthamanda'—a Pagoda structure just near the Durbar Square.

Important Places :

Machendar Narth Temple :

It Is a Pagoda surrounded by residential houses with busy shop-fronts. The temple has two tiered bronze roofs erected at the middle of a large courtyard. The temple is dedicated to Machendra Nath— the God of rain or the God of mercy.

Hanuman Dhoka :

This historic place heralds the glory of ancient kings of Nepal. A statue of Hanuman covered in a scarlet clock and sitting on a stone plinth is installed here, The most interesting things to see here are

* Jaleju Temple built by King Machendra Malla in 1549.
* Gigantic figure of Kal Bhairav—the God of terror.
* Basantpur Durbar or Nautallee Durbar built by King Prethvi Narayan Shah.
* Deotolle Temple.
* The Hall of Public Audience.
* The statue of King Pratap Malla with his four sons seated on the lotus capital of a tall stone monolith.
* The Big Bell
* Jaganath Temple and many other Numismatic museum at the old palace building.

Kumari Temple :

Near the Durbar Square, the Kumari temple stands, It is the residence Temple of Kumari—the goddess of virgin. It was built by

king Jaya Prakash Malla in 1760. The interior is decorated with profusely carved wooden windows and sloping out-word.

Pashupatinath Temple:

It stands on the bank of Bagmati, the sacred river The Temple of Pashupatinath with two-tiered golden roof and silver doors are dedicated to lord Shina.

Boundhanath Stupa :

It is one of the biggest stupas in the world which is more than 2500 years old. It was built by King Mana Deva weich stands with four pairs of eyes of Buddha in four cardinal direction, keeping watch for righteous behavior and human property.

Swayambhunath :

It is a Buddhist stupa aging more than 2500 years and standing on a hillock abut 250 feet above the valley-level. On the head of the stupa, there is a pinacle of copper giult. The "eyes of Buddha" are painted on the four-sided base of the stupa.

Balagu Water Garden :

It stands beside the Nagarjun mountain. There are 22 dragon-headed Water-spouts and an image of sleeping Vishnu. It is the symbol of the remarkable development of 18th century.

Kirtipur :

It is a tiny town-ship four kilometres South-West of Kathmandu. It is situated on a ridge-top plateau on which the Tribhuwan University is situated.

Chovar :

The Chovar is famous for its turbulent gorges. As the myth goes Manjushree excavated the gorge to drain out the stagnant waters of the Kathmandu Valley. Gradually it became a lake. A small lent picturesque temple of Adinath stands on the top of the hill overlooking the gorge. The distance between Kathmandu and Chovar is only 6 kilometres in the South-West direction.

Patan :

Patan is called the city of beauty for its splendid historic remains. It was built in 299 A. D. during the reign of King Veera Deva. The

Hindus and the Buddhists co-exist here peacefully. It is renowned for its slopping centres and also for its masons, carpenters and wood-corners.

Durbar Square (Patan) :

This place is full of beautiful temples and stone statuaries. This ancient place proclaims glory of the Malla kings. The stone-baths of the Kings instigue the visitors.

Krishna Mandir :

It was built in the 16th century by King Siddhinara Singh Malla and dedicated to lord Krishna. It proves perfectly the Nepalease skill-ness in the craft of temple construction. Pictures from the Epic Mahabbharata and Ramayana are carved on its entablalatures in bas relief.

Hirdnya Varna Mahabir :

It is a golden Pagoda of Lokeswar, built in the 12th century by king Bhaker Varma. A golden image of Lord Buddha is here in a big prayer wheel on the pedestal of the Mahabihar.

Maha Boudha :

It is a masterpiece of terra-cotta. It was built by Abhaya Raj, a priest of Patan. It is consecrated to Lord Buddha. It gives evidence of 14th century.

Godavari :

This place is well-known for its fish hatchery and the Royal botanical garden in the dense woodland. It has wide ranging collection of high altitude orchids, cacto and a marble quarry. It is situated in the "lap of phulchoki". The remoteness between Godavari and Kathmandu is 15 kelometres South-East.

Phulchoki :

It is a natural garden of wide roses, yellow jessamines, iris and other mountain living flowers. Kathmandu Valley is surrounded by this famous hill. The hill is covered with a rich grove of rhododen-rous of various huse and natures.

Bhaktapur :

Bhaktapur, the oldest city of the valley of Kathmandu having an impressive combination of magnificent countrysides, rough mountains

and fine temples. Time has failed to tarnish its originality, its priceless treasures, its enthralling splendours ; the ancient carved wood-sets, tiled roofes, flagstoned and cobbled lanes are living embodiments of the city's everlasting glory.

Bhaktapur, the ancient Malla capital was founded in 889 A. D. during the reign of King Ananda Deva. But it is probably more ancient. The Malla kings of Bhaktapur raised gilded monuments of the gods at every corners of the city. So every street became an open air temple.

The Golden Gate :

The last Malla King of Bhaktapur, Ranjir Malla erected the gilded Golden Gate which is the most beautiful and valuable moulded specimen in the Kathmandu Valley as well as the Orient. It was built in 18th century in Bhaktapur Durbar Square. It was intended for the Royal goddess—Taleju Bhawani. It is a magnificent proof of the rich Nepalease architecture.

The Golden Statue :

It is once of the most elegant emblems of the Nepalease sculpture. It consists of the statue of king Bhupatindra Malla sitting upon a lion throne under the shade of a royal umbrella which are carved on the top of a stone pillar. There are jewelled rings on the hands folded in the prayer-position. At dusk when the decending rays of setting sun shines on it, the statue assumes an exquisite look.

The Big Bell :

This famous and gigantic bronze bell is known as 'The Barking Bell'. Its grim rings announce the hour of morning worship of the goddess Taleju and the signal of evening curfews. It is known that its sound like the knell of death terrified men and made the dogs bark in horror. The hell which was attributed to king Bhupatindra Malla was hung from the Batsala Temple. This temple is made of stone with excellent artistic motifs.

The Dattatraya Temple :

The Dattatraya Temple, set in an imposing square was consecrated by king Yaksha Malla in 1427 A. D. There is a popular belief that the temple was made from the wood of single tree. At the entrance there are two statues of two warrior posing as door keepers.

Just beside the temple, there is a monastery, the monument of Marth Chhen which is renowned for its many carved windows, of which the most fsmous is the 'Peacock Window'. These exquisite windows dating back to the 15th century.

Pokhara :

The picturesque mountain city of Pokhara has been termed as "The Paradise on earth". Its snow-clad shining peaks, the green vallys, the violent gorge and crystal-clear lakes and streams have made it the happy dream of "Dreamland Nepal." Its natural beauty is boundless and seems to be blessed eternlly by the god of beauty.

The chief atraction of Pokhara is its tough mountains which are a significant part of the mighty Himalayan Range. The high peaks, which are above 20,000 ft in altitute, remain covered by snow throughout the year. The bright rays of the rising morning sun are reflected in the snow like a blazing fire—making such a resplended vista which makes a man totally speechless. The brilliant whiteness of the snow shining against the azure sky, is another scenery which remains evermemorable in the heart of the viewer.

There are several challenging peaks in the mighty mountain ranges:

The first one on the edge ot Massif is Annapurna South. It is 23,683 fit high.

Next comes the highest peak of the range, a little in the backgrond, making it look lower than it actually is. This famous Annapurna is 26545 ft high. It was climbed on 3rd July, 1950 by two French alpinists named Manrice Herzog and Louis Lachenal.

In the east, an isolated mass of rock is easy to identify. This is Annarpurna III which is 24,787 ft high.

There is another summit beside it which is Annapurna IV, the 24,688 ft high peak.

Annapurna II, 26041 ft high peak is a little bit different from other peaks. Because of ice or snow, the wall, on its right flank is very steep. The peak with its black head-gear leaving down on its right side.

Another mighty mountain, the 22918 ft high Lamjung Himal, separated from the main Massif of the Annapurnas appears in the mouth. In the distant east, two peaks can be found. They are the Manaslu and the Himalchuli.

Pokhar is a centre of natural beauty. One of its beauty 'Devie's Fall' is the most beautiful creation of nature. It is called 'Fadke' in Nepali. It is located 2-3 miles from the airport in the south-western direction. A stream originates from the lake, leaping through several pot-holes before taking a final hurl suddenly fall down into a deep gorge.

The third wonder in Pokhara is the Mahendra Cave. It is located near the Batulechaur Village, just in north of Shining Hospital and University side. It has a religious significance as well as scientific importance. But its mystery is yet to be totally discovered.

A beautiful village 'Gyarjati' surrounded by dark forests, shrub covered slopes are situated at an altitude of 3000—5223 ft. Atop the hill there are remains of fortress which played a glorious part during the battles won by king Prithvi Narayan Shah, during the 18th century when he wished to unite the whole country.

Conclusion :

Nepal is really a beautiful country having a splendid landscape and wonderful citizens. The Nepalease are renowned throughout the world for their chivalry, martial prowess as well as for their integrity and loyalty. Throughout the ages, the Nepalease have fought valiantly agaist foreign invaders, to defen their freedom, their independence. We hope that they will continue their heroic march towards prosperity under the dynamic leadership of their honoured King.

●

Cowards die many times before their deaths;
The valiant never taste of death but once.
—Shakespeare

TIGER

Sk. Monowar Ali, 2575
Class XII (Science)

Whenever I turnover the decrepit pages of my memory, the dead past comes back to live again; especially when I recall my childhood days—the great event that immediately captures my remembrance is a name—'Tiger'.

This unforgetable name is still shinning in my heart like a burning star. He was our beloved dog who was no less than that of a tiger. His memory makes me cry and will remain evergreen in my heat.

I was just promoted to class v. One afternoon my friends and I were playing in the field as usual. Suddenly, I came across a corpulent puppy. I loved him at first sight. Therefore, I suggested my friends to rear him. My suggestion was gladly supported by them. So we took the puppy to our house. We lived in the ground floor. So it was decided that the puppy would live in our porch. Quickly we started with a great enthusisam to build his house with bricks. I covered the floor with worn-out cloths for him to feel comfort. Then I bade my friends goodby. The puppy was given some bread at night, but he had nothing.

At the dawn I found that he was deeply engaged in sleep. About 7 a.m. my friends assembled in our porch. When he wake up we gave him to eat whatever we could bring. It was too much for him. So he could not eat up all of it though he was greatly hungry.

However, according to my friends he was named, 'Tiger'. Thus he was growing up gradually within our care. He became much more beautiful in course of time. He was very fond of games. He played football with me. The sight of his running in search of the ball was really a pleasant one. We trained him to perform various spectecular feats. Thus he became one of us. He was famous in our area for his strength and braver. Disturbance of thiefs decreased before one's

eyes. Because he kept watch our area vigilantly. Within a few days he managed two companies. One day at night he chased a thief into the drain who tried to steal my bosom friend Binu's hen. The thief found no way to escape and was caught easily.

"What is lotted can not be blotted"—this universal truth was tragically proved once again by our tiger. One day an accident happened. Some staffs of municipality came to kill tiger and his companies. Having no license was their unforgivable guilt. We had no objection about the other dogs, but we approached them not to kill tiger and also said that we could immediately manage his license. We tried to make them understand that tiger did not harm anybody and he was very much helpful for our local people. But they did not listen to us. They got hold of tiger by the neck with a iron-tongs. Tiger was throwing his legs to free him from them. But his all efforts went in vain. He was defeated for the first time in his life. I was trying to tear my hair because of failure to free him. We entreatied them for the last time to release him when they were injecting the poison. But the cruel needle did not respond. It slowly entered in tiger's body and came out in an instant. His eyes became dimbol in shape and suddenly he became torpid. Tear-drops fell down from the corner of his eyes. It also made us cry. It seemed to me that his helpless eyes were filled with silent entreatment. By throwing his legs his innocent mind was trying to protest—why was he being assaulted to death? Was it because he was a mere best? He did not harm anybody. But why? Why was he being slaghtered so brutally? I know it very well that he will never be answered.

This harsh civilized world did not give him any shelter. He had to leave this world savagely. But the staffs of the municipality kept our last approach and handed over to us tiger's corpse where everything was present, only the soul was absent.

●

Where love is great, the littlest doubts are fear:
When tittle fears grow great, great love grows there.

—Shakespeare

THE PRINCE OF MATHEMATICS

Sabbir Ahmad Chowdhury, 2904
Class XII (Science)

It is the eternal yearning of mankind to seek truth. Their only intention is to find out what is unknown and apply that knowledge for the sake of humanity. It is only for this reason that the world is now so different from that of hundreds of years ago. Great men are very scare but they benefit thousands of people. They live only to illuminate others and enrich mankind and not to enjoy themselves.

Gaus of Germany was one of the greatest mathematician who ever lived. He was born in 1777. His full name was Frederich Karl Gaus. Just as prince takes his horse out to the battle-field with courage, Gaus fought against all obstacles that came before him in finding the mystry of mathematics. So Dr. Balley appelled him "The Prince of Mathematics."

Although Gaus was the prince in the kingdom of mathematics, his life did not commence in such a regal manner. His father's profession was to make gardens and construct buildings. His father was an obstinate person and he wanted his son to follow his father's footsteps though he knew that his son was very meritorious.

One day Gaus astonished his father and others very much. He was then only three years old. His father was calculating the labours. wages. Suddenly Gaus exclaimed, "Oh, father, your calculation is wrong." His father was taken aback. He could not believe himself. He again counted and found that his son was quite right. The strange thing was that he was not then taught the digit. He had a book from which he realized the meaning of 1, 2, 3 ... ... without the help of others.

Gaus, father, however, was not the best pleased at the possibility that his son might be a genius. He rather wanted his son to be what he himself was. But Gaus' mother Dorothy Benze, who was a lady of intelligence and a patron of knowledge did not like the idea.

She loved his son very early and appreciated his talents at his very childhood. She was very hopeful about her son. Gaus was her pride, her expectations. So he strived hard to save a genius from his stubborn father. One day when Gaus was nineteen years old, his mother asked one of his friends, "will Gaus be able to do anything"? The friend retorted, "of course, Gaus will be the greatest mathematician of Europe." His mother shed tears in joy as she heard this. Frederich was Dorothy's younger brother and he helped his nephew in his work affectionately. He died a premature death and was remembered by Gaus as an "unforgettable memory."

Gaus faced an accident in his boyhood which he escaped hardly. He fell in the stream that was following in front of their house and he was drowing. A labourer saw this and quickly saved him. It was indeed Gaus' good-luck as well as ours that he did not decease so early with such a talent.

Mr. Butner was a teacher of the school in which Gaus was first sent to. Mr. Butner was a very hot-tempered person. The students were so afraid of him that they even forgot their names when they faced him. One day Butner told the students to do a sum of Arithmetic progression. The sum was: $81297 + 81495 + \ldots\ldots + 100899 = ?$ The answer is 9109800. Within a few seconds Gaus wrote the answer on the slate and gave it to the teacher. He was then only ten years old and he was the youngest boy of the class. Nobody except he could solve the problem. Butner was greatly surprised and he could not undestand how a boy of such a tender age could do the sum such and incredible speed. Since then, Butner had a great affection for the young genius. He personally brought the best books on mathematics and presented to Gaus. He said, "Gaus has surpassed me. I have got nothing to teach him."

Martin Bartales was the assistant of Butner in the school. He was also very interested in mathematics. He was, together, Gaus' teacher, companion and friend. They devoted themselves to find out unexplored reigns of mathematics.

Gaus met Karl Weathence Ferdiland, the Duke of Brownsweek when he was fourteen. Their acquaintance was done by Bartens. Ferdiland was generous man. He loved Gaus very much for his genius. He defrayed all the educational expenses of Gaus. So Gaus was quite free from the financial problems and he was able to devote himself with concentration. Gaus read almost all the theories of the

great mathematicians when he was reading in college. He was greatly interested in Newton's principles. Since his boyhood, he had much adoration for the great scientist. Gaus' unwonted talent gradually spread throughout Europe and beyond its boundaries. At that time one of his friends requested him to prove the famous theory of Farmat. Unfortunately, he was not able to keep that request. The reason was not that it was beyond his ability. He was then pre-occupied with astrology. He was trying to find the orbits of two planets which he recently discovered. Despite the fact thet 'numerical mathematics' is complicated than astrology, at that time the latter was more preferable in the society. Gaus' such deviation from the field of numerical mathematics resulted from social prejudice.

Gaus contributed many theories about electro-magnetism. He was the inventor of electric telegram. He also invented many formulae about magnets and about passage of light through a number of lenses.

Gaus struggled all his life only to unveil the cryptic mystries—not to hanker after name and fame. He did not care at all for the praises or criticisms of people but he went on with his work with sincerity. Gaus wrote many theories in his diary. But he wrote them so precisely that even a good mathematician could not understand their meaning.

Gaus passed his old age in enormous troubles and miseries. His heart grew abnormally big inflicting him much pain. Yet he did not stop his work. He strived hard until his death in 1855.

No man can defy the edict of time. Man has not come to this earth to live here forever. The universal law has effaced his mortal existence from this world. But his memory will remain inperishable in the hearts of his successors.

●

Confess yourself to heaven;
Repent what's past; avoid what is to cone

—Shakespeare

THE ANNUAL CAMPING OF RESIDENTIAL MODEL SCHOOL '81

A. K. M. Anamul Hoque, 2943
Class XII (Science)

In this world of tough competitions everybody must perform his duties properly. Otherwise he is found to be annihilated in the wirlpool of life. In order to acquaint the future citizens of the country, with the practical struggles of life, our school authority regularly organizes annual campings.

I am a student of Residential Model School, Dacca. In this institution, the students are compelled to abide by its rules and regulations. In fact, they have to live a hard life to prepare themselves for future. They are to perform all their activities in time. Since everybody is quite conscious of the punishments of disobeying orders, students always keep themselves disciplined and punctual. But in the midst of this hard life, student also get the opportunity to enjoy themselves. As for instance, we are annually taken outside the school compound for camping. And camping is really an interesting event and I am going to give you a brief description on one of them.

The camping is arranged in the winter every year. In February, 1981 I had the opportunity to enjoy the camping. The school authority decided that the National Park at Malancha would be our destination. The preparations started a few days before. First of all a small group of students went there to pitch tents and to do the other necessaries. This group is known as the "advanced party." As shortly after this came our turn.

The day of our departure was really a nice one. In the previous night, we prepared ourselves. Our joys knew no bounds. We could not sleep that night at all. All that we thought was "How interesting it would be when we all are in the National Park."

The next day everybody rose early in the morning. The weather was excellent. The sky was cloudless and a gentle breeze was blowing. We took all the necessary things with us.

The teachers and students were three hundred altogether. Five Buses were hired. We started our journey at 7 O'clock. The city of Dacca seemed quite new to us as we are always confined to our school compound. Within an hour we reached our destination.

The place was really very wonderful. There were trees all around which looked very nice. Among the dense forest there were small fields. Some of them were left uncultivated while others were full of golden corn. The place was very quite. No trees of the chaos of a busy town was there. There were ponds and streams here and there which increased the beauty to a large extent. The green scenery with the dark blue sky above was a great wonder. The sun rays ware pleasant in the winter morning. The birds welcomed us by their sweef songs.

All the students were divided into fifteen groups and each group had a name. The names were Darirampur, Khan Jahan, Sagar Dari, Sonargaon, Shelai Daha, Narikal Baria, Garjaripara etc. There were eighteen student in every group and a teacher was in charge of each. The name of my group was Darirampur. We close a convenient place and setup there tents for our group. The teachers stayed in the rest house nearby.

Thus we started our life in the jungle. Despite the fact, that life was hard it was interesting and enjoyable. After we have pitched tents some of us went out to fetch water. Six students lived in each tent. To protect ourselves from the hard ground, we put some hay under the tents as cushion. Some poles were stuck on the ground upon which we kept the utensils.

Our camping life lasted for four days. Eeveryday we rose very early in the morning. The group that rose first had the credit and the students raised a slogan to awake others. We washed our hands and faces in a pond nearby. Then we fetched water from the tube-well for drinking. At 7o'clock somebody announced by a loud speaker that food was jut to be served. At once few students of each group took utensils to bring food. After breakfast some of my friends and I started out for a walk to see the jungle. We walked for a long time and then came to a village. We saw schools, mosques and temples there. We talked to the villagers with some trouble since we did not know their dialect well. Then on the return journey a terrible thing happened. We lost our way. We walked on and on but could not see people or houses. "What would happen now?" We all uttered in

anxiety. It was already then the time for lunch. Fortunately a man happened to pass by. We followed his direction and after a while came to our tents. We found that all were having lunch. The teachers took us to task lightly saying that they were very worried about us.

In the afternoon, we played football and volley-ball. The teachers also accompained us. Then came the much-awaited night. As a matter of fact, words fail to describe how I felt at that time. We went to our tents and started gossiping. After an hour we had our dinner.

Then started the grand "Camp Fire", the very enjoyous cultural function. The teachers and students assembled in an open field surrounded by the dense forest. The teachers took their places under a canopy. It was a cold night. At the centre of the field was a unique scene. The chill of the winter night, the brilliant lustre of the blazing flame, the peculiar barks of alien animals rising from the forest, made us feel like the primitive cave-men, enjoying a jovial feast.

Each group gave a yell uttering the name of that group. Then some sang songs, some recited poems, some danced while others told jokes. One of the teachers was then requested to say something. At first, he refused to say as he was unprepared. But the students became to much curious and insistent that he had to appear before us. We wondered how he could invent such a funny story so quickly. He started, "Oh, my boys, how do you pass your time here?" "With much pleasure"— all shouted at the top of their voice. Then he continued, "I can't understand how you say so. The mighty tiny soldiers (mosquitoes) all the time disturb me. I made up my mind to teach them a good lesson. I let many of them sit on my arms. And then with a severe slap, I pressed them. When I opened my hands, I found to my great sorrow that not a single mosquito was killed." Everybody burst into lahghter at this.

"Cross-country" is an interesting event in which a group of students is taken about two miles away from their tents and left alone. They are to return to their tents by running or walking and an umpire keeps the time. Our group became second in this event.

Another event was "Hiking". In this event we carried food stuffs and walked through the jungle. After walking for an hour we found a beautiful place. It was neat and clean. We had to cook food ourselves. When cooking was over, we bathed in the pond nearby. Then we had our lunch. One shouted, "Oh! the curry is

saltless." Another said, "The meat is too tough." Thus nobody forgot to find the fault of the food. However, there was nothing to do. Although the food was not delicious at all, we ate it with much delight. After that we sang songs. The villagers gathered round us. They were first astonished to see us there in this manner. We explained them the reason of our sudden arrival.

It was not until the afternoon that we reached our tents. Then started the "Obstacle-race." It was an interesting game in which six students from each group participated. The event was somewhat like this :

The umpire blowed the whistle and we ran as fast as we could. After running some distance we suddenly found our way blocked by a big pond. There was however, a funny vehicle for transporation. It was the queerest boat I have ever seen in my life. It was made of drums and bamboos. After enormous efforts, we somehow managed to cross the lake. Then we ran for about a minute and found two tires hanging from a tree. We quickly passed through them skillfully. The next obstacle was the "Monkey-rope" in which the rope to be crossed was hanging between two trees. We quickly climbed the tree and balancing carefully began to walk over the thin rope. Again, running for sometime we met the last obstacle. Two empty drums were lying horizontally. We passed through them quite easily. When the result was declared, we found it to our astonishment that we secured the first place in this event.

The fourth day, we rose very early in the morning and tied our bedding. Ws were preparing to leave. We became a bit deppressed. Needless to say that we wished to stay there more. We had our breakfast and soon we boarded the bus and started for the RMS.

A few days that I passed in the camping was really enjoyable. It is indeed memorable to me. I realized how hard the life of the people is who live in jungles. It is also a simple training as to how to live in such places. Those who have never had the chance even for once in their lives to enjoy such an excursion, certainly it would be too hard for them to pass their days in such places. "Life is not a bed of roses" and this camping is aimed to make us to face the life what it really is. I am waiting for another chance to see life in its own colour.

THE INNER MEANING OF SUFISM

Arshad Alam
Class XII (Science)

"What matters is not to add years to your life but to add life to your years."

—Alexis Carrel

Our body is constantly helping us in the struggle for life on earth as a real wealth. But man cannot live by bread alone. Its impossible to deny the existence of a 'soul' which has helped us securing a plane above animals. A soulless body resembles a inanimate object. And that's why, it matters not how long we live, but how.

Body is nothing but the harp of our soul.

We did never duely consider that soul, like body, has different demands and the fulfilment of those demands results in contentment of the soul and the glorification of the body. In this materlatistic world today, our attitude towards these subtle matters has become more confusing.

Wise men of ancient times sought for soul only, though the begining of their philosophy with the recognition of body. Having failed to get any answer from science and philosophy, they tried to reach the 'absolute truth' through Quran. Such attempts of Muslim devotes has built the ideology and way of sufism.

Gandhi once said that God is that indefinable something which we all feel but which we do not know. There is no doubt that 'the foundation of all foundations, the pillar supporting all windows, is the recognition of the reality of God. But down through the ages, men tried to the existence of the creator, more correctly— to imagine an image.

The followers ot sufism also ventured to try to explore the mystry of the entity of Allah. But the saints headed for the aim with diversified opinions and conceptions. It is for this reason that the

sufism later was divided into three divisions— Namely, (a) 'Ijadia', (b) 'Shahudia' and (c) 'Wajudia'.

The devotees of Ijadia think that Allah created this universe from non-existence and His own entity is wholly different from his creation. There is a marked similarity between Islamism and this kind of sufism here.

The followers of Shahudia think that this universe and all the things in it is so completely enveloped by the manifestation of the glory of Allah that no other object has indivisuality of its own. To them, this universe is like a mirror, reflecting the glories of Allah. This ideology is some what like panthesm.

And the followers of 'Wajudia' think— only one 'existence' is extended through the whole universe and this existence is the subline entity of Allah. They imagine that Allah is present in all His creations. The principles of 'Wajudia' can be compared to movisen.

The sufi devotees believe that to the real conception about the existence of Allah, one have to gather a good knowledge on 'Nur-e-Mohammadee'. They imagine the Prophet Mohammad (sm) as the complete incarnation of Allah. At the beginning of creation, there was only the 'Nur' or 'Light' of Allah and from that 'Light' Allah created first 'Nur-e-Mohammadee'. Then the whole universe was created from this 'Nur-e-Mohammdee'

This wide-spread and well-known conception of the sufi-devotees occupies a major part in Sufism. The opinions of Sufi-devotees about the Prophet Mohammad (sm) can be well illustrated through the following lines written in the book 'Insan-e-Kamil' by—'Amrullah' or 'the message of Allah' is one of his names. He is the most sacred, glorious and ennobled creation of all creations. He is at the head of all in the case of prestige and honour. No angel is greater tham him. Hence we can say, the Sufi devotees have a very high respect for Prophet Mohammad (sm). Possibly it is for this reason the ninety-nine names of the Prophet of Islam is to be muttered to oneself for every Sufi-devotee.

The realization of the existence of Allah , to acquire 'Fana' by merging into the absolute-entity forgetting ones human existence and at last to gain the nectar of 'Baka' or serenity is the main talk of the ideology of Sufism.

Allah has said. "the infinite universe cannot hold me, the limitless heavens cannot confine me, but I am present as a shining pearl in the sacred soul of the devout worshipper". He has also said. "I am closer to the closest core of your heart." That is why, the achieve the highest degree of spiritual attainment—coalescing with the divine entity by culturing their mind. The famous Sufi poet Rumi has said, "the mind is the ever-refulgent source of the light of Truth, which illumina-tes the highway towards perfection.

But any attempt for the acquisition of the vicinity of Allah through the sublimation of the mind can never be directed well without any support. Since the Sufis view our body as the lemple of our psyche, therefore they, have looked for support in human body. They headed for finding out this unknown mystry by taking some 'Latifa' or container hidden in human body as the vehicle of their religious conception.

The Sufi devotees have a line of thinking that the 'Latifas' (the meaning is explained before) allied to the univers is some what related to physical portion of human life. They think that man can establish relationship with Allah through five Latifas. They said that the position of 'kalb' or heart is above Arash or the seat of Allah, And the 'Ruh' 'Seer,, 'Khefi' and 'Akhfa' is situated above the 'kalb' in succession.

The absolute and ultimate aim of the Sufidevotees is to reach the radiance of absolute-entity by keeping the five latfas auied with un earthly world, constantly in the remembrance of Allah. They endeavour to reach this destination by practising 'Jikre' and meditation.

The Sufidevotees termed the act of finding the existence of Allah as 'the expendition of soul.' The expenditionist is called 'Salook'. A new devotee in this line has to move along the directions indicated by a 'Murshid' or guide. One can be a 'murshid' on guide only if he had succeeded in the worship and had earned a good experience about the path. The new expenditionist is named 'murid'.

A 'murshid' directs a 'murid' the path of knowledge about Allah, which is known as 'Tarikat' in the language of the Sufi—devotees. Marching in this way with patince worshipper can get at length 'fama' the meaning of which is described before.

Different stages have been considered to be present in the way to reach the ultimate destination of Sufism. First comes the stage, the new worshipper tries to ennoble his soul and prepare himself to reach the higher stages of the way of worshipping. At first the

devotee has to arouse in his mind a mood of repentance. He also has to carry out carefully Mohommedan ecclesiastael laws in this stage.

Next comes the stage of love. In this stage, a love for Allah grows in the mind of the worshipper by the direct influence of the strength of the Sufi ideology.

Here after comes the stage of sacrifice. In this stage all earthly greeds and ambitions are entirminated from the mind of the adorer.

The stage after this is the stage of religious knowledge and conception. The adorer has to study closely on the nature, qualities and works of Allah.

The fifth stage is the stage of emotional out break. The worshipper becomes successful in creating comotional out break in him by meditating on the absolute-entity-- Allah. Professor, Nicholson commented in his book 'Mysteries of Islam' about this that only in the stage of emotional out break an advantageous condition is created when soul can directly establish a relationship with Allah and Join Him.

Next comes the stage of absolute truth. When a worshipper reach this stage, his heart becomes illuminated by the real radiance of Allah.

The final stage is the stage of union. On this stage the devotee becomes satisfied seeing the existence of the Almighly.

Having arossed this seventh stage the adorer becomes successful in reaching 'baka' or the joyful place of serenity goining 'fana' or supreme bliss.

The Sufidevotees emphasize on getting vicinity of Allah or merge himself in Allah rather than maintaining some rules and regulations of religion.

The daring venture of the sufists, in quest of the unknown, is indeed a unique one. It requires tremendous perseverence, greatest portitudes, and immence patience. But joy, the satisfaction, achieved tn the unknion, the crypwic, the impregnable existence, can never be enjoyed in the banal objects of everyday life. That is why thousands of sufi devotees, have set out in this fantastic enterprise, and discovered the true essence of life.

CHILDHOOD

Md. Mahbubur Rahman, 2286
Class XI (Science)

The incessant flow of events makes human life most fascinating. The reminiscence of these events stirs our emotion enormously. Many of them sink into eternal oblivion. One or two remarkable events of the past plant indilible foot prints on our memory. The unforgettable experiences of my childhood have inspired me to write down samething. It is a prodigious event of the past.

There is an age when every body is unable to understand the obscure and mysterious ways of life. They have to face a lot of difficulties, bear unspeakable oppressions and cruel torture. This is only a time when we have to stumble to procecd, have to be blind, deaf and dumb. It is, however, childhood.

Childhood is the time of enjoyment, merriment and all kinds of relaxations. It is not the age of understanding the value of time. So children don't care a straw for any thing. But they can also aquire knowledge through various experiences. It is a tendency of the children to look for the eggs of the doves, break the nests of the weaver birds and do such things which prove contrary to your wishes.

As for myself I was a child too and it seems to me that I did the same things before. Out of curiosity I ask my mother to know about many things. She told me the story of gnomes and ghosts and I feel riluctant to know more about such stories because I was afraid of these evil creations of God. The attraction of the evergreen world, the mystery of the unknown and unseen appeared quite alarming to me.

After spending a lot of times in enjoyment and merriment I am now a boy of seventeen, what a transitory time it is? what has the time given me? Thousands of questions arise in my mind's eye. I cann't do anything but to surprise and visualise the sweet recollections of my childhood. I havn tne strong desire to get my childhood

again. It seems to me that the reminiseence of the past is flashing upon my mind's eye. But like the setting sun all of my expectations form inefective. The reminisecnce of may past life affords me immense pleasure and pleasance. It is the source of inspiration to me. When I feel sed brooding over the evil—speaking of others, I think of my past life which is plunged into eternal oblivion. I bear the ignominious speech of people without the least pesitations. I dispel my sorrows and sufferings, gloom and despair musing upon my past.

Now I am reading in class eleven and it seems to me. It is a very dangerous time but we should do our duty with assiduity and try to evade such a man who allures us to become a devil.

●

He prayeth well, who loveth well
Both man and bird ane beast.
He prayeth best, who loveth best
All rhings both great and small:
For the dear God who loveth us,
He made and loveth all.

—Samuel Taylor Caleridge

TRANSPORTATION

Jadeed Aziz, 1914
Class XI (Science)

Transportation plays a significant role in our everyday life. Most of the things we wear, eat and use are conveyed to us by different types of vehicles such as trucks, trains. ships and planes. Transportation has contributed immensely in the advancement of human civilization. From the dawn of civilization the need for an easy way to transport goods had developed. People only knew to carry goods by balancing them on their heads. Thus tansportation was slow and uncertain. Furthermore, mountains deserts, jungles and oceans made travel even more difficult. In fact the word 'travel' originated from the French word "travallier"—which means, 'to work'.

In the early ages, man was almost ignorant of the world which surrounded him. Groups of people were isolated from one another. Around 3500 B.C. man started to tame animals like horses, oxen and camels as beasts of burden. But the maintanence of such animals was very expensive. In 1675 B.C. Egypt was invaded by Asians called "Hyksos". They brought with them a vehicle that was alien to the Egyptians—a spoke wheel chariot drawn by a horse. This solved a great problem, how more goods could be transported with the same number of horses. The Egyptians and the rest of the civilized world soon began to use the contrivance and improved it. Thus the invention of 'wheel' greatly facilitated travel by land.

For hundreds of years the roads of the sea remained an easy route. Long before animals were even being tamed to carry burdens. there were wooden ships plying on the Nile. These ships were made of cedder wood and used sails as well as oars.

For centuries man had only the muscles of animals, the wind and water currents to transport him. In 1769 the first steam-powered automobile was built in Trance. The invention of the steamengine gaye way to the invention of an entirely new type of transportion by land. It was called the railway. Since 1804. when the first railway was operated it proved to be very popular and economic.

The first quarter of the twentieth century marked an unprecedented change in the field of mass transportation. The diesel and gasoline engines were invented and put to public use. They improved the performance of cars, ships and locomotives many folds. In 1967 the first nuclear powered commercial ship was launched. More recently the 'Hovercraft' has been devised. The bottom of the vehicle is filled with an air cushion, which enables it to travel on land and sea at tremendous speed. But the most astonishing invention of the 20th century is the supersonic aircraft. It annihilates the barriers of time and distance. The mordern era of transportation has made the the people of the world neighbours. whether or not they wish to be.

Where love is great, the littlest doubts are fear;
When tittle fears grow great, great love grows there.

—Shakespeare

OF INTRODUCTION AND APPROACH

A. B. M. Shahidul Islam

Lecturer

I was not simply ready for the blow, I could not simply think of such an awful and awkward time lying in wait for me, I could not simply think that my reverend "chamberman" might come down in that way upon me. Had I known a bit before, I would never have entered into his chamber even if anybody offered me an air-ticket from Dacca to anywhere else of the world alongwith adequate assurance of supply of foreign currency abroad. However, perhaps I was predes tined to enter the room on that day and hold my tutorial note out to him straight way for necessary 'academic consideration' taking no care of the 'chamber man's' mood. Well, action he took, not on my note, but directly upon my own person. No sooner had I approached than he hurled a red-eyed look at me and simultaneously uncovered his stock of sophisticated-invectives to shower upon me with his voice more than sufficiently audible, his face unusually tense and his total mood awfully devouring. Before I could try to catch any reason for such air—my sixth sense promted me to quit the room if possible with a single stef. But never befor that moment did I feel my head to be so full of weight, my voice so lost and my everworthy legs so usless! Only my faithful ear did not betray me. So long it was collecting each and every message coming down from my reverend chamber man's lips. But it seemed to preserve and honour the word "leave" most that slipped out of the mouth of the 'hero' of the situation like a burning piece of coal. However my ear sent the sound of the relieving word to my brain. And my brain instantly breaking the meaning of the word showed its Infallible brilliance. Morcover, it decreed my legs to work for me which so long were firnly kissing the cold lifless floor of the hot lively 'chamber man's' room. However my legs seemed to be no less scrupulous. The hurridly honoured my brain by showing obedience to its decree. They indeed revolted against the situation, made a quick movement and thus threw me out of the room. But before I could catch breath and allow cool breeze to passover my sweating exeistence, I saw one of my dear friends getting in to the same chamber with same work as mine. At that time all I had wanted in and to this beautiful world, I wanted my friend to prevent from going in to that furnace. But my tightly shut-up lips still remained locked as before despite my sincere trying to stop my friend from going in.

However, my rebel legs somehow managed to drag me out to a safer place where I kept waiting for my friend to come out and indeed I found him getting out of the room after no less than twenty minutes with his face undis turbed and his mood as fresh and fine as before. This state of affair threw me into the fit of utter surprise and shocked me beyond measare. Consciously I did not want my freind to suffer the same fate which I did but still then I was shocked to see him coming out fresh perhaps because my subconscions was expecting to see him in the samepliy ht as mine and perhaps because, I was, beyond my knowing expecting to have a sort of consolation out his humilation. A kind of peculiar uneasy sense was dominating my present entity. By the time my friend came walking upto me. I, somehow kept my countenance normal and had our experiences of the 'chamber' exchanged. But what he said helfed me nothing to decipher the mystry of the chamber man's sudden eccentic behaviour towardsme. This event of the day remained a mystry to me for a long time. But now that day's incide is no longer a mystry to me; rether an incident that may happen to or befall upon any body at anytime if he is not aware of his approach, if he fails to prefix an introduction to his approach according to the demand of the situation.

Introduction is indeed an inevitability for any situation what soever. It is like a sauce, a kind of appetiger that increases the curiosity of the readers or listeners and effectviely works upon any man if not fully, surely to some considerable axtent that so often help to manage awkward situations.

Introduction or approach is so sure a weapon that if even proposa fails it trueimphs ; if even requrst refused it works, A reqrired, desired reasonable and fair amount of introduction is sure to produce so sure an effect upon the man approached to that if he refuses he is sure to refuse soberly, if he denies, he is to deny reasonably, even if he feels offended, stillthen he is to react in a manner that does not come out to be humiliating for any body.

Introduction is not mere written statemen or utterences. pleasing physical gesture posture may also rom the body of introduction. Where requests fails, efforts hit back—a simple simple may succed.

Introduction is almost like water after food. The only differnce is this that we need to have water after food and introduction or approach before we go to deal anything. we are sure to spoil or atleast hurt our business of whateversort if we are dull in our approach, if we fail to use introduction properly, effctively and fairly ; for humaun mind is ever the sincerest worshipper of beauty :

RESIDENTIAL MODEL SCHOOL & COLLEGE
DACCA

MEMBERS OF TEACHING STAFF

1. Mr. Lutful Haider Choudhury	Principal
2. Shah Muhammad Zahurul Hoq	Vice-Principal
3. Mrs Shahan Ara Begum	Headmistress (Jr. Wing)

DEPARTMENT OF BENGALI

1. Mr A. K Azadul Kabir	Assistant Professor
2. Mr. A. K. M. Abdui Mannan	do
3. Mrs. Rahatun Nesa Hoque	do
4. Mr. Md. Abdur Razzaq	Lecturer
5. Mrs Dil Roushan Islam	do
6. Mrs Roushan Ara	do

DEPARTMENT OF ENGLISH

1. Mr. Anowar Rahman	Lecturer
2. Mr. A. B. M. Shahidul Islam	do
3. Mr. Md. Obaidullah	do
4. Kazi Atiqur Rahman	do
5. Mrs Mushtari Nabi	do

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

1. Mr. Md. Shamsul Hoque	Assistant Professor
2. Syed Sabbir Ahmed	Lecturer
3. Mr. Md. Faizur Rahman	do
4. Mrs. Dil Ara Begum	do

DEPARTMENT OF PHYSICS

1. Mr. Md. Abdur Rouf	Assistant Professor
2. Mr. A. T. M. Jalaluddin	Lecturer
3. Mr. Md. Abdul Jabber	do
4. Mr. Ghulam Kibria	Demonstrator

DEPARTMENT OF CHEMISRY

1. Mr. Md. Ataul Hoque	Lecturer
2. Mr. Md. Ghulam Murtaza	do
3. Mrs. Muhfuza Wali	do
4. Mr. Md. Ahia	Demonstrator

DEPARTMENT OF BIOLOGY

1. Mr. Md. Aminul Islam	Lecturer
2. Mr. Nurul Islam Bhuiyan	do

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

1. Kazi Rezaul Islam	Assistant Professor
2. Mr. Md. Suja-ud-Daula	Lecturer

DEPARTMENT OF CIVICS

1. Mrs. Rahman Shahin	Lecturer

DEPARTMENT OF HISTORY

1. Sk. Md. Omar Ali	Assistant Professor
2. Mr. ASAIK Eusufzai	do
3. Mrs. Syeda Jahanara Mansur	do
4. Mrs. Hasna Aziz	Lecturer
5. Mrs. Shamim Rahman	do
6. Mrs. Umme Salma Chisty	do

DEPARTMENT OF ECONOMICS

1. Mr. Md. Ahsanullah	Assistant Professor
2. Mr. Proloy Kumar Guha Neogi	Lecturer

DEPARTMENT OF LOGIC

1. Mrs. Ummia Khatun	Lecturer

DEPARTMENT OF ISL. STUDIES

1. Mr. A.B.M. Abdul Mannan	Lecturer
2. Mr. Md, Hemayetuddin	do
3 Mr. Lokman Ahmed Amimi	Asstt. Moulavi
4. Mr. Md. Rafiqul Islam	do

DEPARTMENT OF ART & CRAFT

1. Mr. Khagendra Kumar Sarker	Lecturer
2. Mrs. Mahbuba Habib	do

DEPARTMENT OF SPORTS

1. Mr. Helaluddin Ahmed	Lecturer
2. Mr. Z. H. Mahbub Amjad	Asstt. PTI
3. Mr. Md. Abu Taher	do
4. Mr. Md. Khalilur Rahman	do

LIBRARIAN

1. Mr. Shilabrata Choudhury

MEDICAL OFFICER

1. Dr. Md. Abdul Latif